বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ

গবেষক ঃ হাফিজুল ইসলাম
পূর্বাঞ্চল হাই স্কুল, রবীন্দ্রনগর, জলপাইগুড়ি

তত্ত্বাবধায়িকা
ডঃ মঞ্জুলা বেরা
রীডার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০০৭

Ref
80·37
হাফি/ হক

212073
02 FEB 2009

STOCK TAKING - 2011

প্রাক্ কথন

আমার গবেষণার শিরোনাম - "বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ"। আমি বাংলা অনার্সে পড়াকালীন বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে ভাবনা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল। তাঁর উপন্যাসের বিষয় ভাবনা জানার আগ্রহ আমার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থও আমি সংগ্রহ করেছিলাম। গবেষণা করতে গিয়ে দেখি কাজটি বৃহৎ। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র, পত্রিকা অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে আমার গবেষণার প্রেরণা পাই। এছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বুদ্ধদেব বিষয়ক নানা বইপত্র স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের সময়েও আমি পড়তে ভালোবাসতাম। বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রের সূক্ষ্মতর ভাঁজগুলি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। ষাটের দশকে অতি আধুনিক সাহিত্য ভাবনার পেছনে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের তরুণ-তরুণীর মনোজগৎ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের নূতনত্ব বিষয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের গ্রন্থ তেমন দেখা যায় না। কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মতো উপন্যাস রচনাতেও তাঁর যে শিল্পভাবনা ছিল তা আমাকে বিশেষভাবে আপ্লুত করে। যখন আমি এম.এ. পাশ করি তখন এই গবেষণার উৎসাহ আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই সময় আমি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে জলপাইগুড়ি পূর্বাঞ্চল হাই স্কুলে যুক্ত হই। এই গবেষণা করার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

গবেষণার শিরোনাম নিয়ে মাননীয়া অধাপিকা মহাশয়ার সহযোগিতা ও সুপরামর্শে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নিয়ে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করি। আমার এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়িকা শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সুযোগ্য সাহিত্য অনুরাগী অজস্র তথ্য ও প্রামাণ্য সাহিত্য চিন্তা দিয়ে যেভাবে আমার গবেষণা পত্রটি তত্ত্বাবধান করেছেন, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি রচনা করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ, তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম রইল।

বুদ্ধদেব বসুর আগামী বছরে জন্ম শতবর্ষ পূর্ণ হবে। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমার এই গবেষণা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব অধ্যাপক মহাশয় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন- ডঃ রেজাউল করিম, ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট, ডঃ প্রসূন ঘোষ, ডঃ নিখিলেশ রায় ও ডঃ সুবোধ কুমার যশ মহাশয়। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল। এছাড়া এই গবেষণার জন্য আমার স্কুল কর্তৃপক্ষ, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, আজাদ হিন্দ্ পাঠাগার ও প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং মুদ্রাকর অমিত কুমার দত্ত মহাশয়, (কমফোর্ট, জলপাইগুড়ি) আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণাটি পাঠক ও সাহিত্য অনুরাগীবৃন্দের ভালো লাগলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

ধন্যবাদান্তে -
হাফিজুল ইসলাম

তারিখ ঃ ৭/৮/২০০৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১ - ৭
প্রথম অধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর জীবন সংক্ষেপ	৮ - ৪৩
দ্বিতীয় অধ্যায় কল্লোল চেতনা ও বাংলা উপন্যাসে নূতন ধারা	৪৪ - ৭০
তৃতীয় অধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ পর্ব বিন্যাস ও বিষয়ানুসারে বিশ্লেষণ	৭১ - ১৭৯
চতুর্থ অধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপ	১৮০ - ২৩১
উপসংহার	২৩২ - ২৪১
গ্রন্থপঞ্জী	২৪২ - ২৬১

ভূমিকা

জগতের নির্যাসই হল মানুষ। মানুষের জীবনধারায় ও জীবন শৈলীতে সৃষ্টি বহন করে আনে সত্যের স্পন্দন। এই পথ ধরেই মানুষ পৃথিবীতে তৈরী করে নূতন রূপ, রস, ও প্রত্যয়। পৃথিবীর রূপ রসের স্বাদ বিভিন্ন স্রষ্টার কাছে ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মানব জীবনে তাই প্রতিনিয়ত চলে ভাঙ্গা গড়া। প্রতিমুহূর্ত পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দ্বন্দ্বে মুখরিত হয় নবজীবন। এর সঙ্গে সুদীর্ঘকালের ব্যথা বেদনার ইতিবৃত্ত জড়িয়ে থাকে। আবার ক্ষুদ্রতা ও দীনতার ইতিহাস জীবনের ভাঙ্গা গড়ার কাজে যুক্ত থাকে। জীবন শুধু এই অর্থই বহন করে না, নানা কৌণিকতায় জীবনের আকাশে বিভিন্ন ঘটনা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইসব ঘটনা মানুষের যেদিন থেকে আরম্ভ হয়, গল্পের জন্মও সেদিন থেকে। এই গল্প বলার ধারাপথেই আপন বোধপ্রাণতার ক্রমানুভূতি সূচিত করে সমাজকে। কারণ মানুষের সমাজের সঙ্গে তার বন্ধন শাশ্বত জীবন অভিজ্ঞতারই ফসল। জীবনের এই আলোকে সমাজের প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যে রূপায়িত হয়। সাহিত্য সমাজ বিমুক্ত বৃন্তলীন কোন কুসুম নয়, সাহিত্যিকও নন সমাজ বহির্ভূত অলৌকিক জগতের কোনও কল্প মানুষ। তাঁদের সৃষ্টকর্ম সমাজ জীবনে অভিজ্ঞতারই আলোকে নির্মাণ করে এক বাস্তবতা, যা সমাজ অভিজ্ঞতারই শৈল্পিক ব্যঞ্জনামাত্র। তাই সমাজের ঘটনা, জীবন জিজ্ঞাসা ও কামনা বাসনার সমষ্টিগত প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন রূপে চর্যাপদকে পেয়েছি। আবার পরবর্তীকালে মঙ্গল কাব্যের কবিরা মানুষের পরিপূর্ণতা দিতে পারে নি। সেখানেও অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের আত্মার ক্রন্দন শোনা গেল। সুতরাং সাহিত্যের জন্ম লগ্ন থেকেই মানুষের জীবন থাকলেও সেখানে দীর্ঘভাবে চরিত্রগুলির বিকাশ লক্ষ করা যায় না। দেব ও মানুষের ভক্তি-নিষ্ঠা, বিরোধাভাসের মধ্যে দিয়ে নূতন জীবন ফুটে উঠতে দেখা যায়। সেখানেও ভক্তির জয়গান করতে যারা মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা হলেন কবি। তাঁরা কবিতার ছন্দে চরিত্রগুলিকে বিচরণ করালেন। কবির মতো কথাসাহিত্যিকও সত্য অনুসন্ধানে বড় দীর্ঘ অস্বস্তিকর পথ বেয়ে ব্যক্তির অন্তর উন্মোচন করার কাজে মগ্ন থাকেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব উন্মোচন কথাসাহিত্যের মধ্যে দেখা যায়। কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলি দশ জনের মধ্যে বসবাস করলেও তার আপন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য কখনও হারিয়ে ফেলে না। তা থেকেই যেকোন চরিত্রের স্বতন্ত্রতা লক্ষ করা যায়। মানুষ যখন নিজেকে চিনতে পারে তখন থেকে উপলব্ধি ও দ্বন্দ্বের তারতম্যই উপন্যাসে দেখা যায়। সেখানে মানুষের জীবনের কাহিনী রচনা করার বিভিন্ন দিক, আর্থিক দুর্দশার ও সামাজিক অবস্থার চিত্র দেখতে

পাই। জীবনের আচার আচরণ ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। সুতরাং জীবনের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি উপন্যাস সাহিত্যে প্রাধান্য পায়। সেই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সার্বিক রূপ দিতে সৃষ্টি হলো এক নূতন লেখককুল। যাঁরা ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হলেন। সমকালের ঔপনিবেশিক শাসনকাল ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি মূলত ইতিহাস ও রোমান্সকে আশ্রয় করে ও স্কেচধর্মী লেখাকে আশ্রয় করে। এরপর রোমান্স ও ইতিহাসকে অবলম্বন করে প্রথম বাংলা উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় বেরিয়ে এসেছিল বাংলা উপন্যাসের নূতন ডানা, সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উড়বার জন্য। তাঁর উপন্যাসে পাওয়া গেল জগৎসিংহ, রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীদের। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মধ্যযুগীয় নৈতিকতার গন্ডিকে অতিক্রম করতে পারে নি। সমাজের পরিবর্তন ও সংস্কার উপন্যাসে দেখানো হয় নি। বিশেষ করে বিধবার প্রেম তাঁর উপন্যাসে তেমন গ্রহণীয় হয়ে উঠলো না। সামাজিক নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করলেও নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে চরিত্রগুলির কোন বিচ্যুতি দেখা যায় না। সমাজ শাসনের বহিঃভাগে চরিত্রগুলি যেতে চেয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" (১৯৭৩) ও "রজনী" (১৯৭৮) তে পেয়েছি নারী মনের এই বহিপ্রকাশ। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাস ও রোমান্স হলেও ব্যক্তি চরিত্র পেল সমসাময়িক ভাবনার ডানা। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে "বিষবৃক্ষ"-তে এই ভাবনার পরিস্ফুটন হয়েছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রগুলি চার দেওয়ালের বাহিরে যাবার পথ দেখিয়েছিল। সে পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ হাঁটলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" (১৮৮৩ খ্রীঃ) ও "রাজর্ষী" (১৮৮৭ খ্রীঃ) উপন্যাসে ঐতিহাসিক আশ্রয়ে প্রথা ও সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন কাহিনী তুলে ধরলেন। তিনি এখানে ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপন্যাসের কেন্দ্রে উপস্থাপিত করলেন। এই দুটি উপন্যাসের ঐতিহাসিক বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে "চোখের বালি" উপন্যাসে দেখা যায় ঐতিহাসিক পটভূমি আর উপন্যাসের কেন্দ্রে নেই, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও নারীমনের টানাপোড়নের দ্বন্দ্ব এনে বাংলা উপন্যাসকে যথার্থ উপন্যাস সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে এলেন। ব্যক্তি মনের জটিলতাকে বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখালেন। "চোখের বালি"তে বিধবা নারী হিসাবে বিনোদিনী সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে চায়, কিন্তু সমাজের নিয়ম নীতির কাছে তাকে বলী হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে নূতন করে বুনন আনলেন। জীবনের সংঘাত দেখালেন কিন্তু তাতে সমাজ আলোড়নের কোন লক্ষণ ফুটে ওঠে না। আবার "চার অধ্যায়ে" (১৯১৫ খ্রীঃ),

ব্যক্তি মনের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, ঘটনার বিস্তার নেই বললেই চলে। স্বদেশ প্রেমের জায়গায় জীবনের ভাবনার দিকগুলি উপন্যাসে তুলে ধরলেন। সমাজের অবস্থান তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছিল। বাস্তবতা থেকে নীতিবোধ তাঁর কথাসাহিত্যে ধরা পড়ল। সাধারণ যুক্তি গ্রাহ্য বিষয়বস্তু তাঁর উপন্যাসে তেমন না থাকলেও উপন্যাসের প্রকৃতি, আঙ্গিক ও প্রকরণের দিকটা নূতন করে পাওয়া গেল। সুতরাং উপন্যাসে জীবনের মাত্রা মূলতঃ সামাজিক পরিবেষ্টনের মধ্যে থেকে নূতন মন ও মানসিকতা নিয়ে চরিত্রগুলি ফুটে উঠল। রবীন্দ্রনাথ বিধবার প্রেমের স্বীকৃতি দিলেন সত্য, কিন্তু সমাজ ভেঙ্গে বা সমাজ সংস্কারের দিকটি দেখালেন না। সমাজের বাঁধাধরা ছকেই চরিত্রগুলিকে চলতে দেখি। এই সময়েই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। উভয় লেখকই উত্তরযুগের আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। প্রভাতকুমার তাঁর উপন্যাসে স্নিগ্ধ পল্লীজীবনের বুকে নিঃস্তরঙ্গ মানুষের জীবন কাহিনী তুলে ধরলেন। ব্যক্তি চরিত্রগুলিকে নূতনভাবে সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি উত্তর যুগের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এলেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে নূতন পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতটি উল্লেখ করতে পারি।

"যুগের কিছু কিছু ভাবনা শরৎচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক স্পষ্ট। মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী প্রত্যয়ের তুলনায় শরৎচন্দ্রের মানবপ্রত্যয় অনেক বাস্তব ঘেঁষা"

(পৃষ্ঠা- ১৩০, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা/ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০০, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাব্লিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে চিন্তা শিল্পাদর্শ নিহিত ছিল তা পরবর্তীকালের উপন্যাসে নবজীবনের আভাস দিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বাস্তব, লোকায়িত জীবন চেতনা, বাঙ্গালী সমাজের সমস্যার বিভিন্ন দিকের পরিচয় উপন্যাসে তুলে ধরলেন। "পল্লী সমাজ" (১৯১৬ খ্রীঃ) এ দেখা যায় গ্রামীণ সমাজের নীচতা, রমা ও রমেশের সম্পর্কের জটিলতার কাহিনী উপন্যাস সাহিত্যে আলাদা মাত্রা এনেছিল। শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ" (১৯২০ খ্রীঃ) এ অচলা ও মহিমের পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও অবৈধ প্রেমের দিকটা তুলে ধরা হয়েছে। আবার

শ্রীকান্তের আদর্শের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপন্যাস জগতের নূতন দিকের সন্ধান দেয়। রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁরই জীবনাদর্শে ও মনস্তত্ত্বে খানিকটা অঙ্গীভূত থেকেছেন বলা যায়। তবুও তাঁর উপন্যাসে চিন্তা ও শিল্পাদর্শ যে নূতনত্বের আভাস দিয়েছিল, তা অভিনব। বস্তুত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাবেই বাংলা উপন্যাস জগতে নূতন আঙ্গিক, আদর্শবোধ, যুক্তিগ্রাহ্য ও মনস্তত্ত্বসম্মত কাহিনী ও নূতন ভাবনা চেতনা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা হৃদয়ধর্মী ও উদার মানবিকতার অধিকারী হলেও নীতি নৈতিকতার কাছে তাদের পদে পদে লাঞ্ছিত হতে দেখা যায়। চরিত্রগুলি সমাজের বুকে হাসি কান্নায় ভরা মায়াময় সংসারে চলতে গিয়ে কখনও মানব মনের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলেছিল। সেখানে মনন অপেক্ষা সমাজের নিয়ম নীতিতে চরিত্রগুলিকে বেশি নিষ্পেষিত হতে দেখা যায়। চরিত্রগুলি তাই প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে নি, কিন্তু চিরাচরিত সমাজ শাসন থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়। অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র, গ্রামীণ নিয়ম নীতি, পতিতালয়ের জীবন কাহিনী ও অবহেলিত মানুষদের আচার আচরণ তাঁর উপন্যাসে বার বার এসেছিল। শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রথম নূতন রুচির সব শ্রেণীর মানুষের জীবন কাহিনী তুলে ধরলেন; যা বাংলা কথাসাহিত্যে অভিনব।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ পর্বে ইতিহাস ও রোমান্সই ছিল অধিকাংশ উপনাসের বিষয়। এর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসকেও আমরা পেয়েছি। তবে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে আচার, আচরণ ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য, সংস্কারমুখী ভাবনায় আন্দোলিত হতে দেখি না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি নর-নারীর মনের বিভিন্ন দিকগুলি উপন্যাসে নূতন পথের সন্ধান দেয়। উপন্যাসে নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি যেন চরিত্রগুলির উপর করেছিলেন। মানুষের যে জৈব ধর্মের তাগিদ ও চাহিদা থাকে তা কোন চরিত্রের মধ্যে আমরা তেমনভাবে দেখতে পাই না। সমাজের বাঁধাধরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিয়ম নীতিতে চরিত্রগুলি যেন আবদ্ধ থেকেছে। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমাদের নীতি ও আদর্শকে নূতন করে নাড়া দিয়েছিল। অর্থনৈতিক অবক্ষয়, ভগ্ন সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করল। দেশের সমাজ জীবনে সামাজিক চিন্তা-চেতনার স্তরে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব সংক্রামিত হয়। এই সময়ে ইংরেজ সরকারের শাসন নীতির বিরুদ্ধে গোটা দেশে অস্থিরতার পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দমন নীতি ও বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঘৃণা প্রবল হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার

ধারণ করে। এই পটভূমিকায় মানুষের আবেগের পরিবর্তন ঘটল, চিন্তা চেতনায় বাস্তবের মাটি স্পর্শ করল। মানুষ অনেক বেশি বৈচিত্র্যধর্মিতায় অগ্রসর হতে লাগল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যপূর্ণতা আমাদের সামনে এসেছিল, এদেরকে নবযুগের বার্তাবহ বলতে পারি। এর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ সমাজের বুকে ব্যাপক পরিবর্তন আনল। যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী উপন্যাস সাহিত্যে চোখে পড়ে। সমাজের এই অগ্রগতি পদে পদে নগর জীবনের বিভিন্ন দিক উপন্যাসে উঠে এসেছিল। এই সময়েই সমাজের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের রূপটি প্রত্যক্ষ করা গেল। এই চিত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করল। সে সময় চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তরা সুখের জীবন যাপন করলেও অর্থনৈতিক ভাঙ্গন তাদের বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছিল। তাই মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট এই সময়ের লেখকদের রচনার পটভূমি হয়ে দাঁড়ালো। সেই আমল থেকেই বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনকে বেশী নাড়া দিয়েছিল। এই সময় থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অবক্ষয়ের চিত্র এবং শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। সর্বোপরি, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নৈরাশ্য, জীবন সংগ্রামের অস্থিরতা থেকে সমাজ ও জীবনের সংস্কারের প্রয়োজন বিভিন্ন লেখকের রচনায় ধরা পড়েছে। লেখকরা এই নাগরিক জীবনের উপযোগী করে তোলার ছকে চরিত্রদের সাজিয়ে উপন্যাসের বিষয়ে নর-নারীর হৃদয়ের কামনা বাসনাকে স্থান দিলেন। এই ভাবনা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই বেশি এসেছিল। এর সঙ্গে উপন্যাসে সমাজের নীচুতলার অধিবাসীদের ছবি আমরা দেখতে পাই। চরিত্রগুলির মধ্যে কুটিলতা, সন্দেহপ্রবণ মনোভাব থাকলেও সমাজকে উপেক্ষা করেই যেন চলতে চায়। সমাজও যেন তাদের শৃঙ্খলে চরিত্রগুলিকে আর বেশি শৃঙ্খলায়িত করতে চায় না। চরিত্রগুলি মুক্তভাবেই চলা ফেরা করে। জীবনের দেহজ আকর্ষণের বাতাবরণে চরিত্রগুলি বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করছে। আধুনিক জীবন, কলকাতা শহরের কালচার বুদ্ধদেবের উপন্যাসে প্রাধান্য পেল। ফলে তিরিশ-চল্লিশ দশকের উপন্যাসগুলি যেন শহুরে বৈদগ্ধের আশ্রয় ভূমি হয়ে উঠেছিল। নগর সভ্যতার সামাজিক জীবন, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত যৌন জীবনের নানা সমস্যা উপন্যাসে উঠে এসেছিল। তাদের বিপর্যস্ত সামাজিক জীবন ও তার সমস্যাগুলি সম্পর্কে সমাজকে নীরব থাকতে দেখি। এই বৈশিষ্ট্য ও নূতন জীবনাদর্শের প্রেরণা যারা আনলেন তাঁরা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। তাঁদের প্রতিটি উপন্যাসই নিজের জীবন ও তাদের সাহিত্যে নূতন স্বাদ সৃষ্টি করেছিল। জীবনকে ভোগ, কামনা, বাসনা সমাজ অনুশাসন মুক্ত এক উদার

শিক্ষিত মানুষের জীবানাচরণ তাঁদের প্রেরণা দিয়েছিল। এই সময় বাঙ্গালীর যুব সমাজে হতাশার সৃষ্টি হল। বন্ধন মুক্তির দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, তাদের যৌবনের উচ্ছলতা লক্ষ করা গেল। এদের সমকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা সমকালীন সাহিত্য পত্রিকা "কল্লোল" এর চিন্তা-ভাবনা থেকে খানিকটা দূরে ছিলেন। কল্লোলীয় ভাবনা থেকে এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ধারাটি যেন ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। বিশেষ করে তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ় বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি সমাজের ভঙ্গুর অবস্থা লক্ষ করা যায়। তিনি সামগ্রিক যুগকে নিয়ে লিখছেন। বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ও মাটির কাছের মানুষদের মৌল বাস্তবতার সংস্কার বিশ্বাস ও স্বপ্ন সম্ভোগের মাঝে জীবনের কঠোর ও কোমল অনুভূতিতে প্রকৃতির ছোঁয়া দেখা যায়। তাঁর উপন্যাসে প্রেমের মার্জিত রুচি আমরা দেখতে পাই। নর-নারীর কামনা ও মানব চরিত্রের কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটি অপেক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিশেষভাবে তাঁর উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমকালের বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাহিত্য পত্রিকা "কল্লোল"কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এছাড়া এই সময়ের "কালি-কলম", "প্রগতি" পত্রিকাকে ঘিরে এই পর্বের লেখকদের নূতন জীবনাদর্শ ও চিন্তা চেতনা সম্পর্কে নূতন মূল্যবোধ ধরা পড়েছিল। এই সময়টা মূলত কল্লোলীয় যুগের নূতন বৈশিষ্ট্য। যা সমকালের উপন্যাসের নর-নারীর চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস বলা যেতে পারে। এই কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহের উন্মাদনা, নূতনত্বের প্রয়াস, যৌন চেতনা, ভাব প্রবণতা, রোমান্টিকতা ও অতিকাব্যিকতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই নূতন ভাবধারা যারা আনলেন তাঁরা হলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুবোধ ঘোষ, যাঁরা ছিলেন নিজেরাই নিজেদের তুলনা। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কবি, কেউ ছিলেন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। এই পর্বের উপন্যাসে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর ঝোঁক লক্ষ করা যায়। চরিত্রের মধ্যে রোমান্টিকতা বার বার এসেছিল। বিশেষ করে যৌন উন্মাদনা উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে বেশি মাত্রায় দেখা গেল। তাঁরা কাব্য, কবিতার পাশাপাশি নূতন স্বাদের উপন্যাস রচনা করে সমকালীন কথাসাহিত্যের ধারাটিকে প্রশস্ত করেছিলেন। তাঁদের উপন্যাসে প্রেম চেতনার সঙ্গে দেহ কামনার জটিল সম্পর্কের নূতন তাৎপর্য নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সংশয় ও সংকটের জটিল দ্বন্দ্ব, রূপ বিন্যাস, নরনারীর প্রেম কামনা ও আনন্দ বেদনার অপরূপ জীবন কাহিনী ফুটে উঠল। প্রবাহমান উপন্যাস ধারার গতিকে ভিন্ন মুখী করার প্রয়াস তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্ন কল্পনা এক সুদৃঢ় পারিবারিক ও

সামাজিক দিকগুলি নূতন ভাবাদর্শের আলোয় বিদ্রোহীর ভাব লক্ষ করা যায়। সেই বিদ্রোহের মূল প্রেরণাই হল বুদ্ধদেব বসু। সমকালের "কল্লোল" পত্রিকা এই মুক্তি চেতনাকে আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। ব্যক্তির সমস্যা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয় ও জীবনের স্বপ্ন গভীরভাবে প্রাধান্য পেল তাঁদের উপন্যাসে। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে চরিত্রের বিশ্লেষণধর্মী, ঘাত প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়। তাঁদের উপন্যাসে কাব্য উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য থাকলেও চরিত্র পরিকল্পনায় রোমান্টিকতা প্রেমের উন্মত্ত স্রোতের টানে উপযোগী বলে মনে হয়। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির নূতন সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। সামাজিক পরিবর্তন দরিদ্র জীবনের নৈরাশ্যের ক্ষোভ ও তার বিদ্রোহ উপন্যাসে দেখতে পাই। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও সমাজ সংস্কারের প্রতি ঝোঁক লক্ষ করা যায়। তবে অচিন্ত্যকুমারের অনেকগুলি উপন্যাসে বস্তুতান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক চমক লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে কোন চরিত্রের মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তি সত্তা নেই। এরা যেন আঁধারের মধ্যে নামহীন মানুষমাত্র। অচিন্ত্যকুমারের এই উপন্যাস বলয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে কাব্যের আতিশয্য যতটা ছিল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে নেই বললেই চলে। তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের মধ্যে কোন আদর্শবাদের চিত্র পরিস্ফুট হয় নি, সহানুভূতির বশে নিরুপায় মানুষের বীভৎসতার সংযত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই চিত্র কখনও ব্যঙ্গের সুরে, বর্ণনার ভঙ্গিতে ও কখনও অন্তঃক্ষোভের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এদের মধ্যে সমাজের উদার অনুশাসন মুক্ত শহরকেন্দ্রিক নাগরিক জীবন, প্রেম ও দাম্পত্য প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি উপন্যাস জগতে নূতন আলোড়ন এনেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি উপন্যাসের নূতন ধারায় নূতন বিষয়ধর্মী ও বিতর্কমূলক উপন্যাস লিখে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে চমক এনেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বিভিন্ন বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক অলোচনা করার আগে তাঁর জীবন কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর জীবন সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর জীবন সংক্ষেপ

আমাদের বাংলা সাহিত্যে যুগে যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিক অমূল্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে দিয়ে তাঁরা উপন্যাস ধারায় এই চিন্তা চেতনার প্রকাশ বিভিন্ন প্রকরণে ঘটিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকে ছিলেন কবি, লেখক ও শিল্পী। প্রত্যেকে স্ব-স্ব সাহিত্য শাখায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন এবং তাঁদের সৃষ্ট সম্ভার আজ বাংলা সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এই নূতন চেতনা ও সাহিত্যে, বিশিষ্টতা অনেকে এনেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু তাঁদেরই একজন। তাদের সৃষ্ট সাহিত্য জীবনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। জীবন যে কেবল মহান সাহিত্যে বাঁধা পড়ে তা নয়, জীবন সাহিত্যকেও নূতন চেতনার ভিন্ন স্বাদ আনতে সাহায্য করে। তাই বুদ্ধদেবের জীবন ও সাহিত্য দুই-ই ছিল ঘটনা বহুল। তিনি বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু তুলে ধরলেন যা প্রচলিত লেখা থেকে ভিন্ন বলা যেতে পারে। রোমান্টিকতা শুধু তাঁর সাহিত্যে নয়, তাঁর জীবনেও বার বার এসেছিল। তাঁর জীবনে যৌবনের উন্মাদনা, নরনারীর দেহ কামনার উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে অনেকটা বিদ্রোহের মতো দেখায়। এই বিদ্রোহ ভাবনা প্রচলিত সাহিত্য ভাবনা থেকে ভিন্ন পথের দিশারী হলেও পুরাতনকে পুরোপুরি বর্জন করে আসে নি। এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ প্রথমে কাব্য কবিতায় ফুটে ওঠে। ক্রমে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি সমভাবে পদচারণা করেছিলেন। তাই রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যে বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা বুদ্ধদেব বসু দেখালেন। তাঁর জীবনের সমস্তকিছুই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। জীবিতকালে খ্যাতি যেমন ছিল তেমনি অখ্যাতি ও বিতর্ক তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তিনি কখন দেশের কখনও বিদেশের বিভিন্ন কবিদের নিয়ে সমালোচনার বাদানুবাদ করেছিলেন। সেই বছরই এই সমালোচনা হয়তো স্মরণীয় ছিল বা প্রধান ঘটনা ছিল বলা যেতে পারে। সবসময় সাহিত্য ও ব্যক্তি জীবন দুটি এক সময়ে সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল, যা তাঁর জীবনে গভীর আলোকপাত করেছিল। তাঁর চিন্তা, কর্ম ও জীবনযাপনের সমন্বয়ে এমন একটি আদর্শ গড়ে উঠেছিল, যা নূতন বিষয় ভাবনা বলা যেতে পারে। তাঁর সাহিত্য সাধনা জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল। এই জীবনকে দেখার ভঙ্গি তাঁর কাছে নিছক কল্পনামাত্র নয়, এটাই তাঁর কাছে সত্যকার জীবন, যা একাশি বছরের জীবনেও তাঁকে দেখি কখনও বিলাসী আবার

কখনও অর্ন্তমুখী। এই সুদীর্ঘকাল তাঁর সাহিত্য জীবনকে অস্থির করে তুলেছিল। আবার তাঁর ব্যক্তি জীবনের অনেক ঘটনা সাহিত্য জীবনে প্রভাব ফেলেছিল।

জীবনকে দেখার ভঙ্গি তাঁর কাছে নিরর্থক তত্ত্বকথায় আবদ্ধ ছিল না। সুতরাং বুদ্ধদেবের সাহিত্য জীবন ও ব্যক্তি জীবনের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সমন্বয় লক্ষ করি। এই সমন্বয়ের ঘটনাগুলি হল পত্রিকা, গল্প ও উপন্যাস রচনা, কবিতা, তুলনামূলক সাহিত্যের জন্য কর্মত্যাগ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি সমালোচনা। এছাড়া বুদ্ধদেবের বিদেশ ভ্রমণের ঘটনা তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এখন আমরা বুদ্ধদেবের ব্যক্তি জীবনের পরিচয় দিয়ে সাহিত্য রচনায় প্রবেশ করবো।

বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লায়, এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮ই মার্চ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম ভূদেবচন্দ্র বসু ও মাতা ছিলেন বিনয়কুমারী বসু। তাঁর পিতার আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুরের মালখা গ্রামে। বুদ্ধদেবের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েরই আদি নিবাস ছিল ঐ গ্রামে। মায়ের স্মৃতি বুদ্ধদেবের কখনও মনে পড়েনি। কারণ জন্মের পরেই বুদ্ধদেব তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু নিজেই জানিয়েছিলেন।

"আমি বিনয়কুমারীর প্রথম ও শেষ সন্তান - আমার জন্মের পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই প্রসবোত্তর ধনুষ্টঙ্কার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুই আমার নামকরণের কারণ"।- ১

বুদ্ধদেব ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা, পত্নীকে হারিয়ে বছর খানেকের মধ্যে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করলেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। প্রথম পক্ষের পুত্রকে অর্থাৎ বুদ্ধদেবকে নিজের কাছে না রাখলেও বুদ্ধদেবের সঙ্গে পিতা-পুত্রে আদৌ যোগাযোগ ছিল না এমন বলা যায় না। পারিবারিক জীবনের এই জটিল পরিস্থিতিতে মাতামহ ও পিতামহের ঘরেই বুদ্ধদেবের প্রতিপালনের স্থান হয়েছিল। তাঁরাই ছিলেন বুদ্ধদেবের কাছে পিতা-মাতার মতো। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা মাতৃহারা এই শিশুর কাছেই থাকতেন। জন্মদাত্রী মায়ের স্নেহযত্ন না পেলেও তিনি দাদু ও দিদিমার স্নেহ-মমতার কথা জীবনেও ভুলতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"আমি আমার দাদামশাইকে ডাকতাম "দা" এবং দিদিমাকে "মা" বলে। শুধু যে মুখে বলতাম তা নয় ; তাকে মা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি কখনও, ভাবতেও পারিনি"। - ২

বুদ্ধদেব দাদামশাই-এর আশ্রয়স্থল নিয়ে জীবনে কখনও বিব্রত বোধ করেন নি। বুদ্ধদেব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছেন এক নিবিড় স্নেহস্পর্শ। মাতৃহীন শিশুর মনোকষ্ট বুদ্ধদেবের জীবনের ত্রিসীমানায় কখনও ঢুকতে পারে নি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে দাদামশায়ের স্নেহের বুনুনটা এতই ঘন যে, প্রায় কোথাও ফাঁক নেই, পিতা পুত্রের সম্পর্কের চেয়ে

অনেকটাই বড় তার আয়তন। কেননা দাদামশাই ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম শিক্ষক, বন্ধু ও খেলার সঙ্গী। চাকুরীর সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি জীবনটা তাঁর কেটেছিল বুদ্ধদেবকে নিয়ে। অল্প বয়সে বুদ্ধদেব স্কুলে ভর্তি না হলেও বাড়ীতে বসে তিনি যে ইংরাজী শিখেছিলেন তার তুলনা হয় না। জীবনের ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধদেব তোৎলামোর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। অস্পষ্ট বাক্যে দাদামশায়ের সঙ্গে কথোপকথনের একটা ঘটনা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল, যার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবের মেধার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন শীতের সকালে বেড়াতে গিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন -

"Do you see, what I see ?" বুদ্ধদেব উত্তরে জানিয়েছিলেন "A Tree, A Dog, A bullock cart" - ৩

এটা অবশ্যই সম্ভব হয়েছিল তাঁর গভীর ইংরাজী চর্চার ফলে। এছাড়া, এই শৈশব জীবনেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই ও ছিন্নপত্র পড়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

বুদ্ধদেবের শৈশবকালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অশান্তিতে ভরা। এই আবহাওয়া বুদ্ধদেবের মনে তেমনভাবে দাগ না কাটলেও, সেই হিংসাময় পরিবেশ থেকে তিনি কিভাবে বড় হয়ে উঠলেন তার উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর জন্মের সাড়ে তিন মাস আগে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল (১৯০৮ খ্রীঃ)। যে শহরে তাঁর শৈশব জীবন কেটেছিল সেই ঢাকা শহর ছিল তখনকার বিপ্লবীদের মূল আড্ডাস্থল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ খ্রীঃ) সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ ঘটনার এক তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, চরকা কাটা, খদ্দর পরা ইত্যাদি ঘটনা ধারার মধ্য দিয়ে স্বদেশীরা সে সময় বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল। এই শৈশবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রীঃ) ঘটনা বুদ্ধদেবের কিছুটা মনে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা বলতে শেষের দিকের দেড় বছরের ঘটনার কথাই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন বলে আমরা মনে করি। কারণ এই সময় বুদ্ধদেবের বয়স ছিল পাঁচ বছর আট মাস। এই যুদ্ধ তাঁর মনে কোন গভীর ও সুদূর প্রসারী রেখাপাত না

করলেও লেখাপড়ার সামগ্রীর মধ্যে তার প্রভাব পড়েছিল। তিনি সে সম্পর্কে জানিয়েছেন-

"মাঝে কিছুদিন আমাকে কাঠ পেন্সিলের বদলে কাগজের পেনসিল ব্যবহার করতে হয়েছিল, আর সাদার বদলে বালি-কাগজ। আর দিদিমা মাঝে-মাঝে উদ্বিগ্ন হতেন পাছে এবার হয়তো বালামের বদলে রেঙ্গুণি চাল খেতে হয় - এইটুকু ছাড়া আর কোন ফলাফল আমার মনে পড়ে না"।- ৪

এরপর এল সাম্যবাদের যুগ। তখন বুদ্ধদেবের বয়স নয় বছর (১৯১৭ খ্রীঃ) তাঁর এই বয়সে অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রীঃ তখন রাশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। এরপর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়, তখন বুদ্ধদেবের বয়স ছিল বারো বছর। ঐ বছরেই ভারতে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করা হয়। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উচ্ছ্বাস কিছুটা চাপা পড়ে গেছে। শুরু হয়েছে গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্য ও কৃষক আন্দোলন। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলেন এই পিতৃ-মাতৃহীন শিশুটি। এর পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব তেরো বছর বয়সে তাঁর দাদামশায় ও দিদিমার সঙ্গে কুমিল্লা থেকে নোয়াখালিতে চলে এসেছিলেন। নোয়াখালিতে থাকাকালীন মেঘনার ভাঙ্গনের বিভীষিকাময় স্মৃতি তাঁর আজীবন মনে ছিল।তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি-

"নোয়াখালির মেঘনার মতো এমন হতশ্রী নদী পৃথিবীর অন্য কোথাও আমি দেখি নি। রুক্ষ পাড়ি, ঘাট নেই কোথাও, কেউ নামে না স্নান করতে, কোন মেয়ে জল নিতে আসে না। তরণীহীন, রঙ্গিন পালের চিহ্ন নেই, জেলে-ডিঙির সঞ্চারণ নেই- একটিমাত্র খেয়া-নৌকা দেহাতি ব্যাপারিদের নিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় পারাপার করে। শহরের এলাকাটুকু পেরোলেই নদীর ধারে-ধারে ঘন বনজঙ্গল, নয়তো শুধু বালুডাঙ্গা, মাঝে মাঝে চোরাবালিও লুকিয়ে আছে- শীতে-গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ চরের ফাঁকে-ফাঁকে শীর্ণ জলধারা বয়ে যায়। বর্ষায় স্ফীত হয়ে ওঠে নদী। বিশাল অন্য তীর অদৃশ্য; কিন্তু তখনও চোখ খুশি হতে পারে না, বরং আমার ভয় করে সেই কালচে-ব্রাউন বিক্ষুব্ধ জলরাশির দিকে তাকাতে-যার উপর দিয়ে, বর্ষার ক-মাস, একটি নিঃসঙ্গ স্টীমার যাতায়াত করে

হাতিয়া-সন্দ্বীপে, পৃথিবী ত্যক্ত দুই দ্বীপ, যেখান থেকে প্রায়ই ভেসে আসে সর্পদংশনের ভীষণ সব কাহিনী। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঝড়ের সংকেত আসে মাঝে-মাঝে, ঘূর্ণি-হাওয়া এঁকে-বেঁকে পাৎলা বৃষ্টি পড়ে সারাদিন- বারো-শ ছিয়াত্তর বা অন্য কোন দূর-বছরের বন্যার স্মৃতি লোকেদের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে। আর এই সব-কিছুর উপরে আছে ভাঙন, অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য ভাঙন। প্রতি বর্ষায় নদী এগিয়ে আসে শহরের মধ্যে- প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে- বিরাট বুড়ো বটগাছ আর অগুনতি পাখির বাসা নিয়ে মস্ত বড় মাটির চাঁই ধ্বসে পড়ে হঠাৎ, ধোঁয়া ওঠে জলের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত, তার পরই নদী আবার নির্বিকার। আমি একাধিকবার এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলাম- একবার কিছুটা বিপজ্জনকভাবে।শোনা গেল অমুক সাহেবের বাংলোকে নদী ধরে ফেলেছে, তিনি সব জিনিশপত্র সস্তায় বেঁচে দিয়ে চলে যাচ্ছেন- রোববার সকালে দাদামশাই আমাকে নিয়ে হাজির হলেন সেখানে, আমার পড়ার মতো কোন বই যদি বা পাওয়া যায়। আমি যখন একমনে বই দেখছি, ঠিক তখনই প্রচন্ড শব্দে পাশের ঘরটি ধ্বসে পড়লো- একটি ফিরিঙ্গী যুবক জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালো, বরাত জোরে সে-ঘরে তখন আর কেউ ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে সব লোক বেরিয়ে এল রাস্তায়, দাদামশাই কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত ধরে বাড়ির পথ ধরলেন, কিন্তু তাঁর আগেই তিনি জুটিয়ে ফেলেছিলেন আমার জন্য এক বাণ্ডিল বাছা বাছা বই"।- ৫

বুদ্ধদেবের শিক্ষার জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজের লেখা থেকে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এরকম - নোয়াখালির এই ভাঙ্গনের ব্যথা বেদনা এবং অসুস্থ দাদামশাইকে নিয়ে বুদ্ধদেব ও দিদিমা ঢাকায় চলে আসেন, এই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বয়সে তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। বুদ্ধদেবের বয়স বেশি থাকায় দাদামশাই তাঁকে একবারে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করেছিলেন। প্রাক্ ম্যাট্রিকের শেষ দুটি ক্লাস তিনি এই স্কুলেই পড়েছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলেও দাদা মশায়ের কাছে তাঁর ইংরাজী ও বাংলার প্রশিক্ষণ অব্যাহত ছিল। স্কুলজীবনের প্রথমেই কবি অজিত দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অজিত দত্ত ছিলেন সেই সময় তাঁর সহপাঠী। তাঁর আরেক সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত। বুদ্ধদেব সম্পর্কে ভবতোষ দত্ত জানিয়েছেন -

"সহপাঠীরা দেখল একটি নতুন ছেলে এসেছে - বেশি কথা বলে না, টিফিনের সময় নানা ধরণের বই পড়ে। মাষ্টারমশাইরা প্রথম দিকে কিছু বুঝতে পারেন নি। কিন্তু

প্রথম পরীক্ষা দেবার পরেই সবার টনক নড়ল। ইংরেজী আর বাংলার খাতা দেখে মাষ্টারমশাইরা অভিভূত। হেডমাষ্টার খাঁ বাহাদুর তসদ্দক আহমদ ছিলেন তাঁর প্রকৃত গুণগ্রাহী। আর বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য প্রীতি ছিল। ইস্কুলে যে একটি প্রতিভাবান ছেলে এসেছে সেটা প্রায় সবাই স্বীকার করে নিলেন।" - ৬

বুদ্ধদেবের কলেজিয়েট স্কুলের পিছনেই ছিল জগন্নাথ কলেজ। স্কুলে যাতায়াতের সময় তিনি কলেজের ছাত্রদের দেখতেন। তিনি এই কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন ১৯২৩ খ্রীঃ "পতাকা" ও "ভগ্নরথ" নামে দুটি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়েই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেয়ে বুদ্ধদেব চার বছরের ছোট ছিলেন। এই সময় দাদামশায়ের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর ঘটনা তাঁকে আরেকবার পারিবারিক হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। শৈশবজীবনে মা ও দাদামশায়ের মৃত্যু বুদ্ধদেবের জীবনকে কঠিন বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে ছিল। বুদ্ধদেব এই পারিবারিক অশান্তির পরিবেশে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিক:পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম হয়ে পাশ করেন এবং ঐ বছরেই ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলেন। এই দুঃসময়ে দিদিমা ও বুদ্ধদেবকে আশ্রয় দেন তাঁর দিদিমার মেজভাই নগেন্দ্রনাথ। জীবনের প্রতি বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এই সময় থেকেই তৈরী হয়েছিল, সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সাহিত্য জগতে এক অভিনব শিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কলেজ জীবনেই তাঁর অনেক রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব "পতাকা " ও "ভগ্নরথ" পত্রিকা সম্পাদনা করে যখন জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন সেই বছরই জগন্নাথ কলেজের "কল্লোল" (১৯২৩ খ্রীঃ) পত্রিকার সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাসের সঙ্গে বুদ্ধদেবের পরিচয় হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব যখন ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়েন সে সময় "কল্লোল" পত্রিকায় প্রথম লেখা চতুর্থ রচনা "রজনী হ'লো উতলা " (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। এই গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে ঝড়ের মতো অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। বুদ্ধদেবের জীবনে বার বার তাঁকে এই অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম অভিযোগ করেন বীণাপাণি দেবী (মিসেস এ.সি.রায়) "আত্মশক্তি" পত্রিকায়। তিনি লিখেছিলেন -

"এমন লেখককে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিৎ ছিল"। - ৭

আবার আরেক সমালোচক লিখেছিলেন -

"লেখক যদি বিয়ে না করে থাকে তবে যেন অবিলম্বে বিয়ে করে, আর বউ যদি সম্প্রতি বাপের বাড়ি থাকে তবে যেন আনিয়ে নেয় চটপট"। - ৮

এছাড়া ঐ গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করেন সজনীকান্ত দাস। তিনি তাঁর "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় রবী-দ্রনাথকে এই ধরনের রচনার বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য প্রার্থনা করলেন। -

"লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমন উচ্ছৃঙ্খল। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি, এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্ক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার-শ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করার একটা চেষ্টা দেখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এই মাসের (ফাল্গুন, ১৩১৩) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর "রজনী হ'লো উতলা " নামক একটি গল্প ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হবার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলার সাহিত্যকে রূপ রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি " - ৯

এই চিঠির উত্তরে রবী-দ্রনাথ লিখেছিলেন -

"কল্যাণীয়েষু,

কঠিন আঘাতে একটা আঙ্গুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনও যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুঁচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এ স্থলে গ্রাহ্য না-ও হতে পারে। আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত, উদভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রভাব - তাই এখন বাগবাত্যার ধুলো দিগ্‌-দিগন্তে

ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলার বলব। ইতি ২৫শে ফাল্গুন ১৩১৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" - ১০

অশ্লীলতার দ্বিতীয় অভিযোগ দেখা যায় তাঁর "সাড়া" (১৯২৬ খ্রীঃ) উপন্যাস প্রকাশের পর হতে। এই উপন্যাস প্রকাশের পর প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। অশ্লীলতার অভিযোগ তাঁর সাহিত্য জীবন ব্যক্তি জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। এই অভিযোগ তাঁর জীবনে প্রথম নয়। তাঁর আঠারো বছর বয়স থেকে তাঁর জীবনের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত - অভিযোগ তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। শেষে এর প্রতিক্রিয়া আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, এমনকি বুদ্ধদেব বসুকে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। শুধু "সাড়া" উপন্যাসই নয়, "রাত ভ'রে বৃষ্টি" (১৯৬৮খ্রীঃ) উপন্যাসের জন্য ও আদালতে নিজ পক্ষ সমর্থন করতে হাজির হতে হয়েছিল। তাছাড়া সমরেশ বসুর "প্রজাপতি" (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের জন্য অশ্লীলতার প্রশ্ন আদালত পর্যন্ত গড়ালে বুদ্ধদেব বসু সমরেশ বসুর পক্ষ সমর্থন করে আদালতে সাক্ষী দেন। সাহিত্যের লেখা সম্পর্কে লেখকের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় না বলে "আনন্দবাজার পত্রিকা" অভিমত প্রকাশ করে। এই বিপর্যস্ত সময়ে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় বুদ্ধদেবকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু নিজেই জানিয়েছেন -

"বন্ধুরা তর্ক চালায় রাজনীতি নিয়ে, আমি নিঃশব্দে শুনি, অথবা শুনি না; অবন্ধু কেউ গায়ে পড়ে মন্তব্য করে 'কবিতা লেখার চেয়ে লণ্ঠন বানানো ভালো' - যে-কথার সত্যি কোন উত্তর নেই - মাঝে-মাঝে রাস্তায় কোন সাইকেল আরোহী বালক আমাকে কবি ! কবি ! বলে টিটকারি ছুড়ে চলে যায়।" - ১১

বুদ্ধদেব বসু এই ভাবে বিভিন্ন বিতর্ক পর্ব অতিক্রম করে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি এর জন্য মাসে ২০ টাকা বৃত্তি পান। ঐ বছরের জুলাই মাসে তিনি ইংরাজীতে অনার্স সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই জুলাই মাসেই হাতে লেখা "প্রগতি" বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি ছাত্র সংসদ কর্তৃক পরিচালিত সাহিত্য বিভাগের ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর

পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও মেডেল লাভ করেন। শুধু বি.এ. নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে ছিলেন। সে আমলে একদিকে বুদ্ধদেব একজন সাহিত্যের কৃতী ছাত্র অন্যদিকে অশ্লীল লেখার সমালোচনায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সে সময়ে সাহিত্যে বেশি নম্বর দেওয়া হত না কিন্তু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। এটা সেই সময় একটা কৃতিত্বের পরিচয়। এখনকার দৃষ্টিভঙ্গিতে খুব সহজ ব্যাপার মনে হলেও সে সময় ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া মানেই ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়া। প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে প্রথম থেকেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব এইভাবে শিক্ষা জীবনের সাড়ে-নয় বছর ধারাবাহিক ভাবে ঢাকায় কাটিয়েছিলেন, পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতায় চলে আসেন। কয়েকটি টিউশন করে অসুস্থ দিদিমাকে নিয়ে বুদ্ধদেব দিন অতিবাহিত করেছিলেন। এর পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রানু সোমের (বিবাহের পরের নাম প্রতিভা, পিতা আশুতোষ সোম, মাতা সরযুবালা) সঙ্গে পরিচয় হয়। বুদ্ধদেবের "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে নাট্য রূপটি মঞ্চস্থ করার মধ্যে দিয়ে রানু সোমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুদ্ধদেব এই পরিচয় সূত্রে রানু সোমের বাড়িতে দুই বেলা আসতে শুরু করেন। প্রাক্ বিবাহে বুদ্ধদেবের এই আসা নিয়ে রানু সোমের বাড়িতে শুরু হয় অশান্তি। বিয়ের আগে বুদ্ধদেব ও রানুর মেলামেশা রানুর মামা ভালোচোখে দেখেন নি। বুদ্ধদেব বসুকে মাতাল অপবাদও শুনতে হয়েছে। রানু সোমের বাড়িতে বুদ্ধদেবের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাবা, মা, দাদা, মামা এক গোপন বৈঠক করেছিল। এই বৈঠকে গুরুতর তর্ক বেঁধে যায়। তর্কটা ছিল, বুদ্ধদেবের ঘন ঘন আসা এবং বিয়ের প্রস্তাব করা নিয়ে। রানুর মামা বলেছিলেন -

"আত্মপ্রত্যয় ধুয়ে জল খাক আর আপনারা দেখুন। কী করে এভাবে প্রস্তাবটা করতে পারল ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনারা কি জানেন, ওর মদের খরচ কত? সিগারেটের খরচ কত?" - ১২

যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিভা বসু বুদ্ধদেব বসুকে মদ্যপ বলে জানেন নি। শেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হল।

বুদ্ধদেবের কাছে জীবন ছিল আর্ট এবং তাকে সাহিত্যে উদ্ভাসিত করাই তাঁর লেখার ভঙ্গি। যার ফলে তাঁর জীবন ও সাহিত্য একচ্ছত্র বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কখনও তাঁর জীবন সাহিত্যকে আবার কখনও সাহিত্য জীবনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সাহিত্য ছিল তাঁর কাছে এক জীবনাদর্শ। এই জীবনাদর্শ সাধনাই ছিল তাঁর সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে বুদ্ধদেব বসু বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। বিদেশের ঘটনাবলীর গুরুত্বের একটা ক্রমপর্যায় তাঁর মানস পটে অসাধারণ দাগ কেটেছিল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব বসুর বিদেশ যাত্রার প্রথম সুযোগ তৈরী হয়েছিল, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। বিষয়টি ছিল অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে ভাষা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া। কিন্তু নানা অসুবিধায় সে যাত্রা ব্যর্থ হয়।

তারপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম আমেরিকা গিয়েছিলেন। একটি সংস্থার আর্থিক অনুদানে তাঁর এই যাত্রা হয়েছিল। কাজটি ছিল পিটার্সবার্গের "পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেন"-এ এক বছর ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনা করা। তখন বুদ্ধদেবের সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না, কারণ "স্টেটসম্যান" পত্রিকার সম্পাদনার কাজ তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের বন্ধু তৎকালের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির এই বিদেশ যাত্রার যোগাযোগের ব্যবস্থা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। পারিবারিক সাক্ষ্যে আরও জানা যায়, ১৯৫৪ তে আমেরিকা থেকে ফেরার পর প্রথম রেফ্রিজারেটর এবং টেলিফোন এসেছিল তাঁদের বাড়িতে। ব্যক্তিগত অভ্যাসেরও অনেক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেই সময়। আগে তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়া পরতেন না, আমেরিকা যাবার সময় প্রথম তিনি স্যুট পরেন। দেশে ফিরে, বাড়িতে পরার পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবী ও বিদ্যাসাগরি চটি থাকলেও, বাইরে যাবার পোশাক সাধারণতঃ প্যান্ট-শার্ট হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি সেই পোশাকেই যেতেন। শীতকালে স্যুট পরতেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় সুসময় ছিল এই সময় তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই সাফল্যের ছায়া পড়েছিল তাঁদের জীবন যাত্রায়। প্রতিভা বসুর অনেক কালের শখ মেটাবার জন্য গাড়ি কেনা হল একটি, পুরোনো গাড়ি। এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় সদ্য পি.এইচ.ডি. করতে যাওয়া কনিষ্ঠ কন্যা মীনাক্ষী বসু (পরে দত্ত, ডাক নাম রিমি)কে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন -

"আসল কথাটাই বলিনি - তোর মা জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন - গাড়ি। তিনি নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই এই তাল তুলেছিলেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস

212073
02 FEB 2009
LIBRARY

করিনি সম্ভব হবে - তেমন প্রয়োজনও বোধ করি নি গাড়ির, এখনও করিনা। বাহাদুর যার ফার্মে কাজ করেন, সেই ভদ্রলোকের দশ বছরের পুরানো একটা Standard Vanguard কেনা হল সাড়ে তিন হাজার টাকায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকার জোগাড় ছিল না। কিন্তু বইয়ের প্রকাশকরা এমন লোলুপ যে, আশাতীত ভাবে অর্থেরও সংস্থান হলো। চার দরজার বড় গাড়ি, ছ-জন পর্যন্ত বসা যায় (মিমির মতে দশ জন) চেহারাটা তেমন ঝকঝকে আর কি হবে। আমার মত ছিল না, এ এক রাক্ষুসে খরচের ব্যাপার। আমরা কতটুকু বেরোই সত্যি বলতে ?" - ১৩

বুদ্ধদেব বসুর বিদেশ যাত্রার আরো একটি ঘটনায় দেখা যায়, যা তাঁর ব্যক্তি জীবন ও কর্মজীবনকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বিরোধী একটি লবি ছিল। তাঁরা চাইছিলেন বুদ্ধদেবকে হতমান করতে। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বুদ্ধদেবের বিদেশ যাত্রার ছুটি মঞ্জুর করাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল বুদ্ধদেবের ছুটি নামঞ্জুর করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর বুদ্ধদেব বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব আমেরিকায় ইন্ডিয়ানা রাজ্যের ব্লুমিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে বিদেশ গিয়েছিলেন। তাঁর পড়াবার বিষয় ছিল "পূর্ব-পশ্চিমী সংস্কৃতি বিষয়ক বিচার"। এই উপলক্ষে গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্যের তুলনা করে তাদের মধ্যেকার চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য গুলির আলোচনা করতে গিয়েই "মহাভারতের কথা" গ্রন্থের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে।

এ প্রসঙ্গে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে আরেকটি বিদেশ যাত্রার ঘটনা উল্লেখ করা দরকার যার প্রতিক্রিয়া দেশে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। এই ঝড়ের কারণ ছিল বিদেশে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য। এই ঘটনায় কলকাতায় বুদ্ধদেবকে নিয়ে তুমুল

সমালোচনা দেখা গেল। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে মন্তব্যটি আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে-

"Rabibdranath's works are European literature written in the Bengali language, and they are the first of their kind. This remark made by a Bengali poet of today, is of course an exaggeration, but it is exaggeration of this sort that reveal the truth in a flash and make us cogitate on its implication." - ১৪

এই মন্তব্য বিষয়ে বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে কোলকাতায় বিরাট ঝড় উঠেছিল। ছ-মাস পরে বিদেশ থেকে ফিরে এসে বুদ্ধদেব দেখলেন তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে একটি প্রবল সমালোচনা বয়ে চলেছে। সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় হল এই যে, সে লেখাটি ষোল মাস আগে রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়। সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ হয় "যুগান্তর" পত্রিকায় -

"বুদ্ধদেব সম্প্রতি বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো প্রভৃতি কবিদের লেখা পড়তে শুরু করেছেন - ভালো কথা, কিন্তু অস্থানে-কুস্থানে এই নবীন উৎসাহের জ্ঞানের প্রয়োগ, বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশ বা আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে আমরা মর্মাহত"।- ১৫

যে মন্তব্য ঘিরে এত সমালোচনা তা বুদ্ধদেব বসুর ছিল না বলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবকে সারাজীবন রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ তাড়া করে ফিরেছে। ছোট খাটো দু-এক খানা লেখার সমালোচনা ও লেখক বিষয়ে কটূক্তি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ "শনিবারের চিঠির" সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিলেন। বলা যেতে পারে সেই কল্লোলের যুগ থেকেই। কিন্তু ব্যাপারটা জটিল আকার নিয়েছিল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বুদ্ধদেবের ইংরাজী ভাষণে - "The age that had produced Tagore was long over" আর "অমৃতবাজার" পত্রিকায় এই বক্তৃতার জন্য বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন "The age of Rabindranath is over" এ কথায় রবীন্দ্রনাথও ভুল বুঝেছিলেন। অপপ্রচারের ফলে রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ তাঁকে সারা জীবন শুনতে হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সম্পর্কের ইতিহাসে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আক্রমণের অভিপ্রায় বুদ্ধদেবের মধ্যে ছিল না। বরং বুদ্ধদেব তাঁর রচনা

রবীন্দ্রনাথকে মন্তব্যের জন্য পাঠাতেন, তাঁর মূল্যবান বক্তব্যকেই লেখক চরম গুরুত্ব দিতেন।

রবীন্দ্র-বুদ্ধ সম্পর্কের বিষয়ে বুদ্ধদেবের সেভাবে কোন বিদ্বেষভাব লক্ষ করা যায় না। তিনি বলেছেন আমাদের সম্পর্ক Complex and vital relationship বলে।তিনি রবীন্দ্রনাথকে মনেপ্রাণে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা বক্তৃতা দিয়েছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে বলেছিলেন -

"Recently, in Bengal, a magazine which claims to be avant-garde roundly deplored my blind devotion to Tagore. Others, finding me lacking in reverence for the great man, attacked me with exemplary gusto. It did not surprise me that the two charges were contradictory. For many a time before this I have been hauled up as an idolater or an iconoclast, or both at once. To you, possibly, this would be an indication of how peculiar and personal my relationship is with Tagore. That of journeyman and master it certainly is, and of a hungering reader and a poet who is apparently. For I have the awful feeling that if Tagore had not existed, I as I am today would not have existed either" - ১৬

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধুরতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল- বুদ্ধদেব বসুই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নামে সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণার আবেদন করেন। তিনি এই আবেদন করেছিলেন "কবিতা" পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে। তিনি রবীন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটির কাজকর্মের সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বুদ্ধদেবের "কবিতা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনের গভীরে স্থান দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব শেষ বারের মতো পৃথিবী ভ্রমণ করেন ১৯৬১ সালে, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল সুদূর জাপান, হনুলুলু, আমেরিকা, য়ুরোপ থেকে। ঐ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু

দুজনে রেঙ্গুন, হংকং হয়ে জাপান পৌঁছে ছিলেন। সেখানে তিনি দশ দিনে গোটা কয়েক বক্তৃতা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে।সেখান থেকে হনুলুলু হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। এখানে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন বীট নামক একটি বংশের সঙ্গে। বীটদের অন্যতম প্রধান কবি অ্যালেন গীন্‌সবার্গের সঙ্গেও পরিচিত হলেন।

বিদেশ যাত্রা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বুদ্ধদেব তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা তাঁর অধ্যাপক জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ককে তুলে ধরব। একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুদ্ধদেবের জীবনে বড় অংশ অধিকার করেছিল তুলনামূলক সাহিত্যের পঠনপাঠন থেকে শুরু করে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণবেন্দু দাশগুপ্ত। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক দিব্যেন্দু পালিত লিখেছিলেন -

"শিক্ষক হিসাবে বুদ্ধদেব যে শুধু স্নেহশীল বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন তা নয়। বরং পড়াশুনার ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাঁকে মনে হত অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর ; সামান্য অবহেলায় হয়ে পড়তেন অসন্তুষ্ট। মনে আছে তাঁর কাছে প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসের অভিজ্ঞতা। আমরা জনা চার-পাঁচ যারা তাঁর ক্লাসে এসেছিলাম, প্রত্যেকের খাতাই কলমের আঁচড়ে হয়ে গেছে ছিন্ন-ভিন্ন ; গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করেই বুঝলাম, ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। তার পরেই মুখ খুললেন। - তোমরা সাহিত্যের ছাত্র অথচ সামান্যতম ভাষা জ্ঞান হয় নি এখনও। এটা খুবই লজ্জার কথা। - বলে হঠাৎ তাকালেন আমার দিকে। - দিব্যেন্দু, তোমাকেও বাদ দিতে চাই না। তুমি ইতিমধ্যে গ্রন্থকার হয়েছ, কিন্তু গদ্য লিখেছ ক্লাস সিক্সের ছাত্রের মতো। তোমার জানা উচিত ব্যাকরণসম্মত হওয়াই ভাষার একমাত্র গুণ নয়" - ১৭

বুদ্ধদেবের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ ছাত্রজীবনে দিব্যেন্দু পালিত একবার জটিল চক্ষু রোগের শিকার হয়েছিলেন।

তিনি প্রায় অন্ধই হয়ে গিয়েছিলেন সেই সময় তাঁর শিক্ষক বুদ্ধদেব বসু তাকে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন তা ভুলবার নয়। লোক মুখে এই খবর শুনে বুদ্ধদেব দিব্যেন্দুকে চিঠি লিখে তাঁর চিকিৎসার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

এই ভাবে বুদ্ধদেব বসুর জীবনের গণ্ডী শুধু বঙ্গদেশ বা ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জগৎ সভায় নব নব ইতিহাস সৃষ্টিতে ধাবমান এক পাখি ছিলেন তিনি। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি থেকে উড়তে শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা, জাপান, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া পাড়ি দিয়েছিলেন। যাদবপুরের চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও তিনি সারাজীবন ঐ সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার চাপে তিনি যখন হতাশায় দিন অতিবাহিত করছেন তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বন্ধু হুমায়ুন কবির। তিনি তাঁর দিকে সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনায় ও "আমার ছেলেবেলা" গ্রন্থে অর্থ ও প্রকাশনার সম্পর্কের বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছেন। কারণ অর্থের জন্যই তাঁর কিছুটা লেখার তাগিদ লক্ষ করা যায়। তাঁর মনে বিভিন্ন আশা ছিল। সেই সব আশার মধ্যে সবচেয়ে বড় আশা ছিল বিদেশ ভ্রমণ, কিন্তু হিংসা, স্বার্থপর প্রতিষ্ঠানের ঈর্ষা তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল অন্নের হাহাকার। অবশ্য বুদ্ধদেবের এই অদৃশ্য ঈর্ষার উপস্থিতি তাঁর জীবনে অহরহ ঘটতে দেখি। বুদ্ধদেব বসুর জীবনই যেন তাঁর এক নির্মম প্রতিবেদন। তাই সব স্বপ্ন, সব আশা তাঁর মানসপটে স্বপ্ন হিসাবেই থেকে গেল। বাস্তবের রাস্তায় তার প্রকাশ হতে অতি সামান্যই দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁর এই জীবনপাঠ অনুধাবন করে আমাদের মনে হয়েছে তিনি মানুষ হিসাবে ছিলেন অকুতোভয়, তীক্ষ্ণ মেধাবী, সংবেদনশীল, কল্পনা জগতের নির্জনতা পিয়াসী এক সাহিত্যিক। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। দেশী

ও বিদেশী সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের চিন্তা চেতনা ধারণা রীতি তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পে, কাব্যে, উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি জীবনকে বিভিন্ন কৌণিক দূরত্বে পরিমাপ করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর উপলব্ধি নির্যাসই ছিল সাহিত্যকেন্দ্রিক। তাঁর সৃষ্ট শিল্পের মনন অনির্বাণ জ্যোতি হয়ে ভেসে উঠেছিল সাহিত্যে। সুতরাং তাঁর জীবন খাতার রং সাহিত্যের পাতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেবের জীবন আমাদের এই সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল যে, জীবন মানে কিছু ঘটনার সমষ্টি, জীবন মানে মানুষের সঙ্গে মানুষের বাহ্যিক লেনদেন নয়। জীবন মানে নর-নারীর পারস্পরিক অচেতন দেহজ কামনার আকর্ষণ, দূরাগত এক অন্তহীন দ্বান্দ্বিক স্নেহ, প্রেমালাপের মধ্যে ব্যর্থতা ও হতাশার সমুদ্র পার হওয়া ও প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া। আপোশ নয়, বিদ্রোহ ঘোষণা, মনের বদ্ধ জানালা ভেঙ্গে যেতে চায়, তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা সর্বগ্রাসী, সমাজের অনুশাসন সেখানে তুচ্ছ। তাঁর জীবন থেকে আমরা একটা কথা সহজে বুঝতে পারছি যে, জীবনের পরিণতিতে তাকে বিভিন্ন সাহিত্য লেখার বিভিন্ন বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বুদ্ধদেব সাহিত্যের নানা শাখায় ও সাহিত্য সমালোচনায় এবং কবিতা পত্রিকায় সম্পাদনায়, গল্প-উপন্যাস-নাটকে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইংরাজীতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করে ইংল্যান্ড, আমেরিকায় খ্যাতি পেয়েছেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও রবীন্দ্র কাব্য আলোচনায় অনেক বিতর্কের সূচনা করেছেন। এই বিতর্কিত খ্যাতনামা কবি ১৯৬৭ সালে "তপস্বী ও তরঙ্গিণী" নাটকে এ্যাকাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক "পদ্মবিভূষণ" উপাধিতে সম্মানিত হলেন। তিনি এই খেতাব গ্রহণ করতে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নি। আবার এই খেতাব প্রত্যাখ্যানও করেন নি বলে জানা যায়।

বুদ্ধদেবের এই ঘটনা বহুল জীবনের পরিচয় দেবার পর এবার তাঁর সাহিত্য আলোচনায় দেখা যায় বহু বিস্তৃত ছিল তাঁর সাহিত্য প্রতিভা। কাব্য, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ গ্রন্থ মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা আজ দুইশত-র কাছাকাছি। তাঁর কাব্যে নূতন চেতনা, উপন্যাসে নূতন বিষয় নির্বাচন, প্রবন্ধ ও পত্রিকা সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আকাশটি হয়েছিল প্রসারিত। এসবের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব আপন স্বাতন্ত্র্যের বলয়টিকে করেছিলেন দীর্ঘ ও উজ্জ্বল।

বুদ্ধদেব আর পাঁচ জন কবির মতো সাহিত্য জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়েই। তাঁর শৈশব থেকেই এই কবিতা লেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। তিনি "নদী" সম্পর্কিত প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন ইংরাজীতে। তাঁর "ডাক" নামে একটি কবিতা তাঁর বালক বয়সের প্রতিভার নিদর্শন বহন করে। এই সময় বুদ্ধদেবের বয়স ছিল বারো বছর। কবিতাটি হলো –

ডাক

বুদ্ধদেব বসু

ঐ শোনো ডাক
ওরে মূঢ়, বঞ্চিত, নির্বাক
ওরে মূক, ওরে বন্ধ, ওরে সন্দ [?], মলিন, বধির,
একবার জেগে ওঠ চঞ্চল অধীর।
সুপ্তির জড়তা ভেদি ঐ শোনো উদাত্ত সে ধ্বনি,
মায়ের শৃঙ্খল খসি বাজিতেছে ওই রণরণি।
একবার জেগে উঠে শোনো সেই ডাক,
হে চির নির্বাক !
ঐ শোনো মাতৃ বন্দনার,
তরুণ কণ্ঠের বাণী মাতৃমন্ত্র করিছে প্রচার,
জীবন করিয়া পণ ঐ দেখ কত মুক্তি-সেনা,
কারাগারে হাসিমুখে সহিতেছে অসীম লাঞ্ছনা।
শুনিয়া তাদের ডাক রক্ত কি নাচে না ?
সকল হীনতা ছাড়ি মাতিবি না – ওরে শান্তি সেনা !

বহে নাকি উষ্ণ হয়ে বক্ষ মাঝে চঞ্চল রুধির ?

হে চির সুধীর !

একবার হবি না পাগল ? - ১৮

বুদ্ধদেব বসু মূলতঃ কবি। তাঁর কাব্য জীবনের সূচনা হয়েছিল "মর্মবাণী" (১৯২৪ খ্রীঃ) থেকে। বুদ্ধদেবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মর্মবাণী" থেকে "শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর" পর্যন্ত (১৯৫৩ খ্রীঃ) এই ২৯ বছরে তাঁর জনপ্রিয় কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়ে ছিল। তারপর ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে মোট পাঁচটি কবিতার সংকলন। এই পাঁচটি ছিল দেশি বিদেশী কবিতার অনুবাদ - কালিদাসের অনুবাদ (১৯৫৭ খ্রীঃ), ভিক্টর জিভাগো (১৯৬১ খ্রীঃ), শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা (১৯৬১ খ্রীঃ), হোল্ডালিপের অনুবাদ (১৯৬৭ খ্রীঃ), রিলকের অনুবাদ (১৯৭০ খ্রীঃ) ইত্যাদি। তবে আমরা বলতে পারি যে, ১৯৪৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৮ খ্রীঃ,- এই পনেরো বছর বুদ্ধদেব বসুর কবিতা রচনার স্বর্ণযুগ। তার পরও অনেক ভালো কবিতা তিনি নিশ্চয় লিখেছিলেন কিন্তু সেগুলো সময়ের আলোয় দীপ্তি পায় নি। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থগুলি হল- মর্মবাণী (১৯২৫ খ্রীঃ), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০ খ্রীঃ), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩ খ্রীঃ), শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর (১৯৪৫ খ্রীঃ), নতুন পাতা (১৯৪৩ খ্রীঃ), কঙ্কাবতী (১৯৪৩ খ্রীঃ), দময়ন্তী (১৯৪৪ খ্রীঃ), দ্রোপদীর শাড়ী (১৯৪৮ খ্রীঃ), স্বাগত বিদায় (১৯৭১ খ্রীঃ), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮ খ্রীঃ), মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬১ খ্রীঃ), একদিন ঃ চিরদিন (১৯৭১)।

বুদ্ধদেবের "মর্মবাণী" কাব্যটি "কল্লোল" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যে কবির বক্তব্যের নূতনত্ব ছিল না। কৈশোরের আড়ষ্টতা ছিল কাব্যের সর্বত্র। বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যে রবীন্দ্র ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে নূতন কাব্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলি সেকালের তরুণ সমাজের প্রিয় ছিল। অনেকেই তাঁকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত নূতন পথের কবি বলে ভূষিত করেছিলেন। প্রেম, রোমান্স, সৌন্দর্য, নারী বন্দনা, যৌন চেতনার বিষয়গুলি তাঁর কবিতায় আবেগ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উঠে এসেছে। মাঝে মাঝে তিনি সমাজনীতি ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙ্গবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। যা বাংলা কাব্যে পালা বদলের ইঙ্গিত বলা যায়, কিন্তু কবিগুরুর জ্যোতিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

কবি বুদ্ধদেবের গর্ব ও বিদ্রোহ তাঁর কাব্য কবিতার মধ্যেই প্রথম ফুটে উঠেছিল। তাঁর কবিতার প্রেম, রোমান্স, নারী বন্দনার ও যৌন চেতনায় বিদ্রোহের ভাবগুলি কবিতায় বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। তিনি প্রচলিত আদর্শ ও সমাজ সংস্কারের ধারা উত্তরণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি "বন্দীর বন্দনা" কাব্যের এই নামে কবিতায় বলেছেন-

"আমি কবি, এ সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর -
অমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার,
তবু কাব্য রচিলাম।
এ গর্ব বিদ্রোহ আমার।" - ১৯

এই বিদ্রোহের সুর বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন ফরাসী কবি বোদলেয়ারের কাছে। এখানে প্রকৃতি ও স্বাভাবিকের বিকল্প হিসাবে শিল্পের ও কৃত্রিমের জয়ধ্বনি শোনা যায় বোদলেয়ারের কবিতায়। এই ভাবনা ও ধারণাগুলি বুদ্ধদেব আত্মস্থ করেছিলেন। পরবর্তী কালে "মরচে পড়া পেরেকের গান" ও "বন্দীর বন্দনায়" এই জয়গান শোনা যায়। "বন্দীর বন্দনা" কাব্য থেকেই বুদ্ধদেব কাব্য জগতে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছিলেন। এই কাব্যটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের অকুণ্ঠ প্রসংশা করেছিলেন। এই কাব্যের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে জলভরা ঘন মেঘের মত সূর্যের আলোয় রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত বলে মনে হয়েছিল। এই কাব্যে বন্দীর বন্দনার দুটি অর্থ বুদ্ধদেব বসু করেছিলেন। প্রচলিত অর্থে বন্দীর কাজ হল রাজাকে স্তুতি করা, কিন্তু বুদ্ধদেব তা করেন নি। অপর অর্থ হলো অবরুদ্ধ কয়েদী। বুদ্ধদেব এই কাব্য গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দির বুর্জোয়া মর্যাদাবোধ উড়িয়ে দিয়ে রক্ত মাংসের মানুষের জীবন ও যৌবনের উচ্ছ্বাসকেই তুলে ধরেছেন। কারণ বুদ্ধদেব বসু ছিলেন প্রধানতঃ প্রেমের কবি, এজন্য "বন্দীর বন্দনা" কাব্যগ্রন্থে তার প্রেমের রূপটির নানান বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। তবে কবি এই কাব্যে প্রেমকে অতীন্দ্রিয় ও অমৃত ভাবনার চোখে দেখেছেন। অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানেই তিনি অন্য ভাবাদর্শের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব "শীতের প্রর্থনা ঃ বসন্তের উত্তর" কাব্যগ্রন্থে জীবন দর্শন ও গঠন রীতির দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের স্বাদ এনেছিলেন। এই কাব্যের দুটি বিখ্যাত কবিতা "মৃত্যুর পর" ও "জন্মের আগে", জীবন দর্শনের দলিল রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর যৌবনকালে তিনি যৌবনের বন্দনা করেছেন, আবার যৌবনান্তেও তাঁর বিন্দুমাত্র ভাঁটা দেখি না। কেননা জীবন ও যৌবনের পূজারী ছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি এই যৌবনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টির রহস্যকে অনুভব করেছিলেন। তিনি রাত্রি, পৃথিবী, শীত, বসন্ত, ঋতুরাজের মধ্যে দিয়ে এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা", "কঙ্কাবতী", "নূতন পাতা" কবিতাগুলি তাঁর ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। বুদ্ধদেব বসুর আরো একটি কাব্য "কঙ্কাবতী"। সেখানেও প্রেমের বিচিত্র রূপই ফুটে উঠেছে। এই কাব্যে কবিতার সংখ্যা আটত্রিশ। বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী প্রেমের কাব্য, এই কবিতাগুলির মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বুদ্ধদেব সেই কবি, যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন। সময় ও মৃত্তিকার মধ্যে বাসা বেঁধে কঙ্কাবতী হলো মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য। "শেষের রাত্রি" কবিতার নায়িকা কঙ্কা - এই নামটিতে রয়েছে রূপকথার স্পর্শ এবং কবিতায় দেশজ লোকসাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে। শুধু দেশজ লোক সাহিত্য নয়, "কঙ্কাবতী" গ্রন্থে বুদ্ধদেব দেশজ চলিত কথ্য ভাষার প্রয়োগ শুরু করলেন এবং কথ্য ভাষার মধ্যে থেকে নিষ্কাশন করে এনেছিলেন সুন্দরতা। এই প্রথম তাঁর আঙ্গিক চেতনায় আধুনিকতা শুরু হল।

বোদলেয়ারের পর আরেক জন ফরাসী কবির সঙ্গে বুদ্ধদেবের লেখার সাদৃশ্য দেখা যায়, তিনি হলেন র‍্যাবোঁ। র‍্যাবোঁর কবিতা শুধু বিদ্রোহের কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আগাগোড়া আছে শৈল্পিক বিদ্রোহ। তাঁর লেখার মধ্যে নগরচিত্র নির্মাণে এই চিত্র ফুটে ওঠে নি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে মারিয়া রিলিকের জীবনের একটি সুন্দরতম সাদৃশ্য লক্ষ করি। বুদ্ধদেবের "নতুন পাতা" কাব্য গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে রিলকের কবিমনের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর "নতুন পাতা" কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত "চিল্কায়

সকাল" একটি অসামান্য কবিতা। কবির এই কবিতার সঙ্গে সৌন্দর্য ও প্রেমের যুগল সত্ত্বা লক্ষ করা যায়। কবি এখানে প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারী। কবিতাটিতে কবির সমস্ত আবেগ, উত্তাপ, চেতনা, রোমান্স প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে অলঙ্কারহীনতায়, প্রকাশের দিক অত্যন্ত ঋজু এবং কবি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর অন্তরের বিহ্বলতার বর্ণনা দিয়েছেন। এই সংহত অথচ আবেগমিশ্রিত বাক্যাংশ একাধিকবার কবিতায় প্রয়োগ হয়েছে। আবার চিল্কাকে কেন্দ্র করে নিঃসর্গ চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। "দময়ন্তী" বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি পুরাণাশ্রিত কাব্য। পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করে কবি নর-নারীর জৈবিক প্রেমের অনিবার্য কঙ্কালময় পরিণতি দেখিয়েছেন। নল ও দময়ন্তীর পুরাণ কাহিনীকে কবি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই কবিতায় বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছিলেন নিজের জীবনে যে যৌবন অতীত, সে আবার ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যময় জীবনে। কবি মনে করেন দময়ন্তী স্বর্গের দেবতা নলকে অনেক শর্তে বরণীয় করে তুলেছিল। কবির আশা তাঁর কন্যা মর্ত্যের এই দাবী পূরণ করবে। কন্যার মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করলেন চিরন্তন দময়ন্তীকে। এই কাব্যের মূল দুটি ভাব হল বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রস। এই কাব্যে কবি আবেগ সঞ্চারী স্বভাবের সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছেন। এখানে তিনি "ইলিশ", "ব্যাঙ", "কুকুর", "জোনাকী" প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়কে তুলে ধরেছেন। এছাড়া এই কাব্যে বুদ্ধদেবের তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। (ক) প্রেম, (খ) আধুনিক জীবনের অস্তিত্বগত জটিলতা, (গ) অবহেলিত বিষয়ের সৌন্দর্য সন্ধানের প্রবণতা। প্রথম ধারায় প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা দময়ন্তী, দ্বিতীয় ধারা "ছায়াছন্দ", "হে আফ্রিকা"। তৃতীয় ধারায় "ইলিশ", "ব্যাঙ" ইত্যাদি। কবিতা গুলিতে এই তিনটি ধারা প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিকতার নিদর্শন। এছাড়া "দময়ন্তী" কাব্যে যৌবনের উচ্ছ্বাস ও আবেগ প্রকাশিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর কবি পরিচয়ের পর অন্য যেসব বিষয়ের সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন তা হল প্রবন্ধ শিল্প। তিনি প্রবন্ধের পর যদি আর কিছু নাও লিখতেন তবুও এই প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্যই কালজয়ী হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ, সংকলিত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, জীবন স্মৃতিমূলক গ্রন্থ মিলিয়ে ছিল ১৮টি। তবে প্রবন্ধ গ্রন্থ ১১ টির বেশি হবে না। এখন সেই তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

১) কবি সুকুমার রায়, ২) জেরোম কে জেরোম ও তাঁহার সাহিত্য, ৩) আমার ছেলেবেলা, ৪) অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৫) বুদ্ধদেব বসুর চিঠি অচিন্ত্য কুমারকে, ৬) হঠাৎ আলোর ঝলকানি, ৭) কাব্য গ্রন্থ সমালোচনা (প্রথমা ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র, কুসুমের মাস ঃ অজিত দত্ত, আর্টে রিয়ালিজম ঃ দিলিপ কুমার রায়কে পত্র, কিসের জন্য আর্ট ঃ সুবেশ চক্রবর্ত্তীকে পত্র, প্রগতি সম্পাদককে ধূর্জটিপ্রসাদের পত্র, সিনেমা কেন দেখি না) ৮) ঢাকা হতে বুদ্ধদেব ও অজিত কুমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত তৎকালীন "প্রগতি" পত্রিকায় মাসিকী শিরোনামায় প্রকাশিত সাহিত্য, ৯) ব্যঙ্গ সাহিত্য, ১০) অতীতের স্মৃতি, ১১) সাহিত্য চর্চা , ১২) শনিবারের চিঠি - সমালোচনা, ১৩) মহাভারতের কথা, ১৪) রামায়ণ, ১৫) আমার যৌবন, ১৬) রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বুদ্ধদেব বসুকে (মোট ৩৬টি চিঠি), ১৭) বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে (মোট ৩৯ টি চিঠি), ১৮) কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, ১৯) রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, ২০) রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা ইত্যাদি।

তিনি প্রবন্ধের বিষয় হিসাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নিপুণ পর্যবেক্ষণকে বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর প্রবন্ধ আলোচনার প্রিয় বিষয় ছিল সমাজ, রাজনীতি ও সাংবাদিকতা। তিনি যখনই মতামত দেন, প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে সাহিত্য সমালোচনা। প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যই তাঁর প্রবন্ধ আলোচনার বিষয় ছিল। যদিও প্রিয় কবি বোদলেয়ার সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায়। "এক গ্রীষ্মে দুই কবি" প্রবন্ধে বারিস পাস্টেরনাক সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখে ছিলেন। এছাড়া চার্লস চ্যাপলিন বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ রচনাও "স্বদেশ ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে দেখতে পাই। সংস্কৃত কবিতা নিয়েও তিনি অনেক আলোচনা করেছেন। মেঘদূতের অনুবাদ কর্মের ভূমিকা হিসাবে তাঁর লেখা রচনা মূল্যবান হয়ে আছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সাহিত্যের সিংহভাগ অধিকার করে আছে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সবকটি সাহিত্য প্রকরণ আলোচনাতেই তিনি সমান উৎসাহ দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের

কথাসাহিত্য এবং কবিতা নিয়ে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। এছাড়াও "কবিতা", "দেশ" প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, ভাষা, ছন্দ, আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতত্ত্ব নিয়েও অন্তত বারোটি রচনা আছে। পরে এগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যে সব কবি বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যে আলোচনায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকুমার রায়, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন। এমনকি আধুনিক কালের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়েও তাঁর দুইটি স্মরণীয় প্রবন্ধ রয়েছে। একটি বাংলা ভাষায় "আধুনিক কবিতার প্রকৃতি" অন্যটি ইংরাজী ভাষায় "Modern Bengali Poetry" । অন্য যেসব প্রবন্ধ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "সাহিত্যচর্চা" গ্রন্থের রামায়ণ ও শিশু সাহিত্য, An acre of Green Grass modern Bengali prose, Pramath Chaudhury এবং "সঙ্গ নিঃসঙ্গতা" ঃ গ্রন্থের রাজশেখর বসু ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর সাহিত্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনা তাঁকে তেমনভাবে উৎসাহিত করে নি। তাঁর প্রবন্ধ সমালোচনায় আগাগোড়া যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল সাহিত্য বিচারের সুস্থির মানদন্ড তিনি গ্রহণ করেন নি অথবা যেখানে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাকেও পুনর্বার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া রোমান্টিকতার সংজ্ঞা বুদ্ধদেবের কাছে অন্যরকম, ক্লাসিক বলতে তিনি বহুজন গ্রাহ্য সমালোচনা মেনে নিতে পারেন নি। প্রবন্ধ জগতে বেশিরভাগ লেখা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর প্রবন্ধের মূল আকর্ষণ। বুদ্ধদেব বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে শুধু রবীন্দ্র বিরোধিতা নয়, রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে নিজের জগৎ তৈরী করার তাঁর অভিপ্রায় ছিল। প্রয়োজনে তিনি রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে গিয়ে সেই জগতে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন। সেই সময় কল্লোলকালের এই প্রয়াস অনেক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তবে বুদ্ধদেব আন্তরিক ও সচেতনভাবে এই কাজটি করেছিলেন। এইজন্য নূতন সাহিত্য আদর্শের তত্ত্বগত ভূমি

কথাসাহিত্য এবং কবিতা নিয়ে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। এছাড়াও "কবিতা", "দেশ" প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, ভাষা, ছন্দ, আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতত্ত্ব নিয়েও অন্তত বারোটি রচনা আছে। পরে এগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যে সব কবি বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যে আলোচনায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকুমার রায়, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন। এমনকি আধুনিক কালের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়েও তাঁর দুইটি স্মরণীয় প্রবন্ধ রয়েছে। একটি বাংলা ভাষায় "আধুনিক কবিতার প্রকৃতি" অন্যটি ইংরাজী ভাষায় "Modern Bengali Poetry" । অন্য যেসব প্রবন্ধ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "সাহিত্যচর্চা" গ্রন্থের রামায়ণ ও শিশু সাহিত্য, An acre of Green Grass modern Bengali prose, Pramath Chaudhury এবং "সঙ্গ নিঃসঙ্গতা" ঃ গ্রন্থের রাজশেখর বসু ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর সাহিত্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনা তাঁকে তেমনভাবে উৎসাহিত করে নি। তাঁর প্রবন্ধ সমালোচনায় আগাগোড়া যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল সাহিত্য বিচারের সুস্থির মানদন্ড তিনি গ্রহণ করেন নি অথবা যেখানে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাকেও পুনর্বার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া রোমান্টিকতার সংজ্ঞা বুদ্ধদেবের কাছে অন্যরকম, ক্লাসিক বলতে তিনি বহুজন গ্রাহ্য সমালোচনা মেনে নিতে পারেন নি। প্রবন্ধ জগতে বেশিরভাগ লেখা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর প্রবন্ধের মূল আকর্ষণ। বুদ্ধদেব বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে শুধু রবীন্দ্র বিরোধিতা নয়, রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে নিজের জগৎ তৈরী করার তাঁর অভিপ্রায় ছিল। প্রয়োজনে তিনি রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে গিয়ে সেই জগতে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন। সেই সময় কল্লোলকালের এই প্রয়াস অনেক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তবে বুদ্ধদেব আন্তরিক ও সচেতনভাবে এই কাজটি করেছিলেন। এইজন্য নূতন সাহিত্য আদর্শের তত্ত্বগত ভূমি

পেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা অনেক সমালোচকের দৃষ্টিতে পশ্চিমীভাবের বার্তাবহ রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা যায়, বুদ্ধদেব ছিলেন কৃতি ছাত্র, পরে বিদ্বান অধ্যাপক, পরিপক্ব পত্রিকা সম্পাদক, বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুগভীর অন্তরঙ্গতা, অন্য দিকে তিনি ছিলেন সাহিত্যঅন্ত প্রাণ। তাই বুদ্ধদেবকে আমরা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে স্মরণ রাখবো।

বুদ্ধদেব বসু কবিতা, প্রবন্ধ এর পাশাপাশি নাটক রচনাতেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ষাটের দশকে নাটকের জন্যই তিনি এ্যাকাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে একেবারে নাটক লেখেননি এমন নয়, তবে জীবনের শেষের দিকে নাটক রচনার দিকে অধিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চারটি নাটক এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাকী নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। তবে শেষের দিকের নাটকগুলির অধিকাংশই ছিল কাব্য নাট্য।

তাঁর নাটক ও কাব্যনাট্য গুলি হলো, "একটি মেয়ের জন্য" (১৯২৭ খ্রীঃ) রাবণ (১৯৩১ খ্রীঃ), অনুসূয়া (১৯৩৩ খ্রীঃ), মায়ামালঞ্চ (১৯৩৩ খ্রীঃ), প্রায়শ্চিত্ত (১৯৬৩ খ্রীঃ), ইক্ষাকু সেন্নিণ (১৯৬৬ খ্রীঃ), তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬ খ্রীঃ), কোলকাতার ইলেক্ট্রা (১৯৬৭ খ্রীঃ), কাল সন্ধ্যা (১৯৬৭ খ্রীঃ), সত্যসন্ধ (১৯৬৮ খ্রীঃ), অনাম্নী অঙ্গনা (১৯৬৯ খ্রীঃ), প্রথম পার্থ (১৯৭০ খ্রীঃ), পূর্ণমিলন (১৯৭০ খ্রীঃ)।

তাঁর অধিকাংশ নাটকেই পুরাণের প্রভাব রয়েছে। পুরাণ কাহিনী থেকে চরিত্রগুলি এলেও তারা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে কোন স্বর্গীয় রাজ্যে বিরাজ করেন নি। তারা যেন রক্ত মাংসের সাংসারিক মানুষ। তাদেরকে আমাদের সাংসারিক জীবনের প্রতিনিধি বলে মনে হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব রচনা করেন "একটি মেয়ের জন্য" নাটকটি। এই নাটক রচনার সময়েই তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেকালে নাটকটি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের হলে অভিনীত হয়েছিল। নাটককটির কাহিনীও বড় বেশি করে বানিয়ে তুলে বুদ্ধদেব দর্শকের মনোরঞ্জন করেছিলেন। ফলে নাটকের মধ্যে দিয়ে কোন শিল্পবোধ আমাদের চোখে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন পুরানা পল্টনে

একটি সদ্য যৌবনা প্রতিবেশিনীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, বিনা বাক্যালাপে শুধু রাস্তার উপরে চোখের দেখাতেই তাকে ভালোবেসেছিলেন। সেই ক্ষণিকের প্রণয়ের বেদনা এই মেয়েটিকে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে তুলে ধরেছিলেন। কন্যার পিতা এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধদেব বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুদ্ধদেবের এই লেখা নাটকটিতে শুধুমাত্র চুম্বনের দৃশ্য বাদ দিয়ে জগন্নাথ হলে অনুমোদন দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরো একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন। "কালো হাওয়া" উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন "মায়ামালঞ্চ" নামে। এই নাটকটিতে তিনি নিছকই দর্শকের ও মঞ্চের তাগিদে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এই ভাবে ১৯৬০ সালের আগে তাঁর নাটকগুলি অধিকাংশই মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত হয়েছিল বলা যায়। এই নাটকগুলিতে তেমনভাবে বুদ্ধদেবের নাট্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে রচিত নাটকগুলি অধিকাংশ ছিল কাব্যনাট্য। তবে তার কাব্যনাট্যে ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রগুলি নাটকে স্থান পেয়েছিল। ১৯৬৭ সালে রচিত "কালসন্ধ্যা" একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্য। এই নাটকে বুদ্ধদেব কল্পনার অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মৌষল পর্ব অবলম্বনে লেখা এই নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্রের ভূমিকায় আছে অথিরিটি। তার সঙ্গে জনতা ও জন নায়কের বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদ অবশ্য আদর্শের বিরুদ্ধে। নাটকের শেষে অথিরিটির বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। আবার প্রথম পার্থ (১৯৭০ খ্রীঃ) নাটকে কর্ণের ক্ষণস্থায়ী মাতৃমোহ এক মহাজাগরণে ভেঙ্গে যায়। মাতৃ-হৃদয়ের আকুল বেদনা কুন্তীর মধ্যে দেখা দিয়েছে। যা কর্ণকে বার বার হাতছানি দিয়েছিল। তাঁর নাটকের শেষের দিকে কর্ণের আদর্শবাদী চরিত্র বীর ধর্মকে আঁকড়ে থাকতে দেখি। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদে কর্ণ চরিত্র যেভাবে চিত্রণ করেছেন এখানে তার কোন হেরফের দেখি না। আবার "অনাম্নী অঙ্গনা" কাব্য নাট্যে বুদ্ধদেবের কবিত্ব অতিমাত্রায় কাজ করেছে। এখানে কবির নাট্য রস অনেকটা কবিতার ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র অঙ্গনার জীবনের রূপান্তর ঘটেছে একটি মন্ময়ধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। নাটকের বন্ধন ছিল শিথিল। স্বগতোক্তির মাধ্যমে বুদ্ধদেব নাট্য কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছেন। "সংক্রান্তি" নাটকেও বুদ্ধদেব পুরাণ কাহিনীকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে বুদ্ধদেব মূল মহাভারতের ভাবাদর্শ অনেকাংশে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের গান্ধারীর মৌলিক

পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গান্ধারীর হৃদয় বেদনা ততটা এখানে তীব্র হয়ে ওঠে নি। "কলকাতা ইলেকট্রা" নাটকে ও "পুনর্মিলন" নাটকে বুদ্ধদেব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচনা করেছিলেন। ব্যক্তির বিপন্ন বোধ থেকে চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। বুদ্ধদেব এই নাটকে গ্রীক নাটকের ইলেকট্রার যে অনমণীয় মনোভাব ছিল সেই মনোভাবকে নিয়ে তিনি কলকাতার ইলেকট্রা চরিত্রে অঙ্কন করেছিলেন।

"তপস্বী ও তরঙ্গিণী" (১৯৬৬ খ্রীঃ) নাটকটি বুদ্ধদেবের স্মার্থক রচনা বলা যেতে পারে। নাটকটি পুরাণ কাহিনী আশ্রিত হলেও এই নাটকের কাহিনী অন্যভাবে রচিত। এই নাটকের পৌরাণিক চরিত্র তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী। বুদ্ধদেব আধুনিক মানসিকতায় চরিত্রগুলির মধ্যে সাংসারিক জীবনের দুঃখ দ্বন্দ্ববেদনা দেখিয়েছেন। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেমের কাহিনী তুলে ধরেছেন। তরঙ্গিণী ছিল পতিতা চরিত্র। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে কামাতুর করে রাজধানীতে আনার শর্তে তরঙ্গিণী নিযুক্ত হয়েছিল। কেননা ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিবাহ হবে রাজকন্যা শান্তার। রূপ লাবণ্য, ছলনায় ঋষ্যশৃঙ্গের মনে মদন জ্বালা জ্বালিয়ে দিল তরঙ্গিণী, কিন্তু তার মনে জেগে উঠল বেদনা। তপস্বীকে প্রথমবার দেখেই শিহরিত হয়েছিল তরঙ্গিণী। এক জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে নারীমনস্ক করে তুলতে গিয়ে তরঙ্গিণী নিজের মধ্যে আবিস্কার করে এক চিরন্তন প্রেমিকা নারীকে। শান্তাকে পত্নিরূপে পেয়েও আত্মতুষ্টি তপস্বীকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। রাজ ঐশ্বর্য তাকে বাঁধতে পারে নি। শান্তার পূর্ব প্রণয়ীর হাতে তিনি দিয়ে গেলেন স্ত্রী-পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী মিলিত হতে পারেন নি। দুজনার দুটি পথ দুদিকে বেঁকে গেছে। সে পথ ছিল রিক্ত ও শূন্যতায় ভরা। এই নাটকের শেষের দিকে আমরা লক্ষ করি ঋষ্যশৃঙ্গের ঘরে তার পত্নী ফিরে পেয়েছে তার কুমারীত্ব। এই কুমারীত্ব সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ব্যাখ্যা হল, বিবাহ বন্ধনে যদি প্রেম না থাকে, যদি দেহদান করেও হৃদয় উন্মুখ থাকে পূর্বপ্রণয়ীর জন্য, সে নারী কুমারী। সুতরাং ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহিত পুরুষ

মাত্র, কামনার পুরুষ নয়। বিবাহ নামক প্রচলিত অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা এখানে দেখানো হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য কর্মের বিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর সাহিত্য জীবনের এক বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধদেব স্কুল জীবনেই যথাক্রমে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে "বিকাশ" ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে "পতাকা" নামে হাতে লেখা দুটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক তিনি নিজেই ছিলেন। এছাড়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে তাঁর কৈশোরের বন্ধু অজিত দত্তের সঙ্গে "প্রগতি" সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন -

"আকার ফুলস্ক্যাপ অষ্টমাংশ, হলদে মলাটে উর্দ্ধমুখ একটি নারী মুণ্ড আঁকা, প্রথম রচনা অচিন্ত্যের একটি অষ্টাদশপদী কবিতাঃ "আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে"। আর ছিলো পিরানদেল্লো বিষয়ে প্রবন্ধ, সম্ভবত জীবনানন্দের একটি কবিতা তখনকার মাসিক পত্রের পক্ষে অপরিহার্য ধারাবাহিক উপন্যাসটি আমিই কপালে ঠুকে শুরু করেছিলাম। প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিল, মনে পড়ে, বেশ একটু চাঞ্চল্যও তুলেছিল"। - ২০

এই সময় বুদ্ধদেবের দাদামশায়ের মৃত্যু হয়। সংসার চালানোর দায় তাঁর উপর পড়েছিল। সহায় সম্বলহীন বুদ্ধদেব ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কৃতকার্যের জন্য ২০টাকা বৃত্তি পেতেন। এই টাকা পত্রিকার তহবিলে জমা দিয়েছিলেন। এতে পত্রিকা চালানো সম্ভব না হওয়ায় বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি দিদিমার কিছু গহনা বিক্রি করেছিলেন এই "প্রগতি" পত্রিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এই পত্রিকার সম্পাদনার ভালোবাসার কথা জানিয়ে তিনি বন্ধু অচিন্ত্যকুমারকে জানিয়েছিলেন -

"প্রগতি উঠে গেলে আমার জীবনে যে Vacuam আসবে তা, আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করার মত নয় সে হিসেবেই সবচেয়ে খারাপ লাগছে। প্রগতিকে টিকিয়ে রাখা সত্যই বোধ হয় যাবে না। তবু একেবারে আশা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না, কুসংস্কার-গ্রস্ত Miracle-এ বিশ্বাস করবার দিকে ঝুকে পড়ছি"। - ২১

"প্রগতি" শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালে বন্ধ হয়ে গেল, তবু আধুনিক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব "প্রগতি"র পাতায় যে বিদ্রোহকে প্রকাশ করেছিলেন তা চিরস্মরণীয়, এরপর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় "কবিতা" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "কবিতা" পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলা কবিতাকে একটি স্বতন্ত্র সিংহাসনে অধিষ্টিত করলেন, যা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন বলা যেতে পারে।

এই "প্রগতি" ছিল প্রথমে হাতে লেখা পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঢাকার সাহিত্য মহলে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পত্রিকা ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে গেল এবং তার তিন মাস পর "কল্লোল" পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল। সেসময় বুদ্ধদেব ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর সমবয়স্ক ক-জন বন্ধু মিলে "ক্ষণিকা" নামে একটা হাতে লেখা পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধদেব নিয়মিত কাব্য চর্চায় মন দিয়েছিলেন। এই পত্রিকাটির প্রধান লিপিকর বুদ্ধদেব নিজেই ছিলেন। সে সময় ঢাকার অন্য অঞ্চলে আরেকটি হাতে লেখা পত্রিকা সুধীশ ঘটক এর (মণীশ ঘটকের ছোট ভাই) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটির নাম "ভগ্নরথ"(১৯২৭ খ্রীঃ)। এছাড়া বুদ্ধদেব বসু ও হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে এক বছরের ত্রৈমাসিক "চতুরঙ্গ" ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেব বসু এরপর "পরিচয়" পত্রিকা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশ করেন।

এইভাবে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বাংলার সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একের পর এক বুদ্ধদেব বাংলা সাময়িক পত্রিকার জগতে দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনা করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব শুধু ছাপার হরফে ভালো কবিতা প্রকাশই করেন নি, ভালো পাঠক তৈরী করার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন

অনুকূল অনুসঙ্গে সাহিত্যের পাঠক তৈরী হতে পারে, কিন্তু কবি তৈরী করা যায় না। পত্রিকার সম্পাদনার জগতে তিনি ছিলেন শিক্ষকের মত। সম্পাদক হিসাবে তার একটি গুণ ছিল, সেটি হলো কোন তরুণ লেখকদের লেখা পছন্দ না হলে তিনি অনেকটা সংশোধন করে প্রকাশ করেছিলেন কিম্বা নিজের মতামত জানিয়ে কবির মতামত নিয়ে পণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিতেন। এইভাবে বহু কবি ও লেখক তাঁর পত্রিকা জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

শিশু সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর চিন্তার একটা প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। আমাদের সংসারে শিশু আনন্দের প্রতীক। শিশু মনের এই আনন্দকে কবি সাহিত্যিকরা তাদের গল্প, ছড়া ও কবিতার মধ্যে দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেন। তাই শিশু সাহিত্য হলো সাহিত্যিকদের ফেলে আসা শৈশবকালের প্রতিলিপি। স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাকে সাহিত্যে রূপান্তর করে মাত্র, আর পিছনে তাকাতে গিয়ে দুঃখ ও আনন্দের মুহূর্তগুলি আমাদের চেতনাকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধদেব বসুর জীবনেও ঐ স্মৃতিগুলি আরো বেশী প্রখর, কারণ প্রথম থেকেই তিনি পিতা মাতাকে হারিয়েছিলেন। অবশ্য যে সময় তিনি শিশু সাহিত্য রচনা করেছিলেন সেই সময় বিখ্যাত শিশু লেখকদের সমকক্ষ না হলেও তাঁর শিশু সাহিত্যগুলি সেকালের প্রচলিত লেখার ভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিকদের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। তিনি জানিয়েছেন - "আমরা ছোট ছিলাম বাংলার শিশু সাহিত্যের সোনালী যুগে"। তাই বুদ্ধদেবের শিশু সাহিত্যগুলি পাশ্চাত্যের ল্যুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়র ও হ্যান্স এন্ডারসনের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শিশু সাহিত্যগুলির প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব খুব একটা বড়দের থেকে ভিন্ন নয়। একই চিন্তা, কখনও একই মেজাজ তাঁর ছোট গল্পে লক্ষ করা যায়। তবে তাঁর লেখায় হাসি ঠাট্টা খুব বেশি

থাকতো। অবশ্য শেষের দিকে সেই ঝোঁক কেটে গিয়ে কিছুটা যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেবের শিশু সাহিত্য লেখায় দুটি ধারা ছিল, প্রথম ধারায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিতীয় ধারায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, ক্যারল এন্ডারসনের লেখা শিশু সাহিত্য। বুদ্ধদেবের দরদী মনের সহানুভূতি দুই ধারার শিশু সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর শিশু সাহিত্যগুলো হলো - "প্রথম দুঃখ", "একটা পরীর গল্প", "রুমির পত্র বাবাকে", "ঘুমের আগে গল্প", "রামধনু", "যা চাও-পাই", "ড্যানির ভাবনা", "বিশেষ কিছু নয়", "ভূগোল ভঙ্গিমা", "স্বাস্থ্য সিদ্ধি", "পদার্থ পরীক্ষা", "বিশ্ববিক্ষা", "কান্তিকুমারের নার্ভাস ব্রেকডাউন", "গায়ে কাঁটা-পেটে খিল" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব বসুর "রামধনু" কবিতায় শিশুর মনের আনন্দকে তিনি অসাধারণ মহিমায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় সহজ সরলতার মধ্যেও একটা গাম্ভীর্য দেখা যায়। এখানে শিশুর কল্পনা আকাশ ছুয়ে গেছে -

"বাবা-মা এসোগো, রামাঝি, রামজী,
এসো ছোড় দা, ন'দি -
আকাশ জোড়া এ রামধনু চাও
দেখতে যদি।" - ২২

বুদ্ধদেব বসু শিশু কাহিনীতে সবসময়েই গভীরভাবে শিশুর মনে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কবিতাগুলি আমাদের শিশু মনের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। শিশু মনের বিকাশে তাঁর লেখা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় গভীর ভাব লক্ষ করা যায়। সহজ সরলতা তাঁর লেখায় নেই বললেই চলে।

বুদ্ধদেব বসু কাব্য ও প্রবন্ধের পাশাপাশি কথাসাহিত্যের ধারাটিকেও নূতন পথে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যর মধ্যে ছোটগল্প রচনায় চিন্তা ও শিল্পাদর্শের নূতনত্বের আভাস পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সেকালের প্রতিষ্ঠিত

ছোটগল্পকারদের মতো তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব না থাকলেও তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের কক্ষপথে বিচরণ করে জীবনের এক বিশেষ তাৎপর্য ছোটগল্পে তুলে ধরেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেন। ত্রিশ-চল্লিশের দশকেই তাঁর গল্প রচনার উর্বরতর সময়। অবশ্য চল্লিশ দশকের শেষের দিকে তাঁর গল্প রচনার স্রোত কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে, একথা তিনি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি গল্প সংকলনের ভূমিকায় জানিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর গল্পগ্রন্থ ও সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা ৩০টি। এই ত্রিশটির মধ্যে শুধু "জ্বর" ও "মেজাজ" (১৯২৮ খ্রীঃ) গল্প দুটি সাধুভাষায় লিখেছিলেন। বাকি সমস্ত গল্পই তিনি চলিত গদ্যে রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পগুলি "কল্লোল", "প্রগতি", "পরিচয়" ও "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পগ্রন্থগুলি হলো - রজনী হ'লো উতলা (১৯২৬ খ্রীঃ), অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প (১৯৩০ খ্রীঃ), রেখাচিত্র (১৯৩১ খ্রীঃ), এরা আর ওরা (১৯৩৪ খ্রীঃ), রঙ্গিন কাচ (১৯৩৩ খ্রীঃ), অদৃশ্য শত্রু (১৯৩৩ খ্রীঃ), ঘুমপাড়ানি গান (১৯৩৩ খ্রীঃ), নতুন নেশা (১৯৩৩ খ্রীঃ), সংক্রান্তি (১৯৩৩ খ্রীঃ), প্রেমের বিচিত্র গতি (১৯৩২খ্রীঃ), মিসেস গুপ্ত (১৯৩৪ খ্রীঃ), প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৪ খ্রীঃ), শ্বেত পত্র (১৯৩৪ খ্রীঃ), শনিবারের বিকেল (১৯৩৬ খ্রীঃ), ফেরিওয়ালা (১৯৪১ খ্রীঃ),খাতার শেষ পাতা (১৯৪৩ খ্রীঃ), একটি কি দুটি পাখি (১৯৫৪ খ্রীঃ), একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০ খ্রীঃ), হৃদয়ের জাগরণ (১৯৬১ খ্রীঃ), ভাসে, আমার ভেলা (১৯৬৩ খ্রীঃ) এছাড়া চেকভের অনুদিত একটি গল্প "কাল একটি পরীক্ষা"।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যায়, অর্ধেকেরও বেশি গল্পের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। বাকি গল্পগুলি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লেখা। তাঁর ছোটগল্পে বাস্তব সাংসারিক জীবনের বিবরণ নেই, নেই মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র লড়াই। তাঁর গল্পের মূল উপাদানই ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কখনও জীবন ও

প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে দেখা যায়, আবার কখনও ভালোবাসার অপমান ও প্রত্যাখ্যানের দিকগুলি তাঁর ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসেছে নগর জীবন। বিশেষ করে ঢাকা ও কলকাতা শহর। ফলে ত্রিশ দশকের নাগরিক জীবনের নর-নারীর প্রেম তাঁর ছোট গল্পে প্রাধান্য পেয়েছিল। বুদ্ধদেবের ব্যক্তি জীবনের কিছু পরিচয় তাঁর ছোট গল্পে ফুটে উঠতে দেখি। বুদ্ধদেবের ছোটগল্পে চরিত্রগুলি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি পরিবার থেকে এসেছে। তিনি কখনও গল্পের বৈচিত্র্য ও স্বাদ আনতে অজানা ও অপরিচিত দেশ ও সমাজের চিত্রকে তুলে ধরেন নি। ঢাকা ও কলকাতায় বসবাসকারী মানুষের চলাফেরা ও আচার-আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর চরিত্রকে দেখলে মনে হয় জীবন্ত রক্ত-মাংসের মানুষ। চরিত্রের সজীবতা গল্পে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পের প্রকৃতি বলতে ঢাকার পুরানা-পল্টন ও ময়মনসিং জেলার কথা বার বার এসেছে। এছাড়া কলকাতা পটভূমি কেন্দ্রিক গল্পে জীবনের গতিময়তার ও ব্যস্ততার ছবিটি দেখা যায়। এই ছবিতে জীবনের যোগ ততটা নেই। শুধু প্রেমের গল্পই নয়, অন্য বিষয়ের গল্পতেও বুদ্ধদেবের শিল্প কুশলতা লক্ষ করা যায়। স্বামীর সঙ্কীর্ণ নিষ্ঠুরতার পরিচয়, "জ্বর" ও "ফেরিওয়ালা" গল্পে দেখতে পাই। আবার "মা-ভাই-বোন", "দুই মা", "প্রথমা" গল্পে সংসার জীবনের নীচতা ও হৃদয়হীনতার জঘন্য দিকটি বুদ্ধদেব বসু আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। "মেজাজ ও হতাশা" গল্পে পুরুষের বিভিন্ন ইতর আচরণের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি "বোন" ও "অসমাপ্ত" গল্পে নারীর ইতরতার পরিচয়ও পাই। "রাধারাণীর নিজের বাড়ি" ছোট গল্পে ব্যক্তিগত জীবনের উচ্ছ্বাস, উচ্চাশা, নারীর জীবন কিভাবে পুরুষের জীবনকে তিলে-তিলে ক্ষয় করে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে "চোর চোর" গল্পে বারবণিতার জীবনের চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে। এছাড়া বুদ্ধদেব বসু "প্রশ্ন" গল্পে দেখালেন মধ্যবিত্ত পরিবারের ধ্বংসের ছবি।

বুদ্ধদেবের প্রেমের গল্পে নর-নারীর জীবনের দেহকামনা ও ভোগের বিভিন্ন উচ্ছ্বাস দেখা যায়। "অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থ" এর "প্রথম ও শেষ" গল্পে দেখা যায় লীনার প্রেমের উন্মাদনা। তার প্রেম অভিজাত এক পুরুষের সঙ্গে। লীনা দরিদ্র ঘরের মেয়ে। সম্পর্কের বাতাবরণে লীনা এক প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে দেহ দান করে। কিছুদিন পরে লীনার প্রেমিকের মৃত্যু ঘটে। লেখক দেখালেন অন্য পাঁচজন মেয়ের মতই লীনা অন্য পুরুষকে বিয়ে করেছে। কিন্তু বিগত প্রেমের কোন ব্যথা বেদনা তাকে পীড়িত করে নি। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ গল্পেই দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও বিবাহোত্তর প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায়। তাঁর "ফেরিওয়ালা" গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মনের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের রূপটি ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নর-নারীরা দেহ বিনিময় করে না। যেখানে যা প্রয়োজন সেই যৌন কামনা চরিতার্থ করতেই চরিত্রগুলিকে দেখা যায়। বুদ্ধদেবের শেষের দিকের বিখ্যাত ছোটগল্প "ভাসে আমার ভেলা" শেষতম সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলির বিষয়বস্তু ও রচনারীতির নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেবের শেষের দিকের গল্পে প্রেমের মিলন না দেখিয়ে বিচ্ছেদ ও হতাশার দিকগুলি দেখতে পাই। এই পর্বের গল্পগুলিতে ভালোবাসার নূতন মূল্যায়ন বুদ্ধদেব বসু করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

"বুদ্ধদেবের গল্পে ভালোবাসা জীবনের একটি মাত্র অধ্যায় নয়, পরিপূর্ণ অনুভূতি, সমগ্র সত্তার বিলুপ্তকারী অভিজ্ঞতা। বাংলা ছোটগল্পের রাজ্যে এই অধুনা বিরল দর্শন বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের গল্প পাঠকের কাছে এক সুখকর অভিজ্ঞতা।" - ২৩

বুদ্ধদেবের ছোট গল্পে বিদেশী লেখকদের লেখার আঙ্গিক লক্ষ করা যায়। লরেন্স, চেকভ, পিরানদেল্লা, জন আর্সকাইন, স্যার গালাহোড প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের গল্পের রচনারীতি ও ভাবাদর্শ তিনি অনুসরণ করেছিলেন। যেমন, জন

আর্সটাইন ও স্যার গ্যালাহোড গল্পের অনুসরণে বুদ্ধদেব বসু "পুরাণের পুনর্জন্ম" এবং লরেন্সের "ওল্ডার অফ ক্রিসেন থিমাম" গল্পের অনুকরণে "তুলসী গন্ধ" গল্পটি লিখেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছোটগল্পে গল্পরীতি লক্ষ করলে দেখা যায় তিনি তৃতীয় পুরুষের জবানীতেই বেশিরভাগ গল্প রচনা করেছিলেন। আবার আত্মকথন রীতি ও লেখকের জবানীতেও গল্প রচনা করেছিলেন। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ গল্পে দেখা যায়। নূতন বড়লোক হওয়া মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের যুবক যুবতীদের গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রের ভূমিকায়। চরিত্রগুলি অধিকাংশই আকাশ কুসুম কল্পনা করে। মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদাবোধ চরিত্রগুলির মধ্যে খুবই কম দেখা যায়।

উল্লেখপঞ্জী

১) আমার ছেলেবেলা/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ মার্চ- ১৯৭৩, প্রকাশক- সুপ্রিয় সরকার, মুদ্রক- পরাণচন্দ্র রায়, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২/পৃষ্ঠা- ১০

২) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১১

৩) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১৪

৪) ঐ / পৃষ্ঠা- ৭২

৫) ঐ/ পৃষ্ঠা- ৩২

৬) "বুদ্ধদেব বসু ঃ ইস্কুলে আর কলেজে" / ভবতোষ দত্ত। ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৭, কবিতা ভবন বার্ষিকী সংখ্যা / পৃষ্ঠা-৩১

৭) কল্লোল যুগ/ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬ খ্রীঃ / পৃষ্ঠা- ১২২

৮) কল্লোল যুগ/ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬ খ্রীঃ / পৃষ্ঠা- ১২৩

৯) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১মসংস্করণ,১৯৭৬/ পৃষ্ঠা- ১২৬

১০) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬/ পৃষ্ঠা- ১২৭

১১) আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড/ গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ / কোলকাতা - ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭/ পৃষ্ঠা- ৪২৮

১২) জীবনের জলছবি / প্রতিভা বসু, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৪০০ থেকে চতুর্থ মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪০৫ পর্যন্ত, পঞ্চম মুদ্রণ- শ্রাবণ- ১৪০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৯/ পৃষ্ঠা- ৯৭

১৩) কনিষ্ঠ কন্যাকে চিঠি ৭/১২/১৯৬২, "দেশ" পত্রিকায় বুদ্ধদেবের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৮-১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চিঠি।

১৪) বুদ্ধদেব বসুর জীবন / সমীর সেনগুপ্ত, বিকল্প প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮, কলকাতা-৪/ পৃষ্ঠা- ২০২

১৫) যুগান্তর/১০ই জুলাই, ১৯৬১

১৬) Budhyadev Bose, Tagore : Portrait of a Poet, Calcutta, Papirus, 1962 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

১৭) "দেশ"। ২৩ চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

১৮) উৎসঃ বুদ্ধদেব বসু, ভুঁইয়া ইকবাল বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, / পৃষ্ঠা- ১২১

১৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, (প্রথম খণ্ড) বন্দীর বন্দনা/ দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ৯ ই মে ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ১৯

২০) আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪/ পৃষ্ঠা- ৪০০

২১) বুদ্ধদেব বসুর ৭ নং চিঠিঃ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, বিশেষ সংস্করণ ১৬ই আগষ্ট ১৯৮২, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ / পৃষ্ঠা- ৫৬৪

২২) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, (প্রথম খণ্ড)/ দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ৯ ই মে ১৯৯১/ গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২১৬

২৩) কালের পুত্তলিকা- অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়/প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, দেঁজ পাব্লিশিং, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্লোল চেতনা ও বাংলা উপন্যাসে নূতন ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্লোল চেতনা ও বাংলা উপন্যাসে নূতন ধারা

"যেদিন আমায় খুঁজবে-
বুঝবে সে দিন বুঝবে।
স্বপন ভেঙ্গে নিসুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে,
কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় উঠবে ও বুক ছমকে, -
জাগবে হঠাৎ চমকে।"

- ১

এই চমকে ও জেগে ওঠার প্রেরণা জেগেছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তরুণ কথাশিল্পীদের মনে। এঁরা সকলেই সেকালের কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট শিল্পীর মর্যদা না পেলেও কথাসাহিত্যের ধারায় তাঁরা নূতনত্বের সঞ্চার করেছিলেন। তাঁদের এই নূতন ধারা, প্রচলিত কথাসাহিত্যের ধারা থেকে অন্যদিকে বাঁক নিয়েছিল। তাঁরা এই বাঁকে নূতন বিষয়ভাবনা ও জীবনের ব্যাখ্যা উপন্যাসে তুলে ধরলেন। তাঁদের লিখনের ভঙ্গি ও আঙ্গিকের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কথাসাহিত্যের এই নূতন ধারায় তাঁরা যেমন বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করলেন তেমনি উপন্যাসের আঙ্গিকে নূতনত্বও আনলেন। তাঁরা প্রচলিত চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন এবং সেইভাবে তাঁদের উপন্যাসগুলি অভিনবত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে এই চেতনা এসেছিল। নর-নারীর দেহচেতনার সঙ্গে রোমান্টিক প্রেমচেতনা মিশিয়ে মানুষের জটিল সম্পর্কের এক নূতন তাৎপর্য তাঁরা উপন্যাসে তুলে ধরলেন। এই জটিল সম্পর্কের কেন্দ্রে ছিল নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষেরা। তারা বেশির ভাগই ছিল নাগরিকমনস্ক। তারা ছিল উচ্চশিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ। বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের জীবনে প্রেমের অন্তঃসারশূন্য রূপটি সেকালের উপন্যাসের নর-নারীদের জীবনে দেখা গেল। শুধু তাই নয়, উপন্যাসগুলি নর-নারীর কামনা বাসনার ক্ষেত্রে অন্যমাত্রা পেয়েছিল। তা কখনো

হতাশার, আবার কখনো ছিল বেদনার। এই আনন্দ-বেদনার রূপকথা সেকালের কথাসাহিত্যিকদের ভাবনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আবার কথাসাহিত্যের সুস্পষ্ট আদর্শ থেকেও সেকালের তরুণ লেখকেরা সরে এলেন। তাঁরা সমাজ জীবনের জটিল রূপ বিন্যাসে মন দিলেন। তাঁরা দুরন্ত আবেগে মানুষের জীবনে যৌনতার প্রশ্নকে প্রবলভাবে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁরা প্রচলিত ছকের চরিত্রগুলিকে এই চেতনায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই তরুণ লেখকরা গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলির পুরোনো মূল্যবোধ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এই মনোভাব শুধু কথাসাহিত্যেই ছিল না, সাহিত্যের অন্য শাখাতেও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেই পুরোনো ভাবনা অতিক্রম করার উদ্দাম মানসিকতা লক্ষ করা যায়। তাঁদের লেখায় যেন একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের অন্যতম লক্ষ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা থেকে ভিন্ন ধর্মী বা নূতন সাহিত্য ধারার প্রেরণা সেদিনের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় দেখা দিল। পরবর্তীকালে এই পত্রিকা থেকেই নূতন সাহিত্যের পথ পরিক্রমা শুরু হয়েছিল। নূতন শিল্পাদর্শের আলোয় সনাতন মূল্যবোধগুলি তরুণ কথাশিল্পীদের লেখার ঝাঁঝে কেঁপে উঠেছিল। এই কম্পনে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটি নূতন বিদ্রোহের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন -

"যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সেই বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই বরীন্দ্রনাথ।" - ২

রবীন্দ্রনাথের সময় ও উত্তরকালের কিছু কথাসাহিত্যে বিধবার প্রেম ও আবার বিবাহ, অসবর্ণের প্রেম ও বিবাহ, পণপ্রথা ও কৌলীন্য প্রথা, জমিদারের অত্যাচার ও ব্যভিচার, বারবণিতার জীবন কথা, দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক প্রভৃতি ধারণাগুলি তরুণ লেখকদের সাহিত্যে আমূল সংস্কার ঘটিয়েছিল। এই সংস্কারের প্রয়োজন ছিল বলেও আমরা মনে করি। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের এই সংস্কার ও নূতন ধারার প্রসারে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নূতনত্বের আভাস লক্ষ করা যায়। এর পরে বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সব পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আবার এই নূতনত্বে বেশ কিছু লেখকও আত্ম প্রকাশ করলেও নূতন কোন সাহিত্যযুগের বাঁক দেখা

যায় না। এই ধারা থেকে তরুণ লেখকরা তাঁদের লেখায় বাংলা কথাসাহিত্যে নবচেতনার সৃষ্টি করেছিল। এই পরিবর্তনের আবহাওয়ায় ও পেক্ষাপটে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম নিয়েছিল 'কল্লোল'।

কল্লোলের আগে বাংলার সাময়িক পত্রিকা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিল। অবশ্য যে কোন সাময়িকপত্রের মধ্যে দিয়ে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের চেতনা ধরা পড়ে। তবে বাংলা সাহিত্যের নূতন ধারা আনার ক্ষেত্রে কল্লোলের ভূমিকা বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই পত্রিকাটির উদ্ভবের বীজ নিহিত ছিল "ফোর আর্টস ক্লাবের" মধ্যে। এখানে বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের আসর বসেছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগ ও তাঁর বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুনীতি দেবী, দীনেশরঞ্জন দাস ও মণীন্দ্রলাল বসু। এই চারজনে একটি করে গল্প লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই চারটি গল্প "ঝড়ের দোলা" নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁরা এই বইয়ের রচনাগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়েই একটা পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা পেয়েছিলেন। অবশ্য এর আগে থেকেই তাঁরা একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই "ফোর আর্টস ক্লাব" এর অবলুপ্তি ঘটে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাবটির অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও এর মধ্যে দিয়েই কিছু তরুণ কবি সাহিত্যিকের মনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই গেল। তাঁরা এই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণরূপ দিতে "কল্লোল" মাসিক পত্রিকার সংকল্প নিয়েছিলেন। তাঁদের এই সংকল্পের মধ্যে দিয়েই পত্রিকাটির জন্ম হওয়ার ইতিকথা বলা যেতে পারে। এছাড়া সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাসন্তিকা" পত্রিকার তরুণ লেখকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কল্লোল পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছিল। আসলে তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতির একটা পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে "কল্লোল" পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। দীনেশরঞ্জন দাস এই পত্রিকা প্রকাশনার ও সম্পাদনার ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি "বাসন্তিকা" পত্রিকার লেখকদের লেখা নিয়ে "কল্লোল" প্রকাশের সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দিলেন। সহযোগী হিসাবে ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ। এবিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন -

"কল্লোলের বীজ বোনা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে, ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা বাসন্তিকায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে"। - ৩

পত্রিকাটির নিজস্ব প্রেস না থাকায় প্রথম দিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেসের নাম ও ঠিকানায় "কল্লোল" পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। দীনেশরঞ্জন দাস এই পত্রিকার আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন বাঁকের সন্ধান এই পত্রিকাটিতে পেয়েছিলাম। বাংলার পাঠককুলকে নবচেতনার সন্ধান দিয়েছিল এই "কল্লোল"। বাঙ্গালী পাঠককে বহুকাল মোহাচ্ছন্ন করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এপ্রসঙ্গে "সংহতি" (১৯২৩ খ্রীঃ) নামে আরেকটি পত্রিকার উল্লেখ করা যায়, যার জন্ম হয়েছিল "কল্লোল" এর জন্মের একই বছরে ও একই মাসে। কিন্তু পত্রিকাটি দুই বছরের মধ্যেই উঠে যায়। "কল্লোল" এর সঙ্গে এই পত্রিকার আদর্শগত পার্থক্য ছিল। "সংহতি"তে একদিকে ভাঙ্গন, অন্যদিকে সংগঠনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু "কল্লোল", সমাজের পচা গলা ভিত্তিকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। প্রচলিত বাঁধা বন্ধনের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ "কল্লোলে" আলাদা তাৎপর্য এনেছিল। "কল্লোলে"র অন্যতম প্রধান লক্ষ ও আদর্শ ছিল যুগ ধর্মকে প্রকাশ করা। তাই মানুষের জীবনের বিভিন্ন আস্থিরতা, চিন্তা-ভাবনা ও সমস্যাকে কল্লোলে ফুটে উঠতে দেখি। বস্তুতঃ "কল্লোল" এর সময় প্রবল বিরুদ্ধবাদ ও বিহ্বল ভাববিলাস লক্ষ করা যায়। সুতরাং কল্লোল থেকে একটা সামগ্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সূচনা দেখতে পাই। এই পরিবর্তন শুধু সাহিত্যেই ছিল না, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ধরা পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংশয় পীড়িত মানুষের জীবন স্পষ্টভাবে জানতে গেলে তাই "কল্লোল" এর কথা অবশ্যই এসে পড়ে। কারণ "কল্লোল" এর প্রেক্ষাপটই ছিল সেদিনের সাহিত্যের নূতনত্বের আভাস। এই পটভূমিতে কল্লোল পত্রিকায় যে নূতন ধারা এসেছিল সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

উপন্যাস হল এক ধরনের দর্পণ। দর্পণে যেমন বিভিন্ন ছবি প্রতিফলিত হয় তেমনি উপন্যাসে আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজের বিভিন্ন মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও আচার আচরণের ছবি প্রতিফলিত হতে দেখি। এই প্রতিফলনে যুগ অনুযায়ী আলাদা বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে একটা যুগকে সূচিত করেছিল। এই যুগকে অনেকে আধুনিক বলে মনে করেন। কিন্তু যখন বলি আধুনিক, নূতন, তখন বুঝি এক বিশেষ ধরনের উপন্যাস যার মধ্যে বিশেষ স্বভাব বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। যা দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে একটা নূতন রূপ গ্রহণ

করেছে। যার মধ্যে প্রথম দিকের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গভীরভাবে পার্থক্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যখন নূতন পথকে নির্দেশ করে তখনই উপন্যাসের স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হয়। এই নূতন ধারা বলতে এক গুচ্ছ লেখকের সাহিত্যের নূতন আঙ্গিকের ও চেতনার সমষ্টিগত আদর্শকে বুঝি। অর্থাৎ দীর্ঘ দিনের উপন্যাসের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার হতে এই নূতন ধারার উপন্যাসের জন্ম। তা দীর্ঘদিনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ফল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি একদিকে যেমন উপন্যাস জগতে যুগান্তর এনেছিল অন্যদিকে তেমনি নব্য যুগের সূচনা করে। চলমান সাহিত্যধারা থেকে ঔপন্যাসিকদের বাঁক ধরে হাঁটতে গিয়ে ঐ নূতন ধারায় মানুষের যে মূল্যবোধ, চিন্তা চেতনা এসে মিলিত হয় সেই ধারাই হল সাহিত্যে নূতন ধারা। সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন-

"নতুন মূল্যবোধ আকাশ থেকে পড়ে না, নতুন স্বভাব শূন্য থেকে আপনে গজায় না, অভিনব সাম্প্রতিক যাদুকরের আম গাছ নয়। সেও ইতিহাসের সন্তান। তার জন্য ভিতরে ভিতরে অনেক প্রস্তুতি চলে। জানি না - জানি, তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়ে। তা অনেক প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য তোলপাড়ের বৈপ্লবিক পরিণাম। ছোট হোক, বড় হোক, প্রত্যেক আধুনিকতা যেমন একটি যুগান্তরের পালা, অন্যদিকে তেমনি একটি নব যুগেরও পালা। সবকিছুকে তা ভাঙ্গে না। নদী এইখানে এসে থেমে যায় না, তা একটি বড় বাঁকের সূচনা করে। অথবা বলতে পারি তাকে অবলম্বন করে একটি পালাবদল ঘটে যায়।" - ৪

এই নূতন ভাবনার পরিচয় সেকালের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পেক্ষাপটে নিহিত ছিল। একদিকে সমাজের মধ্যে সুপ্ত থাকা চাপা সংগ্রামের ছবি অন্যদিকে নরনারীর ভালোবাসা, যৌনতার স্থূল ভোগ-বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার সুর "কল্লোল" গোষ্ঠীর সাহিত্যে ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে এই পত্রিকায় জীবনের যন্ত্রণা ও বিফলতার অবসাদ দেখা যায়। যাকে অনেক সমালোচক যুগের যন্ত্রণা বলেছেন। এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানব জীবন প্রসঙ্গ "কল্লোলে" উঠে আসতে দেখা যায়। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেণী, বস্তিবাসী ও বেশ্যালয়ের জীবন, শহরের অর্থনীতি ও তাদের সামাজিক অবস্থান ও পরিবর্তন "কল্লোলে" দেখানো হয়েছে। বিধবার জীবনে ব্যথা-বেদনা, প্রেম ও বিবাহের স্বীকৃতি পেতে কল্লোলে দেখি। পণপ্রথার অভিশাপ "কল্লোল" এর লেখকরা না দেখিয়ে দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক সম্পর্কের জীবন যন্ত্রণা উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেন। যৌন জীবন,

প্রেম ও তার নানা সমস্যা "কল্লোল" গোষ্ঠীর গল্প উপন্যাসগুলিতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে। যৌন মনস্তাত্ত্বিক জীবনের ব্যাখ্যা ও তার প্রতিফলন "কল্লোল"এর সময়ের উপন্যাসগুলিতে দেখতে পাই। "কল্লোল" পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যে অধিকাংশই ইতিহাসের কাহিনী স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের মূল্য "কল্লোল" এর লেখকরা না দেখিয়ে সেখানে নর-নারীর প্রেম ভালোবাসার রোমান্টিক গল্পের শৈল্পিক মূল্য ধরা পড়েছে। নর-নারীর জৈবিক সমস্যা উপন্যাসে গভীরভাবে ফুটে উঠতে দেখি, যেটা "কল্লোল"এর পূর্ববর্তীকালের লেখকদের রচনায় তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তবে সমাজ বিশ্লেষণে তাঁদের আগ্রহী হতে দেখা যায় না। এই সময়ের উপন্যাসে ধনী, দরিদ্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অঙ্কিত করা হলেও লেখকের সামাজিক পরিচয়ের চেয়ে তার রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় অধিকতর বেশি বলে মনে হয়।

পূর্বকালের সাহিত্যধারার সঙ্গে "কল্লোল" এ প্রকাশিত সাহিত্যধারার মৌলিক পার্থক্য হল, অভিনবত্ব ও যুগচিন্তার বিষয়ে। এই চিন্তাকে প্রতিফলিত করতে গিয়েই "কল্লোল"এর আসরে যে লেখকবৃন্দ ছিলেন তাঁরা "কল্লোলগোষ্ঠী" নামে অভিহিত হন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে একটা নবযুগের জন্ম দিতে চেয়েছিলেন। এই নবযুগকে "কল্লোলপর্ব" বলেও অনেকে মনে করেন। এই গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন -

"বস্তুত "কল্লোল" যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই, বিহ্বল ভাব বিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দমতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে- এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা।" - ৫

কল্লোলযুগের এই বিরুদ্ধবাদের সূচনা হয়েছিল রবী-দ্রনাথকে নিয়ে। রবী-দ্রনাথের কথাসাহিত্যের মূল আদর্শকে মানদন্ড করে "কল্লোলগোষ্ঠীর" লেখকরা যে নূতন ধারা আনলেন তা তুলে ধরা প্রয়োজন। এরই সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, যা সেকালের "কল্লোল"এর বাতাবরণ তৈরী হতে সাহায্য করেছিল।

ত্রিশ দশকের বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যকলাপ ও আন্দোলন বাংলার পরিবেশকে দিশাহীন করে তুলেছিল। এই সময় উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ লেখকেরা ইংরেজ বিরোধী লেখা থেকে বিরত থাকলেন। তাঁরা বরং ইংরেজী কালচারে আরো বেশি অভ্যস্ত হয়ে রবীন্দ্র-বিরোধী সাহিত্যের দিকে ঢলে পড়লেন। তাঁরা সেকালের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে খানিকটা উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। প্রবীণ সাহিত্যিকরা অনেকেই তরুণদের এই পথকে অবহেলা ও অস্বীকার করেছিলেন। এইভাবে সাহিত্যের জগতেও ছিল এমন একটা বিরোধিতার আবহাওয়া, যা মোটেই সুখের ছিল না বলে মনে করা হয়। সাম্যবাদী রাজনীতি তখন ভালোভাবে পরিপুষ্ঠতা লাভ করে নি। সব পথ যেন গতানুগতিক সাহিত্য লেখায় মশগুল হয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষাপটই ছিল সেদিনের অতিআধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের প্রেরণা। এই সব তরুণদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অতিআধুনিক সাহিত্যে তরুণরা প্রবলভাবে আকর্ষিত হতে লাগলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৯ খ্রীঃ) রাজনৈতিক আবহাওয়ায় পশ্চিমী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করল। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এই ভাবনাগুলি আছড়ে পড়ল। আরো বলতে পারি ঐ ঢেউ তরুণদের বুকে এক নূতন প্লাবন এনেছিল। এই হল সেদিনের আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। মানুষের জীবনে প্রেম, দাম্পত্য সম্পর্ক, পাপ-পুণ্যের পুরোনো বিশ্বাস ও ধারণাগুলি বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে একটা ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছিল। বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের নানা দিকেই এটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। তাঁরই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই সেকালের পত্র-পত্রিকা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কল্লোলের কাল থেকে উপন্যাসে উঠে এসেছিল।

বিশ শতকের প্রথম থেকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের জীবন-যাত্রাতেও পরিবর্তন দেখা গেল। শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবর্তন লক্ষ করা গেল তাদের চিন্তাভাবনায়, ও মানসিকতায়। বিশ শতকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটা বলিষ্ঠ বেগ সহজেই নজরে পড়ল, যে বেগ জাতীয় জীবনে সংস্কৃতি আনে এবং নবজাগরণ ঘটায়। বিশেষ করে নূতন চেতনা দেখা দিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে। পরিবর্তনটা কোথায় ঘটল তা একটু লক্ষ করে দেখা দরকার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৯ খ্রীঃ) শেষ হতে না হতেই মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের (১৯২০ খ্রীঃ) সংস্কার পরিকল্পনা বাংলা দেশের অর্থনীতিতে দুরবস্থা এনেছিল। এই সময় বাঙ্গালীর আয়ের পথ ও চাকুরী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই হতাশাময় যন্ত্রণাকে গান্ধীজী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। এর ফলে সারাদেশে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তীব্র আন্দোলনে সামিল হয়। বাঙ্গালী জীবনে এক নব উন্মাদনা দেখা দেয়। এই উন্মাদনা শহর ও নগরে বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সময় বাঙ্গালী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের চেতনা নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হলো। ফলে অসহযোগ আন্দোলন সেদিনের বাঙ্গালীর মনে গভীর হতাশার মধ্যেও এক আশার বাণী বয়ে এনেছিল। তাদের মধ্যে অবরুদ্ধ ও যন্ত্রণাময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণা সেদিনের বাঙ্গালীকে একটা নূতন দিকে ঠেলে দিয়েছিল। চারিদিকে অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে একটা বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণাময় রূপ দেখা গেল। এই বিপর্যয় থেকে কৃষিও বাদ যায় নি। কৃষি জীবনের আর্থিক সংকটের ফলে ছেলে মেয়েরা প্রচলিত নিয়ম-নীতির বাইরে যেতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালীদের কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক যতই কমতে লাগলো, ততই বাঙ্গালী মধ্যবিত্তরা চাকুরীমুখী হয়ে পড়ল। বৃত্তিমুখী পেশা কমতে লাগল এবং ততই তার মানসপটে নিঃশব্দে একটি পালাবদল ঘটে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাও অতীতের সঙ্গে পরিবর্তন রেখে চললো, তবে এই পরিবর্তন জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় অতীতকে একেবারে অস্বীকার করে না। কালের নিয়মে কোন সমাজ অর্থনীতিই চির শাশ্বত নয়, একদিন ভাঙতেই পারে। কিন্তু এই ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়েই সূচিত হয় নূতন সমাজ, সম্পর্ক, জীবন যাত্রা ও মানুষ সম্পর্কে মূল্যবোধ। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তরা অনেকটা সেই পথে চলতে লাগল। তারা একান্তভাবে চাকুরী মুখী হয়ে গ্রাম জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও মানসিক দিক দিয়ে ছিন্নমূলও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের বিকল্প ব্যবস্থা তখনও গড়ে উঠল না। খানিকটা ইংরেজ আশ্রিত সমাজের কালচারে বাঙালী মধ্যবিত্তরা কোন কূলেই অবস্থান করল না। শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্ন মানসিকতা প্রবলভাবে দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ এর জন্য দায়ী করেছেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে। তিনি "শিক্ষার অসন্তোষ" প্রবন্ধে এই বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। ক্রমে গুরুত্ব পেল ইংরাজী শিক্ষা, তবে ইংরাজী ভাষায় অন্ধ হয়ে বাঙ্গালী তখন নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখল না। ইংরাজী ভাষার দাসত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। তারা আজ নিজেকেই দেশ মনে করে। ইংরাজী ভাষার

দাসত্ব একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আরো বড় চাকুরীর টান, শহরের টান, ভূমির সঙ্গে বাঙ্গালীদের বিচ্ছেদের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ফলে একদিকে যেমন ভূমিহারা কৃষকের সংখ্যা বাড়তে থাকে অন্যদিকে শহরে চাকুরীর সংকট - এই দুই প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের সমাজের যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরেছিল। এই ভাঙ্গনের চিত্র যে সবসময় অশুভ তা বলা যাবে না। ঐতিহাসিক কারণেই সেদিনের যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রীতিনীতি; অনেক জীর্ণ নিয়ম-নীতিরও বিলোপ ঘটেছিল। এটা যেমন যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের আশীর্বাদ তেমনি এর সঙ্গে কিছু অভিশাপ ও অবধারিত ভাবে এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছিল। আগে মধ্যবিত্তের স্বার্থের এলাকা ছিল বিস্তৃত পরিবারের মধ্যে অনেকটা ছড়ানো। সেই প্রসারের টান এখন সঙ্কুচিত হলো। ক্রমেই শহুরে চাকুরিজীবি মধ্যবিত্তের স্বার্থের কেন্দ্রগুলি পরিণত হল ছোট পরিবারে, সংকীর্ণ ও এককেন্দ্রিক জীবন ভাবনায়। এতে একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকটা চাপা পড়ে গেল, আবার একই সঙ্গে মুক্তি পেল নারী-পুরুষের অবরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তারা যেন স্বতন্ত্র প্রশ্রয় খুঁজে পেল। অন্যদিকে তাদের স্বার্থের এলাকা অনেকটা প্রসারিত হল; এবং একান্ত ভাবে মর্যদাও বড় হয়ে উঠবার পথ পেল। ছোট স্বার্থের পথ, আত্মসর্বস্বতার পথ আরো মুক্তি পেল। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যেই আর্থিক দুর্গতি ঘনিয়ে আসে। বিত্তের ক্ষেত্রেও দেখা দিল প্রতিযোগিতা। সুযোগের তুলনায় প্রতিযোগী বাড়তে থাকে। তখন জীবন যুদ্ধের তাড়নাতেই মূল্যবোধের ভাঙ্গন ধরে। চাকুরীতেও একই ধরনের দিক ফুটে ওঠে। পদের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। বেকার সমস্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিবারকে স্পর্শ করতে থাকল। এর ফলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা দুর্যোগ বাঙ্গালীদের জীবনে আরো বেশি ঘনীভূত হয়ে আসে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব এক ক্ষুদ্র অনুতে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই মানবিক মূল্যবোধ অবধারিত ভাবে ক্ষয় পেতে থাকে।

এই ভাবে উনিশ শতকের বাঙ্গালীর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যা ছিল, বিশ শতকে সেই ধ্যান ধারণাগুলির মৌলিক বদল ঘটতে আরম্ভ করলো। এই পরিবর্তনের আরো একটা কারণ ছিল উনিশ শতকের উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালী হিন্দুদের বর্ণ-বৈষম্য প্রথা, যার ফলে উচ্চবর্ণরা সব দিক থেকেই প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেল। তখন পেশার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছিল না বললেই চলে। মুসলিম প্রতিযোগী তাদের সঙ্গে তেমনিভাবে উঠে না

আসায় অনুন্নত বর্ণের হিন্দুরাই উচ্চবর্ণের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চাকুরীর সুযোগই শুধু নয়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রবাহকে পুরোপুরি গ্রহণ করল। এই প্রবাহ সারা ভারতবর্ষেই বয়ে চলে। বিশ শতকের গোড়াতেই এই চিত্রের পরিবর্তন এসেছিল। শিক্ষা শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকল না। চাকুরী ও বিত্তের ক্ষেত্রেও নিম্নবিত্ত ও মুসলমানদের কিছু অংশের মধ্যে ক্রমে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। তখন সমাজের উচ্চ ও নিম্ন সকলের কাছেই একটা শক্ত প্রতিযোগী মনোভাবের উদয় হলো, পেশা ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লো। এমনকি কেরানিগিরিও তখন সুলভ নয়। বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরিস্থিতি পরিবর্তনে ব্যক্তির মানসিকতার বদলটাও স্বভাবতই সাহিত্যে তার ছাপ ফেলেছিল। বিশেষ করে পড়েছিল গল্প ও উপন্যাসে। এই ছবি শরৎচন্দ্রের বড় গল্প বা উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। অন্তর্মুখী জীবনের প্রতি মুগ্ধতা, সেই সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির বিচ্ছেদের ছবি পাওয়া যায় "কল্লোল", "প্রগতি", "কালিকলম" প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় অনেক লেখকের রচনায়। তাদের রচনার বিষয় ততটা না থাকলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা ছিল অন্যরকম। ব্যক্তিগতভাবে তখনকার সাহিত্যের নর-নারীরা সকলেই কম বেশী ইংরাজী বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত, মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য অভিমুখী, মনেপ্রাণে নাগরিক অথবা নাগরিক হবার প্রয়াসী, কিছুটা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে ছিন্নমূল হবার আকাঙ্ক্ষাও লক্ষ করা যায়। নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে এরা বিচ্ছিন্নতা হিসাবে গণ্য না করে আধুনিকতা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাই যে এদের গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমন নয়, কিন্তু নিজেদের বিচ্ছিন্নতার প্রভাব সে সময়কার লেখকদের অর্থাৎ কল্লোলকালের লেখকদের উপন্যাসে দেখা যায়। স্বভাবতঃ এঁদের গল্প উপন্যাসে দেখা গেল ব্যক্তি প্রধান ঘটনা। সমাজ সেখানে নিশ্চিন্তভাবে ছিল গৌণ। কারণ কোন লেখকের উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষের বিষয়ভাবনা এক থাকে না। কল্লোলের লেখকদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের উপন্যাসের থেকে ও শেষের দিকের উপন্যাস পর্যন্ত পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি" উপন্যাসে যা দেখালেন, নিশ্চয়ই তাঁর "গোরা" উপন্যাসে তা দেখা যায় না। "গোরা"তে সমাজ সংস্কারের কিছু দিক উঠে আসতে দেখা গেল। এর তুলনায় "চতুরঙ্গ" ও "শেষের

কবিতা" অনেক আধুনিক, কিন্তু এই উপন্যাসগুলি অনেকটা রক্তহীন ও সমাজ বিস্মৃত বলা যায়।

বিশ শতকের সমস্ত লেখকই যে সমানভাবে ছিন্ন মানসিকতা, সমানভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল এমন নয়, তবে এই সময়েই সাহিত্যে যে একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা কোন লেখকই অস্বীকার করতে পারেন না। বিচ্ছিন্নতা, নাগরিক মনস্কতা, পাশ্চাত্য অভিমুখিতা, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা- এই লক্ষণগুলি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে ফুটে উঠতে আরম্ভ করল। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, "কল্লোল" থেকেই এই নূতন ভাবধারার আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। তবে "কল্লোল"এর কালের সব লেখকই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, বা সকলেই অতিআধুনিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সুতরাং প্রচলিত এক বিশেষ লেখকগোষ্ঠীর পাশাপাশি একটা বিপরীত বলয়ে এক বিশেষ গোষ্ঠীর লেখককুল তাদের উপন্যাস সাহিত্য রচনা করে চলেছিলেন। এঁদের রচনার সময় অন্য কথাসাহিত্যিকরাও সমানভাবে গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁরা প্রবলভাবে কল্লোলীয় আদর্শের জয় গান করেন নি। এই সময়টা অবশ্যই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় ছিল। বলা বাহুল্য, এঁরা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একবারে প্রথম সারির ছিলেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের উপন্যাসকে যদি আমরা এই পর্যায়ে ধরি তাহলে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এঁরা কেউই তেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন, কেউই পাশ্চাত্য অনুকারী লেখক নন, আবার তেমনভাবে নাগরিক মনস্কও নন। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে একটা বৈচিত্র্য দেখা গেল, এর ফলে বাঙ্গালী রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়তে থাকল। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এ বিষয়গুলি অস্ফুট ছিল, বিশ শতকের প্রথম দশকে তা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গতকারণেই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালে বাঙ্গালীর মধ্যে জীবন অনেকটা হতাশার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। এই হতাশার অন্যতম আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সেদিনের চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের মধ্যে। এর অর্থ এই নয় যে, বাংলার বিপ্লবীদের সবটাই হতাশার রাজনীতি, কিন্তু এই রাজনীতিতে অর্থনৈতিক অবক্ষয় যুক্ত থাকায় সমাজ মনের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল সেইকালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। এতে মানুষের বিশেষ ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করি। এসময় সমাজে দেখা গেল দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা, দুঃসাহস ও রোমান্টিক উদ্দামতার

বৈশিষ্ট্যগুলি। এই সময় আরো দেখা গেল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার সশস্ত্র বিপ্লবের প্রভাব, অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০ খ্রীঃ), মেদিনীপুরের সন্ত্রাসবাদী কর্মধারা যেমন ছিল, তেমনি ছিল তারুণ্যের বেহিসাবী বীরত্ব ও আত্ম বলিদানের স্পৃহা। একই সময়ে চলছে রাজনৈতিক আন্দোলন, তার একটি হল কংগ্রেসের আন্দোলনের কার্যকলাপ; অপরটি পরবর্তীকালে তরুণদের সন্ত্রাসবাদী পন্থার সশস্ত্র বিপ্লবের অন্দোলন। এর প্রেক্ষাপটে তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাগুলি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তাদের মনকে অনেকটা দিশেহারা করে তুলেছিল। এছাড়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সাম্যবাদী আন্দোলন এই তরুণ কথাসাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছিল। এর পরবর্তীকালে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলন তারা অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাঁরা শ্রমজীবি মানুষের জীবন কাহিনী সেকালের পত্র পত্রিকায় তুলে ধরেছিলেন। ফলে এই মার্ক্সবাদ আন্দোলন সেকালের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মহলে প্রসার লাভ করেছিল। বাংলা কথাসাহিত্যকে প্রচলিত জীবনের সঙ্কীর্ণতা থেকে তাঁরা মুক্তি দিয়েছিলেন। জীবনের বিভিন্ন জটিল সমস্যাকে তাঁরা তাঁদের লেখায় তুলে ধরলেন।

এইকালপর্বে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের। সেকালের লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি যুদ্ধক্লান্ত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে বিষন্ন বাঙ্গালী তরুণ চিত্তকে নূতন কৌতূহলে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। কল্লোলের লেখকরা মানুষের মনের অচেতন ও সুপ্ত সত্তাকে কথাসাহিত্যে তুলে ধরলেন। আর অনিবার্যভাবেই সেদিনের উপন্যাসে উঠে এল যৌনতা। নর-নারীর রোমান্টিক প্রেমের এই যৌনতা নূতন রূপে কথাসাহিত্যিকরা তুলে ধরলেন। এই, দেহ কামনা বা যৌন চেতনা পূর্ববর্তী লেখকদের রচনায় তেমনভাবে স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু কল্লোলের কথাসাহিত্যিকরা প্রেম সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যৌনতার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে অনুসরণ করলেন, যা সেকালের সাহিত্যের আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। প্রেমের নূতন চেতনা বাস্তবের মাটিতে পা রাখল। সেকালের বাংলাদেশের যুবসমাজের চিন্তা ও শিল্প ভাবনাকে এই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব আরো সুদৃঢ় করেছিল। চিন্তা, চেতনা ও কৌতূহল সেদিনের তরুণ সমাজকে হতাশা ও অবসাদ থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে এই সময়ে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ বাঙালীদের মনে দেখা দিয়েছিল। এই সময় বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি আগ্রহও খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাঙালীদের মনে প্রচলিত মূল্যবোধ ও জীবন দৃষ্টির পরিবর্তন দেখা দিল। এই সময় বাংলার তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মনে প্রচলিত মূল্যবোধ ও জীবনের পরিবর্তন দেখা দিল। এই পরিবর্তনে পাশ্চাত্য সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে আরো সংযোজন করা যায় যে, বাংলা কথাসাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রও অনুসরণ করেছিলেন। তিনি স্কট, লর্ড লিটন, উইলিয়াম কলিন্সএর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিদেশী প্রভাবের কথা তেমনভাবে খাটে না। বিদেশের উপাদান নিয়ে তিনি কখনই কিছু লেখেন নি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তরুণ কথাসাহিত্যিকরা বিদেশি সাহিত্যে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন –

"প্রথম মহাযুদ্ধের আলোড়ন শেষ হইলে দেখা গেল, ইউরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ উগ্রমূর্তি লইয়াই বাংলার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। ঠিক এই অবস্থায় আমিও কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পাঠ লইতেছি। ইব্‌সন, মেটালিঙ্ক, ষ্টীন্টবার্গ, টুর্গেনিভ, টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কি, লিনান্সকি, বোয়ার, ক্লুট, হ্যামসুন - বঙ্গবাসীর নিরামিষ অঙ্গনে তাজা রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে কি উত্তেজনা, কি উম্মাদনা। সেই ঢেউই চলিল "কল্লোল", "কালিকলম", "প্রগতি", "উত্তরা " পর্যন্ত।" – ৬

এই ভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঝাঁঝালো স্বাদ সমকালের সাহিত্য পত্রিকা 'কল্লোল'এ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কথাসাহিত্যের বিষয়ভাবনা, জীবনাদর্শ ও শিল্প ভাবনায় দেখা দিল নূতন রূপ ও চেতনা। এই নূতন ও বিচিত্র জীবনের পরিচয় "কল্লোল" গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এই সূত্রে তাঁরা নিজেকে অতিআধুনিক বলেও অনেকে মনে করতেন। যার ফলে বিদেশি লেখকদের শিল্প ভাবনা তাঁদের রচনায় দেখা দিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন –

"জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কীর পাঠশালায় গিয়ে থাকি, তাতে দোষ কি ? এতদিন তাদের সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের বড় বেশি সম্পর্ক ছিল না। জীবনকে দেখবার দৃষ্টি ছিল যে দুর্লভ।" - ৭

"কল্লোলগোষ্ঠী"র লেখক বলতে যে সব সাহিত্যিক এই পত্রিকায় লিখেছিলেন তাঁদের সকলকেই বুঝায়। আবার এমন অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁদের লেখা "কল্লোল" এ খুব কম প্রকাশিত হলেও তাঁরা "কল্লোল" বহির্ভূত নয়। ফলে "কল্লোল" এ প্রকাশিত লেখা দিয়ে বিচার করা যায় না। সুতরাং কল্লোল হলো সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ভাবধারা। যারা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কিছু নূতনত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। "কল্লোল" ছিল সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ। এইভাবে নাড়া দেওয়ার উদ্যম সেকালের "কল্লোল" পত্রিকার মধ্যে দিয়ে লেখকরা তুলে ধরেছেন। তাঁদের লেখায় প্রচলিত নিয়ম নীতি, আদর্শবাদ ও প্রেম সম্পর্কে একটি রবীন্দ্র বিরোধিতার মানসিকতা ছিল। এছাড়া উপন্যাস গল্পের মধ্যে দেখা দিয়েছিল দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার ও তাদের জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপ। কয়লাকুঠীর বস্তি মানুষের জীবন কাহিনী সেকালের লেখকদের উপন্যাসে উঠে এল, রবীন্দ্রনাথে এই রিয়ালিজম ছিল না বললেই চলে। এছাড়া কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় একটি ভাঙ্গনধর্মী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরোনোকে ভেঙ্গে ফেলার তীব্র মানসিকতা তাঁদের মধ্যে দেখা গেল। এর সঙ্গে ছিল সেকালের লেখকদের রোমান্টিকতা। অচিন্ত্যকুমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

"কল্লোলে সে যুগটাই ছিল সাহসী যুগ, সে সাহস রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।"
- ৮

এই মনোভাব প্রসঙ্গে কল্লোল যুগে যেসব লেখক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি লেখকরা। তাঁরা রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে সমাজের অবৈধ প্রেমের ও যৌনতাকে সাহিত্যে এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। এঁদের উপন্যাসের নর-নারীরা ছিল একটু ভাবুকী, কাল্পনিক জগতের মানুষ। তারা যেন একটি রহস্যে ঘেরা। তাদের মধ্যে ছিল তীব্র যৌন চেতনার আবেগ। তারা সকলেই যেন রোমান্টিক আবেগে ও যৌবনের উচ্ছ্বাসে, অতিকথনে

পারদর্শিতা দেখিয়েছে। এদের মধ্যে কল্লোলের গোকুলচন্দ্র নাগের "পথিক", অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বেদে", "বিবাহের চেয়ে বড়ো", "কাকজ্যোৎস্না", "আসমুদ্র" উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মিছিল" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই সব উপন্যাসে দেহচেতনা ও ব্যক্তির সম্পর্কের প্রেমের একটি নূতন রূপ ধরা পড়ে, যা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত এই দীর্ঘ পর্বের কথাসাহিত্যে সেই প্রেমের ছবি থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের এই সব লেখকদের রচনাই সমাজের বিরুদ্ধে এক তীব্র নেতিবাচক মানসিকতা লক্ষ করা যায়, যা ছিল কথাসাহিত্যে নূতন চেতনা বা ধারা। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমিতে নগর চেতনাকে হাতিয়ার করে একটি আধুনিকতার জোয়ার এসেছিল। শরৎচন্দ্রের মধ্যে পল্লী বাংলার জীবনের পটভূমি থাকলেও নায়ক নায়িকার চরিত্রের এই বিশিষ্ট দিকগুলি একটু জটিলভাবে আশা-নিরাশায়, আলো-আঁধারের ক্ষয়িষ্ণু নাগরিক সমাজের স্বরূপটি তেমনভাবে ছিল না। এই রূপটি কল্লোলকালের লেখকদের রচনায় তীব্রভাবে দেখা গেল।

উপন্যাসের এই নূতন ধারার মোহে যাঁরা পা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের নাম করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে অনেকে তাদের কালেই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কেউ ছিলেন কথাসাহিত্যিক আবার কেউ বিখ্যাত কবি। এছাড়া "কল্লোল" চেতনায় নূতন ধারা যারা এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫২ খ্রীঃ) ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪ খ্রীঃ) অন্যতম। তাঁরা মণীন্দ্রলালের রোমান্টিসিজমের পথ ধরে "কল্লোল" চেতনাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। তাঁরা "কল্লোল" এর তৎকালীন লেখকদের তুলনায় বয়সে অনেক বড় ছিলেন। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত "কল্লোল" এর কালের অতি আধুনিক তরুণদের তুলনায় অনেক প্রবীন হলেও তাঁকে কল্লোলীয় বলে ধরা যায়। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত অবশ্য অনেক বেশি বয়সে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন। "কল্লোল" প্রকাশের সময় তাঁর বয়স ছিল সাঁইত্রিশ বছর। বলা বাহুল্য, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শরৎচন্দ্রের কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি কল্লোলের স্রোতেই গা-ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি

মানুষদের নিয়ে লিখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র এই নীচুতলার মানুষদের আচার-আচরণের জীবন্ত ও বেপরোয়া বাস্তববোধকে উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে নারীর বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সমাজে নারী যে শুধু অসহায় নয়, তাদের বিচিত্র মনের বাস্তব ছবি তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নারীকে যে বন্ধনে রেখে বিচার করেছেন, তিনি তা থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিলেন। নারী মনের প্রশ্নে জগদীশচন্দ্রের মতো নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একই মনের অধিকারী। তাঁর উপন্যাসে সেক্সঘটিত সত্যতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এছাড়া সাম্যবাদী আদর্শের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছিল। মানুষের জীবনে যৌনতা যে একটা প্রবল সত্য - একথা তাঁর উপন্যাসে একাধিকবার দেখা যায়। যাকে অনেকটা ফ্রয়েডীয় ধ্যান-ধারণার সাদৃশ্য বলা যেতে পারে। মানুষের জীবনে সেক্স একটা বড় শক্তি, যে শক্তি সমাজের প্রচলিত ধারাকে তছনছ করে দেয়, এই শক্তিকে অস্বীকার করলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হয়। এছাড়া এই শক্তির অস্তিত্ব ও প্রভাবকে স্বীকৃতি না দিলে মানুষের সমাজ জীবনের অনেকটাই অস্বীকার করা হয়। বাংলা উপন্যাসে এই তত্ত্বটি প্রথম সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণও লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে "শুভা" (১৯২০ খ্রীঃ) "ছাপ" (১৯৩২ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে। নরেশচন্দ্রের "শুভা" উপন্যাসে বুদ্ধিমতি, ব্যক্তিত্বময়ী তরুণী শুভার স্বামীর গৃহত্যাগের মধ্যে দিয়ে জীবনের সার্থকতা লাভের দুঃসাহসী অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রেম ছিল না। ফলে এক সময় তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে উঠল। আবার "রক্তের ঋণ" উপন্যাসে রক্তের বন্ধনে বংশ-জাতির মর্যাদা গুরুত্ব পায় নি। নরেশচন্দ্র এই উপন্যাসে যৌন শক্তির অবিসংবাদিত রূপটি তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সাম্যবাদী আদর্শের ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজ সংস্কারের ভাবনা এখানে কাজ করেছে। তাঁর উপন্যাসে আরো দেখা যায় অপরাধ, শঠতা, মিথ্যাচার ও নিষ্ঠুর জীবনের জটিল-কুটিল অন্ধকারময় জীবন। তার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মিল ছিল সহনশীলতার, তবে উভয় লেখকই জীবনে যৌনতা যে প্রবল শক্তি - এটাকে অস্বীকার করেন নি। আবার নরেশচন্দ্রও সাম্যবাদী আদর্শের দিকটাও অস্বীকার করেন নি, তবে নরেশচন্দ্র ছিলেন তাত্ত্বিক লেখক। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ মনে হলেও তারা মাঝে মাঝে ম্লান হয়ে এসেছিল। নরেশচন্দ্র উপন্যাসে যা দেখিয়েছিলেন, তা অবশ্যই নূতন ধারার ইঙ্গিত বহন করে। জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসের নূতনত্ব এসেছিল প্রতিকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে। এছাড়া চরিত্রগুলির সংগ্রামে এসেছিল ব্যর্থতা। চরিত্রগুলি

ছিল ট্রাজেডি ভারাক্রান্ত। জীবনের অনন্ত পথ বেয়ে চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেন উঠে এসেছিল -

"কিন্তু সুন্দরী ততক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছে- সে লাফাইয়া উঠিল- এবং বিস্ময়ে রুদ্ধবাক নারীর কণ্ঠ সহসা খুলিয়া যাইয়া যে শব্দ নির্গত হইল তাহা কেবল সুন্দরীর কণ্ঠেই সম্ভব। ওরে আমার সোয়ামী-উলি, বেরো বলছিস কাকে তুই ? কার ঘরে তুই আছিস জানিস ? যেতে যেতে দাঁড়িয়ে ফিরে স্বামীর স্বত্ব জাহির করলি তুই ? আমার সামনে দাঁড়িয়ে?

বলিতে বলিতে সুন্দরী অগ্রসর হইতে লাগিল.....।

অচিন্ত্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,- আহা, থাম।

কিন্তু তাহার পর সুন্দরী আরো কিছু বলিল কিনা তাহা টুকী জানিতে পারিল না।

সুন্দরীর বাড়ী চৌকাঠ পার হইয়া সে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল।" - ৯

এই ভাবে সে সময় "লঘু-গুরু" উপন্যাসে প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস দেখা যায়। যদিও তাঁদের সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে তেমন কোন স্বকীয়তা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ভাষাকে যে মহিমায় তুলে দিয়েছিলেন, তা থেকে তিনি অনেক দূরে ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসে সবটাই কল্লোলীয় নয়, এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও মোটামুটিভাবে তাঁকে কল্লোলীয় বলেই ধরা হয়। জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসে আপাদমস্তক ঘৃণ্য মানুষের ছবি দেখা যায়। চরিত্রগুলি সত্যই প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণ্য ছিল। তাদের নরকের কীটও বলা যেতে পারে। অবশ্য "অসাধু সিদ্ধার্থ" উপন্যাসের নায়ক তাদের গোত্রের নয়। মানুষকে খারাপ, কদর্য পরিবেশ যে কিভাবে কদর্যতার পথে নিয়ে যায় তার পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই। মানুষের মূল্যবোধ এখানে পতনের মুখে। পতনের এই পিচ্ছিল পথে মানুষের পক্ষে হঠাৎ গতিরোধ করে ফিরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনা। নিছক বেঁচে থাকার কঠিন তাগিদের জন্যই তাদের সংগ্রাম বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসের নায়ক নটবরের জীবনে একই ঘটনা দেখা যায়। নটবর জন্মগতভাবে অমানুষ নয়, সে লেখাপড়া জানা মানুষ। কিন্তু কদর্য পরিবেশ তাকে কদর্যমুখী করে তুলেছিল। কিন্তু জীবনের এই চূড়ান্ত পতনের মধ্যে থেকে

এখন সে আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখে। এতে তার প্রাণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই আলোক পিপাসাই তার মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান, আর এখানেই এসেছে নিয়তির আঘাত। শেষ মুহূর্তে কাশীনাথ এসে উপস্থিত না হলে নটবর হয়তো নিজের সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকতো। তাই বলতে পারি, জগদীশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র দুইজন ঔপন্যাসিকেরই রচনায় দেখা যায় নারীর বড় সম্পদ হল যৌনতা। এই সম্পর্কেই কল্লোলের লেখকদের নাড়াচাড়া করতে দেখা যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা তাদের পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই এই নূতনধারা সমাজের গতিপথে একটা দাপট নিয়ে এল। তারা ভেঙ্গে দিল হীনমন্যতার বন্ধন। এই ভাঙ্গন ছিল প্রগতিশীল ভাঙ্গন, যাকে নূতন বিষয় ভাবনা আনার প্রয়াস বলা যায়।

প্রচলিত ধারার প্রেক্ষাপটে আধুনিকতা যারা আনলেন তাদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রীঃ) ছিলেন বয়সে বড়। তাঁর চার বছরের ছোট ছিলেন তারাশঙ্কর (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রীঃ)। তারাশঙ্করের থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত এই ১০ বছরে অনেক কথাসাহিত্যিককে দেখা যায়। যাঁরা প্রকৃতিগতভাবে কল্লোল চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রের পর একটি নূতন ধারা আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি নূতন ভাবাদর্শও আনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বিহ্বল ভাববিলাস, যৌনতা যে চরিত্রের জৈবিক ধর্ম, এই ভাবনা বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। এই সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সেই সুর এসেছিল প্রবলভাবে। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনার আগে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬ খ্রীঃ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০২-১৯৬৪ খ্রীঃ), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রীঃ) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪ খ্রীঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে এসে যায়। তবে মোটামুটি ভাবে এরা কল্লোলের সময়কার জনপ্রিয় কথাশিল্পী ছিলেন। কল্লোলীয় চেতনা প্রবলভাবে যাদের নাড়া দিয়েছিল অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা কথাসাহিত্যে তিন-বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন জনপ্রিয় কথাশিল্পীর মর্যাদা পেয়েছিলেন তেমনি অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র ও বুদ্ধদেব জনপ্রিয় কল্লোলীয় গোষ্ঠীর লেখক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

এখন কল্লোলীয় গোষ্ঠীর লেখকদের সম্পর্কে আলোচনার আগে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের মধ্যে কল্লোলীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে নূতন ধারা কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সেই দিকটা দেখা প্রয়োজন।

বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাস যখন "পথের পাঁচালী" ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, সেই বছরই "কল্লোল" পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। এই সময় রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" ও শরৎ চন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন" রচিত হয়েছিল। ঠিক একই সময়ে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দেখা গেল জ্বালাহীন দরিদ্রতা। সেই সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে চরিত্রগুলিকে বিদ্রোহী হতে দেখা যায় না। তারা নিস্পৃহ মনোভাব নিয়ে যেন বিচরণ করছে, তাদের মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নের প্রভাব অধিকভাবে লক্ষ করা যায়। চরিত্রগুলির মধ্যে নারী মনের ভালোবাসা এসেছে, তবে তা দুরন্তভাবে নয়। প্রকৃতির বুকে বিচরণকারী মানুষদের ভালোবাসাকে তারা যেন বাস্তবের মাটিতে এনেছিলেন। সেই সঙ্গে সভ্যতা বঞ্চিত হত দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর আদিবাসী জীবন বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দূরন্তভাবে প্রকাশ পেল। এই আদিবাসী জীবনের ক্ষুধা ও বঞ্চনার ছবি বিভূতিভূষণ তাঁর "আরণ্যক" উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। -

"আমারা কথায় বলি - দুমুঠো ভাতের জন্য। ভাত কি সহজ কথা ? তার জন্য অনেক পয়সা চাই। পয়সা কোথায় ?

এ দেশে পয়সা জিনিসটি বাংলাদেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্যন্ত তা দেখিতেছি। শুকনো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকির বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে.....।" - ১০

অবশ্য বিভূতিভূষণের শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে প্রকৃতি চেতনা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাঁর সমগ্র উপন্যাসে মাটির মানুষের কথা বার বার উঠে এসেছিল। আর এখান থেকেই উপন্যাসে প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করে এক নূতন ধারার সুর ভেসে আসে, যদিও সচেতনভাবে বিভূতুভূষণ কল্লোলীয় গোষ্ঠী থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তাঁর

অনেক উপন্যাসে প্রাচীন সমাজ ভাবনার ও বংশমর্যাদার কথা বারবার ফুটে উঠতে দেখা যায়।

বিভূতিভূষণের সময়কালে আরেক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে দেখা যায় রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ করে বীরভূমের সমাজ-জীবন ও পরিবেশ। তাঁর উপন্যাসে নরনারীর জীবনের সমস্যা ও সংকট এসেছিল সেকালের রাজনৈতিক অবস্থা থেকে। তাঁর উপন্যাসে সমাজে বড় রকমের পালাবদলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়া উপন্যাসগুলিতে গান্ধীবাদের অহিংসার নীতি ফুটে উঠতে দেখা যায়। সুতরাং দীর্ঘকালের একটা সাহিত্যের পরিমন্ডলকে তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে তিনি অতীতকালের আঙ্গিককেই উপন্যাসে এনেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তারাশঙ্করের "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিরোধ দেখা যায়। তাঁর মনের রূপান্তর স্বাধীনতার পরবর্তীকাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে সরলতার ভাব বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" উপন্যাসে বনোয়ারী ও করালীর যে পরিচয় পাই তাতে তারাশঙ্করের মানসিকতার পালাবদলের আভাস পাওয়া যায় -

"অনেকক্ষণ পর অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। একজন পড়ে রইল অসাড় ভাবে।
যুদ্ধটা যখন বাস্তব যুদ্ধ নয়, প্রতীকী যুদ্ধও, তখন কার যে জয় হল বোঝা কঠিন নয়।
- তুমি ? - আশ্চর্য হয়ে গেল পাখী।
- হ্যাঁ - বলেই করালী আবার ফিরল, একটা লাথি মারল বনওয়ারীর মাথায়। তারপর ফিরে এসে বলল- চল্ ! .....
সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। ক্ষত-বিক্ষত-দেহ বিজয়ী বীর টলতে টলতে চলে গেল।" - ১১

তারপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "আরোগ্য নিকেতন" - এ নূতনত্বের ধারাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এছাড়া তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের দিকটা বার বার এসেছে। সেই সঙ্গে নিম্নবিত্ত বিভিন্ন মানুষের ছবি উঠে এসেছে। চরিত্রগুলি থেকে পুরোনো জীবনযাত্রা

অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাস লেখার পাশাপাশি "কল্লোল" গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের রচনা এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "কল্লোল" গোষ্ঠীর লেখকদের আর শুধু রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্য জীবনে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায় না। তাঁরা গ্রাম্য জীবন থেকে দূরে, নাগরিক কোলাহলের মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্তের দরিদ্রতাকে তুলে ধরেছিলেন। এঁরা হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬ খ্রীঃ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০২-১৯৬৪ খ্রীঃ), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রী), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪ খ্রীঃ), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬ খ্রীঃ)। এদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে সমাজ গৌণ নয়, কিন্তু প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসেও সমাজের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের পরিবেশ ছিল বিস্তৃত ও বিচিত্রধর্মী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের যতটা নাগরিক জীবনের প্রতি ঝোঁক ছিল অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে আবার তা দেখা যায় না। অচিন্ত্যকুমারের গল্প উপন্যাসে গ্রাম্য জীবনের মানুষের কথা মাঝে মাঝে উঠে এসেছিল। তবে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের বিবরণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন - এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রচলিত সীমারেখা পেরিয়ে বাংলা উপন্যাসকে নূতন পথে পরিচালিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস সাহিত্যের যে ধারা বয়ে এসেছিল অচিন্ত্যকুমার সেই স্রোতে ভেসে না গিয়ে অন্যপথে পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি এই পথে গিয়ে কতটা স্থায়িত্ব লাভ করেছিলেন সেই আলোচনায় না গিয়ে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণামের নূতন বিষয়ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। অনেক সমালোচক তাঁর উপন্যাসে কাব্যিকতা ছিল বলে মনে করেন। তবে এই কাব্যভাবনা বাংলা উপন্যাসে নূতন নয়, এর আগে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও এই কাব্যিকতা ছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য এই সুর যথাসাধ্য বর্জন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি কাব্যিকতায় আবদ্ধ ছিল। তবে ভাবনা ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে যে তটভূমি ছিল, সেখানেই তাঁর উপন্যাসের নর-নারীদের বিচরণ করতে দেখি। অচিন্ত্যকুমারের "বেদে" (১৯৩৩ খ্রীঃ), "আসমুদ্র" (১৯৩৪ খ্রীঃ) এই উপন্যাসগুলি তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি থেকে উৎসারিত হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসে এসেছিল দরিদ্রতা। কিন্তু এই উপন্যাসে দরিদ্র মানুষ সুবিচার পায় নি। বিচারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও

বিদ্রোহ লক্ষ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অচিন্ত্যকুমারের "বেদে" উপন্যাসে পাই। এছাড়া এই উপন্যাসে চরিত্রের বীভৎসতা ও কুৎসিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার "আকস্মিক" (১৯৩০ খ্রীঃ) উপন্যাসে বেদের মত বীভৎসতার পরিচয় পাওয়া যায় না, এছাড়া তাঁর উপন্যাসে গণিকা জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গণিকাদের জীবনযাত্রায় অনুশাসনহীন উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষণীয়। যেমন শশী দামিনীকে খুন করে পালিয়ে যায়। আবার অন্য উপন্যাসে দেখছি মাতালেরা নেশা করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে। এখানে যেন সমাজ নীরব থেকে গেছে। বিবেক-দংশনের কোন বালাই উপন্যাসে দেখি না। নিকুঞ্জের স্ত্রীর গণিকা হতে আশঙ্কা করে, কিন্তু শেষে নিকুঞ্জের স্ত্রী পঞ্চুকে আশ্রয় করে তার নিজের জীবন রক্ষা করেছে। উপন্যাসে পঞ্চুই একমাত্র জীবন্ত চরিত্র। তাদের ঘর বাঁধার আগ্রহ পাঠকদের সমবেদনার সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু জৈবিক তাগিদই তাদের দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতা আনে। আবার "কাকজ্যোৎস্না", উপন্যাসে একদিকে প্রচলিত ধর্ম ও অপরদিকে সমাজ বন্ধনকে ভাঙ্গার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভাবুকী ও ভাবপ্রবণ হলেও তাদের চরিত্র চিত্রণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। আরেকটি উপন্যাসে দেখা যায় কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র নমিতা পূজার ঘরে ঢুকে সবকিছু লণ্ড ভণ্ড করে দেয়। তারপর নমিতার ভাবান্তর ঘটেছে। সে উপন্যাসের নায়ক প্রদীপের জীবন সঙ্গিনী হবার আগ্রহ জানিয়েছে। কিন্তু প্রদীপের কাছে নমিতা প্রত্যাখ্যাত হয়। তার পরেই নমিতার দুঃসাহসিকতা আরো বেড়ে যায়। নারী চরিত্রের মধ্যে প্রেমের এই উন্মাদনা ও প্রেমিকাকে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা অন্য উপন্যাসে খুব কমই দেখা যায়। "প্রচ্ছদপট" (১৯১৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জন। তাদের প্রেম বিরহের কাব্য উচ্ছ্বাসের বিবরণের পরিচয় পাই। তারা স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়েছে। তাদের দুজনেরই দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, বিচ্ছেদের মধ্যে দেখা গিয়েছে তাদের দুঃখ ও বেদনা। এইভাবে অচিন্ত্যকুমার উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসেছিলেন। আবার "উপনয়ন" উপন্যাসটির পরিকল্পনায় অচিন্ত্যকুমারের যৌন ভাবনা দেখা যায়। এই উপন্যাসে একজন তরুণ কবিকে দেখি। এই তরুণ কবি দারিদ্র্যের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য একজন স্নেহপরায়ণ অভিভাবকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু কবি জীবনের সমস্যা তার কোনদিনও দূর হয় নি। এর ফলে তার কাব্য জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এছাড়া উপন্যাসে আরো দুটি চরিত্র কুবের ও বেবিকে দেখি। কুবের ও বেবির প্রেমের বৈষম্য দেখা যায়।

বেবি ব্যক্তিত্বময়ী। তার সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনের প্রতি অবজ্ঞা দেখা গিয়েছিল। এই অবজ্ঞা তাকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না দিলেও লেখক অশ্লীল প্রেমের দুরন্তপনা তার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে চরিত্রের পারদর্শিতা, সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে গভীর ও চিন্তাশীল সংলাপগুলি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ধর্ম প্রকাশে নূতনত্বের পরিচায়ক। তাঁর উপন্যাসে মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গের ও মূল্যবোধের রূপান্তর দেখানো হয়েছে। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় লেখা উপন্যাসগুলি কল্লোলের নূতন ধারায় এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল- এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে যুব চিত্তে সংশয়, হতাশা দেখা দিয়েছিল। এই ভাবনা থেকেই উপন্যাসের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। অবশ্য তা মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের উপর কখনই আঘাত করে নি। তরুণ লেখক গোষ্ঠীর কাছে তা একটি নূতন আশ্বাসের বাণী বহন করে এনেছিল, যা সেকালের তরুণ চিত্তের কাছে অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল। এই মানসিকতা সমকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে এসেছিল, কিন্তু তা অন্যভাবে। তিনি কল্লোলে এক অভিনব ধারা আনলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রধানতঃ কবি এবং কথাসাহিত্যিক। অন্যান্য তরুণ লেখকদের মত তিনি কখনই শুধু রোমান্টিক ভাবনাকেই তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেন নি। জীবনের জটিল ও কদর্য রূপটি উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। এই রূপের মধ্যে ছিল তীব্র জীবন যন্ত্রণা। তিনি জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতিকে মন দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন। হতভাগ্য তুচ্ছ মানুষের প্রতি সমবেদনা তাঁর উপন্যাসে দেখতে পাই। তিনি কখনই চরিত্রের বিকাশে উচ্ছ্বসিত রোমান্টিক ভাবনা আনেননি, আবার বেদনায় কাতর অশ্রু সজল চিত্তেরও অবতারণা করেন নি। তিনি অনুভব করেছেন তুচ্ছ, নগণ্য, ছন্দহীন জীবনের প্রতি এক গভীর মমত্ব বোধ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে স্থূলভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে হতাশা, ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ থেকে তিনি উত্তরণের পথ হিসাবে সমাজতন্ত্রের বাণীকে বহন করেছিলেন। তিনি "পাঁক" (১৯২৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে কুৎসিত বিকৃত পরিবেশের এক বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে উত্তরণের পথও নির্দেশ করেছেন। এই উপন্যাসে এক মহান আদর্শের বাণী ফুটে উঠতে দেখা যায়। তিনি বস্তিবাসীর জীবনের ছবি জীবন্ত ভাবে তুলে ধরেছেন। আর এই ছবিতে লেখক আধুনিক জীবনের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করেছেন। যার ফলে নগর জীবনের বিপর্যয় তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছিল। এই ভঙ্গুর সমাজে মানুষের জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক উপন্যাসে এসেছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নকুড় দাস ও বীনুর রূপান্তরের

কাহিনী অসঙ্গত মনে হলেও এই জীবন থেকে মুক্তির একটি ছবি ভেসে আসে। নকুড় দসের বিকলাঙ্গ জীবন থেকে বীনু বেরিয়ে আসতে চায় -

"তাহার যেন মনে পড়ে নকুড় দাসের এই সংসারের বাহিরে কত বড় পৃথিবী তাহার জন্য অপেক্ষা করে আছে" - ১২

এই বদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার যন্ত্রণার ছবিটি তাঁর এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। তিনি চরিত্রের জৈবিক চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল কল্লোল যুগের নূতনত্ব। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা চিঠিতে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে জানিয়েছেন-

"কিন্তু আসল কথা কি জানিস অচিন, ভালো লাগে না - সত্যি ভালো লাগে না - বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই; নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোনো আনন্দ।" - ১৩

শৈলাজনন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০ খ্রীঃ) কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রথম কথাসাহিত্যে একটা নূতন চাঞ্চল্য এনেছিলেন। তিনি সচেতনভাবে প্রচলিত ধারা থেকে এই নূতনত্ব আনতে উন্মুখ ছিলেন। তাঁর "কয়লা কুঠী" গল্পে (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) নূতন জীবনের প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি কয়লা খনির সাঁওতাল কুলি মজুরের জীবন কাহিনীতে নূতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যে রাঢ়ের জীবন যাত্রা, সমাজ ও জীবনের বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে এই নূতনত্ব সেই যুগের "কল্লোল" চেতনাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। এই সময়ে "কল্লোল" এর যে নূতন ধারা এসেছিল সেই ধারায় নেমেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ খ্রীঃ)। তাঁর উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে যৌনতা স্বীকৃতি পেল। তিনি প্রবলভাবে "কল্লোল" গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও কল্লোলের মানসিকতাকে তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। জীবনের জটিল বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে স্থান পেল। বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ ও তাৎপর্য বাস্তবতার নিরিখে উঠে এসেছিল। মানব চরিত্রের চেতন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব ও নর-নারীর জীবনের জটিল কৌতূহল উপন্যাসে ফুটে উঠেছিল। তাঁর "দিবারাত্রির কাব্য" উপন্যাসে (১৯৩৫

খ্রীঃ) নূতনত্ব না থাকলেও চরিত্রগুলি বাস্তবে রক্ত মাংসের নর-নারী হয়ে উঠেছিল। তিনি দাম্পত্য জীবনের সামঞ্জস্যহীনতা "পুতুলনাচের ইতিকথা" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কুসুম। তার বিবাহ হয়েছে সেই গ্রামেই। তবু তার মধ্যে দাম্পত্য জীবন থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র মানসিকতা লক্ষ করা যায়। শশীর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরিয়েছিল। কুসুমের মধ্যে যৌন আকর্ষণের আভাস ফুটে উঠেছে। কুসুমের উক্তিতে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় -

"আপনার কাছে দাঁড়ালে, আমার শরীর-এমন করে কেন ছোট বাবু ? " - ১৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীর মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য বধূর জীবন ও চরিত্রের বাস্তব সত্যকে বহন করে এনেছেন। নর-নারীর জীবনে এই প্রেম পিপাসাকে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে এনেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতার পথে তাকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন, যা কল্লোলীয় ধারার উপকরণ বলা যেতে পারে। তাঁর "চতুষ্কোণ" উপন্যাসে বিকৃত ও অস্বাভাবিক যৌনতার চেতন-অবচেতন মনের দিকগুলি অভিনব রূপদান করেছিল। মানব মনের এই জটিল মনলোকের বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাস জগতে অভিনবত্বের স্বাদ এনেছিল। এই ধারায় বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলি কল্লোলীয় চেতনায় কতটা নূতনত্ব এনেছিল তা বিশ্লেষণ করাই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য।

উল্লেখপঞ্জী

১) অভিশাপ/নজরুল ইসলাম/কল্লোল/১৩৩০ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা/পৃষ্ঠা-১০

২) বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ, (ষষ্ঠ খণ্ড)/রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক (সাহিত্যচর্চা), প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬ সাল, গ্রন্থালয় প্রাঃলিঃ/ পৃষ্ঠা-৩১০

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড, / ডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ ২৫ শে মার্চ, ১৯৯৯/ পৃষ্ঠা-৩৩৩

৪) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা/সত্যেন্দ্রনাথ রায়/প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০/ প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩/ পৃষ্ঠা- ২৩

৫) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/প্রকাশক- শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/পৃষ্ঠা - ৬১

৬) আত্মস্মৃতি, সজনীকান্ত দাস, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১২

৭) ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের "কালিকলমে" প্রকাশিত পত্র থেকে/ পৃষ্ঠা-১০

৮) কল্লোল যুগ/ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/ পৃষ্ঠা- ৮২

৯) জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)/প্রথম প্রকাশ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ/প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৬৯

১০) আরণ্যক/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়/ জৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক- তারাদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কোলকাতা-১২/ পৃষ্ঠা- ১৭০

১১) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়/বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বি.বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, প্রকাশক- ময়ূখ বসু, নূতন সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৭/ পৃষ্ঠা- ১৪০

১২) উপনয়ণ/প্রেমেন্দ্র মিত্র/প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারী ১৯৮৩, প্রকাশক- ফণীভূষণ দেব, আনন্দ পাব্লিসার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৯/ পৃষ্ঠা- ৭০।

১৩) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/ পৃষ্ঠা- ১২

১৪) পুতুলনাচের ইতিকথা/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রকাশক- শ্রী সোমশুভ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১১৯।

তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ পর্ব বিন্যাস ও বিষয়ানুসারে বিশ্লেষণ

"কল্লোল" পত্রিকাকে আশ্রয় করে সেকালের তরুণ কথাশিল্পীরা সাহিত্যে যে নূতন যুগ আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। নূতন যুগের আবেগ ও মূল্যবোধকে তিনি সাহিত্যের রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যের সম্ভারে প্রথম দেখা যায় ছোটগল্প। এর দুই বছর পরে তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর মোট উপন্যাসের সংখ্যা তেতাল্লিশ। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে পঁচিশটি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। পরবর্তী উপন্যাসগুলি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া সমকালীন বাঙ্গালীর মানসপটে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুভূতি ও আবেগ, সমাজবাদ ও ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব কথাসাহিত্যিকদের শিল্প চেতনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসগুলিতে এই প্রভাব পড়েছিল। তাই তাঁর প্রথমদিকের উপন্যাসে নর-নারীরা যেভাবে বিচরণ করেছিল শেষের দিকের উপন্যাসে তা দেখা যায় না। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের উপন্যাসের চরিত্রগুলির স্বভাব, চিন্তা চেতনা ও জীবনাচরণেরও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। সুতরাং এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর প্রথম ও শেষের দিকের উপন্যাসের বিভাজনের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের এইসব দিক লক্ষ্য করে তাঁর উপন্যাসগুলিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হল ঃ

ক) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের প্রথম পর্ব (১৯২৮-৪৪ খ্রীঃ)</u>

খ) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৫-৭২ খ্রীঃ)</u>

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্বের (১৯২৮-১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসগুলি কাল অনুযায়ী উল্লেখ করা হলঃ

সাড়া (১৯২৮-৩০ খ্রীঃ), অকর্মণ্য (১৯২৯-৩১ খ্রীঃ), অনেকরকম (১৯৩০ খ্রীঃ), যবনিকা পতন (১৯৩১ খ্রীঃ), রডোডেনড্রন গুচ্ছ (১৯৩১ খ্রীঃ), মন-দেয়া-নেয়া (১৯৩২ খ্রীঃ), অসূর্য্যম্পশ্যা (১৯৩২ খ্রীঃ), ধূসর গোধূলি (১৯৩২ খ্রীঃ), পরস্পর (১৯৩৪ খ্রীঃ), সানন্দা (১৯৩৩ খ্রীঃ), আমার বন্ধু (১৯৩৩ খ্রীঃ), যেদিন ফুটলো কমল (১৯৩৩ খ্রীঃ), হে বিজয়ী বীর (১৯৩৩ খ্রীঃ), এলোমেলো (১৯৩৩ খ্রীঃ), একদা তুমি প্রিয়ে (১৯৩৩ খ্রীঃ), বাসর ঘর (১৯৩৩ খ্রীঃ), বাড়ি বদল (১৯৩৪ খ্রীঃ), সূর্যমুখী (১৯৩৪ খ্রীঃ), লালমেঘ (১৯৩৪ খ্রীঃ), চৌরঙ্গী (১৯৩৫ খ্রীঃ), পরিক্রমা (১৯৩৬ খ্রীঃ), পারিবারিক (১৯৩৬ খ্রীঃ), দুই ঢেউ এক নদী (১৯৩৬ খ্রীঃ), কালো হাওয়া (১৯৩৯-৪০ খ্রীঃ), অদর্শনা (১৯৪৪ খ্রীঃ)। এছাড়া অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে বুদ্ধদেব বসু আরো দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাস দুটি হল "বিসর্পিল" (১৯৩২ খ্রীঃ)ও "বনশ্রী"(১৯৩৩ খ্রীঃ)।

বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় পর্বের (১৯৪৫-১৯৭২ খ্রীঃ) উপন্যাসগুলি কাল অনুযায়ী সাজানো হল ঃ

বিশাখা (১৯৪৫ খ্রীঃ), তিথিডোর (১৯৪৭-৪৯ খ্রীঃ), হাওয়া বদল (১৯৫০ খ্রীঃ), অন্য কোনখানে (১৯৫০ খ্রীঃ), মনের মতো মেয়ে (১৯৫১ খ্রীঃ), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১ খ্রীঃ), মৌলিনাথ (১৯৫২ খ্রীঃ), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৫৬ খ্রীঃ), শেষ পাণ্ডুলিপি (১৯৫৬ খ্রীঃ), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৬-৬৭ খ্রীঃ), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৭-৬৮ খ্রীঃ), আয়নার মধ্যে একা (১৯৬৮ খ্রীঃ), শোনপাংশু (১৯৬৯ খ্রীঃ), বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯ খ্রীঃ), প্রভাত ও সন্ধ্যা (১৯৭০-৭১ খ্রীঃ), রূকমী (১৯৭১-৭২ খ্রীঃ), এক বৃদ্ধের ডায়েরী (১৯৭২)।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের বিষয় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসকে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগ করার পর এবার তাঁর উপন্যাসকে আমরা বিষয় অনুসারে ভাগ করবো। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, তাঁর উপন্যাসের বিষয় ভাবনার মূল সুর প্রায় একই রকম। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের লেখা ও পরবর্তী কালের লেখা উপন্যাসগুলির কিছু বিষয় ভাবনা ও চরিত্রের চেতনার সজীব ও গাঢ় অনুভূতি লক্ষ করা যায়। এই অনুভূতি তাঁর উপন্যাসকেও

গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফলে তাঁর উপন্যাসে ঘটনা ও নর-নারীর জীবন যাত্রায় আলাদা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই পরিবর্তন সূত্রে তাঁর উপন্যাস গুলিকে বিভিন্ন বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের গোত্রে ফেলে আলাদা করা যেতে পারে।

প্রথম পর্বের (১৯২৮-৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের বিষয় অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করা হল।

ক) আত্মমুখী স্বপ্নাবিষ্ট রোমান্টিক উপন্যাস ঃ

সাড়া, রডোডেনড্রন গুচ্ছ, ধূসর গোধূলী, সানন্দা, হে বিজয়ী বীর, একদা তুমি প্রিয়ে, অসূর্য্যম্পশ্যা, সূর্যমুখী, বাড়িবদল, পরস্পর, এলোমেলো, অনেক রকম।

খ) দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেমের উপন্যাস ঃ

লাল মেঘ, রূপালি পাখি, কালো হাওয়া, চৌরঙ্গী।

গ) দেহ চেতনার যন্ত্রণা ও রহস্য সূচক উপন্যাস ঃ

যবনিকা পতন, মন-দেয়া-নেয়া, সূর্যমুখী।

ঘ) বিশুদ্ধ প্রেমের উপন্যাস ঃ

অকর্মণ্য, যেদিন ফুটলো কমল, পরিক্রমা, আমার বন্ধু, পারিবারিক, দুই ঢেউ এক নদী।

ঙ) মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

অদর্শনা, বাসর ঘর।

এবার দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিকে বিষয়ানুসারে শ্রেণী বিভাগ করা হল ঃ

১) চেতনা মূলক উপন্যাস

রুকমী, আয়নার মধ্যে একা, নির্জন স্বাক্ষর, হাওয়া বদল

২) জীবনাদর্শমূলক উপন্যাস

মৌলিনাথ, নীলাঞ্জনার খাতা, প্রভাত ও সন্ধ্যা, শোনপাংশু

৩) দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও নূতন পথের দিশারী

শেষ পাণ্ডুলিপি, রাত ভ'রে বৃষ্টি, বিপন্ন বিস্ময়, গোলাপ কেন কালো।

তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ পর্ব বিন্যাস ও বিষয়ানুসারে বিশ্লেষণ

"কল্লোল" পত্রিকাকে আশ্রয় করে সেকালের তরুণ কথাশিল্পীরা সাহিত্যে যে নূতন যুগ আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। নূতন যুগের আবেগ ও মূল্যবোধকে তিনি সাহিত্যের রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যের সম্ভারে প্রথম দেখা যায় ছোটগল্প। এর দুই বছর পরে তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর মোট উপন্যাসের সংখ্যা তেতাল্লিশ। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে পঁচিশটি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। পরবর্তী উপন্যাসগুলি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া সমকালীন বাঙ্গালীর মানসপটে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুভূতি ও আবেগ, সমাজবাদ ও ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব কথাসাহিত্যিকদের শিল্প চেতনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসগুলিতে এই প্রভাব পড়েছিল। তাই তাঁর প্রথমদিকের উপন্যাসে নর-নারীরা যেভাবে বিচরণ করেছিল শেষের দিকের উপন্যাসে তা দেখা যায় না। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের উপন্যাসের চরিত্রগুলির স্বভাব, চিন্তা চেতনা ও জীবনাচরণেরও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। সুতরাং এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর প্রথম ও শেষের দিকের উপন্যাসের বিভাজনের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের এইসব দিক লক্ষ্য করে তাঁর উপন্যাসগুলিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হল ঃ

ক) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের প্রথম পর্ব (১৯২৮-৪৪ খ্রীঃ)</u>

খ) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৫-৭২ খ্রীঃ)</u>

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্বের (১৯২৮-১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসগুলি কাল অনুযায়ী উল্লেখ করা হলঃ

তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ পর্ব বিন্যাস ও বিষয়ানুসারে বিশ্লেষণ

"কল্লোল" পত্রিকাকে আশ্রয় করে সেকালের তরুণ কথাশিল্পীরা সাহিত্যে যে নূতন যুগ আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। নূতন যুগের আবেগ ও মূল্যবোধকে তিনি সাহিত্যের রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যের সম্ভারে প্রথম দেখা যায় ছোটগল্প। এর দুই বছর পরে তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর মোট উপন্যাসের সংখ্যা তেতাল্লিশ। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে পঁচিশটি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। পরবর্তী উপন্যাসগুলি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া সমকালীন বাঙ্গালীর মানসপটে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুভূতি ও আবেগ, সমাজবাদ ও ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব কথাসাহিত্যিকদের শিল্প চেতনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসগুলিতে এই প্রভাব পড়েছিল। তাই তাঁর প্রথমদিকের উপন্যাসে নর-নারীরা যেভাবে বিচরণ করেছিল শেষের দিকের উপন্যাসে তা দেখা যায় না। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের উপন্যাসের চরিত্রগুলির স্বভাব, চিন্তা চেতনা ও জীবনাচরণেরও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। সুতরাং এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর প্রথম ও শেষের দিকের উপন্যাসের বিভাজনের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের এইসব দিক লক্ষ্য করে তাঁর উপন্যাসগুলিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হল ঃ

ক) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের প্রথম পর্ব (১৯২৮-৪৪ খ্রীঃ)</u>

খ) <u>বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৫-৭২ খ্রীঃ)</u>

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্বের (১৯২৮-১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসগুলি কাল অনুযায়ী উল্লেখ করা হলঃ

৪) প্রেমের উপন্যাস

বিশাখা, তিথিডোর, পাতাল থেকে আলাপ, এক বৃদ্ধের ডায়েরী, মনের মতো মেয়ে।

বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের (১৯২৯-১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের বিষয়ভাবনা বিশ্লেষণ ঃ

ক) আত্মমুখী স্বপ্নাবিষ্ট রোমান্টিক উপন্যাস

এই পর্বটি মূলতঃ তিরিশের দশকের। এই সময় কল্লোলের চেতনাগুলি ভালোভাবে ধরা পড়েছিল। এই সময় বুদ্ধদেবের উপন্যাসের প্রাণশক্তি নিহিত ছিল কল্লোলের মধ্যে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক ও বাস্তব জীবনে শিথিলতা। ব্যক্তির চেতনা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর পিপাসা ইত্যাদি নানা কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কল্লোলের অধিকাংশ লেখকেরই মতো বুদ্ধদেবের ব্যক্তি হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চেতনার কারুকার্য দ্বারা মণ্ডিত ছিল। এখানে সমাজ সংস্কারের অস্তিত্ব নেই, এখানে লেখকের জীবন ভাবনাই বড় হয়ে উঠেছে। নিজেকে নিয়ে সংশয়, স্বপ্ন, কামনা এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইসব ভাবনার মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। "সাড়া" উপন্যাসে সাগর, "যেদিন ফুটল কমল" উপন্যাসে পার্থপ্রতিম, "বাসর ঘর"-এ পরাশর, "একদা তুমি প্রিয়ে"-এর পলাশ এদের সকলের চিন্তা ভাবনা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে লেখক নিজেকেই তুলে ধরেছেন। কবি যেন রোমান্টিক স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। আশা নিরাশা, সংশয় ও স্বপ্ন, ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে বুদ্ধদেব নিজের তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। এই তারুণ্য বা যৌবন ধর্মের মর্ম কথাই ছিল তাঁর এই স্বপ্নাবিষ্ট, আত্মমুখী, রোমান্টিক উপন্যাসের সার কথা। "সাড়া" থেকে শুরু করে এই পর্বের প্রায় সর্বত্র বুদ্ধদেবের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করি। আত্মমুখী রোমান্টিক কবিপ্রাণতা ও বিষন্ন স্বপ্ন জগতের মধ্যে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিচরণ করতে দেখি। এই আত্মমুখী রোমান্টিক কাব্যময়তার সৌরভ বুদ্ধদেবের উপন্যাসকে দিয়েছে আলাদা স্বাদ। প্রচলিত উপন্যাস থেকে এখানেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসের অভিনবত্ব। তাঁর উপন্যাসে ঘটনার ঘনত্ব ও জটিলতা নেই, বুদ্ধদেব সে বিষয়ে না তাকিয়ে চরিত্রের মনোজগতকে আলোকিত করেছেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ছবি তুলে ধরতে গিয়ে প্রেমকে অধিক মাত্রায় প্রাধান্য দিতে হয়েছে। তিনি প্রেমের উন্মাদনা এমনভাবে

উপন্যাসে তুলে ধরেছেন যা তারুণ্যের উদ্দাম উচ্ছলতারই নামান্তর। তিনি ঘটনার চেয়ে নর-নারীর প্রেমের দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এই আবেগ সঞ্চারী মনোভাব "সাড়া " উপন্যাসে দেখতে পাই। আবার "মন-দেয়া-নেয়া"তে, প্রত্যেকটি নারী পুরুষ গল্প বলার ছলে একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছে। "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে শ্রীলতাকে ভালোবাসতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিমনের চিন্তা ভাবনা যে অসীম ও চিরন্তন - তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

"সাড়া" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক শ্রী আশুতোষ ঘোষ, গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং, ১১, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম সংস্করণ - ১৯৩০, দাম - ২ টাকা। শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস প্রিন্টার - সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, ৭১/১ মির্জাপুর স্ট্রীট, কোলকাতা। বই এর প্রচ্ছদ সজ্জা শ্রী অনিল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের করা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭ সালে। কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কোলকাতা। মূল্য ৪ টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস "সাড়া" (১৯২৮-২৯)। এই উপন্যাস রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি। তাঁর তেতাল্লিশটি (৪৩) উপন্যাসের মধ্যে "সাড়া" সাধুভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস। এরপর সাধুভাষায় বুদ্ধদেব আর কোনো উপন্যাস রচনা করেন নি। এই সময় "প্রগতি" পত্রিকা প্রকাশ পায়। তিনি "প্রগতি" পত্রিকার চাহিদা মেটানোর জন্য "সাড়া" রচনা করেন। ১৯২৮ সালে উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন এবং ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রূপে প্রকাশিত হয়। "প্রগতি"-এর সম্পাদকের উপদেশ মতই তিনি উপন্যাস রচনায় মন দিয়েছিলেন।

উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল -

"এই আমার প্রথম উপন্যাস
শ্রী অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে
দিলাম
যে লেখকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা
সেই মানুষের প্রতি অনুরাগের সমান
এ-বই তাঁর উপযুক্ত বলে নয়,
আমার প্রথম বলে।"

২৫/০১/১৯৩০
শ্রী বুদ্ধদেব বসু। - ১

"সাড়া" উপন্যাসটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি খণ্ডের আলাদা নামকরণে শিরোনাম আছে। আর প্রত্যেকটি খণ্ড আলাদা ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা খণ্ডান্তর করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড - ঘুম পাড়ানি গান (১, ২, ৩, ৪)

দ্বিতীয় খণ্ড - কাক স্নান (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)

তৃতীয় খণ্ড - সোনার শিকল (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)

চতুর্থ খণ্ড - অবগাহন (১, ২, ৩, ৪, ৫)

পঞ্চম খণ্ড - সাড়া (১, ২, ৩)

এই উপন্যাসটির প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত "প্রগতি"তে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ খণ্ড দুটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর এই "সাড়া" উপন্যাস সেই সময়কার পাঠক ও সাহিত্যিক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন -

"বর্তমান কালে যাঁরা প্রথম এ-বই পাঠ করবেন তাদের মনে বরং আপত্তি জাগতে পারে যে এর পাত্র-পাত্রীরা বিদেহ এবং নির্বস্তুক। তরুণ বয়সে রচিত উপন্যাসের এটাকে একটি সামান্য লক্ষণ বলা যায়, তবু একথাও সত্য যে মানুষের মৌল প্রকৃতির বদল হয় না, অন্তবর্তী তিরিশ বছরে আমার রচনায় যে মানসতার বিবর্তন ঘটেছে তার অঙ্কুরোদ্‌গম "সাড়া"তে লক্ষণীয় নয় তা নয়। সাগরের ভাবুক স্বভাব আমার উপন্যাসের নায়কদের কুলক্ষণ, তাঁর শৈশব জীবন নগরপ্রীতি আমার পরবর্তী রচনায় বার বার হানা দিয়েছে, প্রেমের চরম সার্থকতা যে দুঃখেই এই ধারণা আমি এখনো কাটাতে পারি নি"

- ২

"সাড়া" উপন্যাসের প্রথমে উপন্যাসের নায়ক সাগরের মায়ের যে স্বপ্ন দেখার কথা রয়েছে তা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংখ্যায় "শনিবারের চিঠিতে" অশ্লীল বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া উপন্যাসের আরো অনেক খণ্ডে এই অশ্লীলতা ছড়িয়ে আছে বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। এবার আমরা "সাড়া" উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত অভিযোগের সত্যতা ও তার শিল্প শৈলী তুলে ধরবো।

সাগর এই উপন্যাসের নায়ক। সাগরের বাবা ব্যোমকেশ বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী। তার মায়ের নাম মলিনা। সে ছিল গৃহবধূ। সাগর নিতান্ত দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির। সঙ্গী বলতে ছিল প্রতিবেশী হরনাথবাবুর মেয়ে লক্ষ্মী নামে এক বালিকা। তার কাছেই ছিল সাগরের মনের টান, সে ছিল তার গল্প বলার সাথী। সাগরের জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী বাবা-মার সঙ্গে অন্যত্র চলে যায়। এদিকে সাগরের মা মলিনার স্নেহ স্পর্শে সাগর প্রতিপালিত হয়। এই সময়ে তার জীবনের উন্মুক্ত আকাশ যেন সাগরকে চেপে ধরে। কারণ শিশু সাগরের এই আট বছর বয়সেই মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর সাগরের পিতা ব্যোমকেশ তাকে স্কুল জীবনের পড়া শেষ করিয়ে কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করায়। কলেজের হোষ্টেলে সত্যবান নামে এক বন্ধুর সংস্পর্শে বিভিন্ন সাহিত্য আসর ও অভিজাত পরিবারের সঙ্গে সাগরের পরিচিতি হয়। ইতিমধ্যে কলেজে সাহিত্যিক হিসাবে সাগরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অভিজাত পরিবারের মেয়ে পত্রলেখার সঙ্গে তার এই ভাবেই পরিচয় হয়। এই পরিচয় থেকেই প্রেম, প্রেম থেকেই বিবাহের প্রস্তাব আসে সাগরের কাছে। পত্রলেখার মায়ের তরফ থেকে বিয়ের জোর তাগিদ সাগরের আত্মসম্মানে আঘাত করে। এই অপরাধের ঘটনা লোকমুখে প্রচারিত হয়। সাগরের কাছে সত্যবান একনিষ্ঠ বন্ধু। সত্যবানের পরামর্শ মতো সাগর বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে বাবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মণিমালা নামে এক গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই সত্যবানের পত্র পেয়ে সাগর কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। সাগর আবার কোলকাতায় গিয়ে সত্যবানের পতিতা বান্ধবী নির্মলার বাড়িতে গিয়ে উঠল। কলেজ শিক্ষক মিহিরবাবুর সঙ্গে সাগরের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। ঘটনাক্রমে বাল্যকালের খেলার সাথী লক্ষ্মীকে এখন মিহিরবাবুর স্ত্রী হিসাবে সাগর দেখতে পায়। পুরোনো সঙ্গী লক্ষ্মীকে দেখতে পেয়ে সাগরের শুরু হয় বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন। এই সূত্রে লক্ষ্মী ও সাগরের অবাধ মেলামেশা শুরু হয়। এই ঘটনায় মিহিরবাবু ছিল নীরব দর্শক মাত্র। উপন্যাসের শেষ অংশে দেখি লক্ষ্মী সাগরের কাছে চলে যায়। এটাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের প্রথমে সাগর ও খেলার সঙ্গী লক্ষ্মীর মধ্যে বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন। থিয়েটার দেখে তারা একই ঘরে রাত কাটিয়েছে। যদিও তারা ছিল সেই সময় বয়সে নবীন। তাদের মধ্যে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যৌন সাড়ার যেন সূচনালগ্ন। তারপর উপন্যাসের একেবারে শেষ খণ্ডে সেই বাল্য সাথী লক্ষ্মীর সঙ্গে সাগরের দেখা। এখন লক্ষ্মী সাগরের কলেজের অধ্যাপক মিহিরবাবুর স্ত্রী, কিন্তু সাগর

যৌবন উন্মাদনায় লক্ষ্মী যে নিজের কলেজ শিক্ষকের স্ত্রী- একথা ভুলে যায়। সাগরের মনে কোন সংযম লক্ষ করা যায় না। কোন সামাজিক বাধা তাদের অবৈধ মেলামেশায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রথাগতভাবে শিক্ষকের প্রতি সম্মান দিতেও সাগরের বোধে আসে না। তারা আপন যৌবন জোয়ারে সন্তরণরত যেন দুটি প্রাণী। লক্ষ্মীর মনেও কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। সামাজিক নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে লক্ষ্মী সাগরের ঘরে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের প্রতি তার যেন অনীহা। মিহিরবাবুর গবেষণায় লক্ষ্মী যেন ক্লান্ত। সাংসারিক জীবনে মিহিরবাবুর কাছ থেকে কোন সুখ লক্ষ্মী উপভোগ করে নি। সেইসঙ্গে লক্ষ্মী তার পুরোনো সঙ্গীকে পেয়ে ভুলে গিয়েছিল বিবাহিত স্ত্রীর বাধা-নিষেধ। তাই সে নিজেকে সাগরের কাছে সমর্পণ করে দেয়। আবার মিহিরবাবু তাদের প্রেমের মধ্যে এক অতীত প্রেমের স্মৃতি দেখতে পায়। তাই নিজেকে সে গুটিয়ে রেখেছিল। এছাড়া উপন্যাসের "কাকস্নান" খণ্ডে বুদ্ধদেব বসু পত্রলেখা নামে একটি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। সাগরের আত্মমর্যাদাবোধ যে এত প্রবল পত্রলেখা চরিত্র না থাকলে তা উপলব্ধি করা যেত না। সাগর চরিত্রের পরিপূর্ণতা দিতে লেখক যেন পত্রলেখা চরিত্রের পরিকল্পনা করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে প্রথাগত সামাজিক বিবাহ অপেক্ষা যৌবন তরঙ্গে উদ্বেলিত নর-নারীর সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই সাগর চরিত্রটিকে বিবাহিত স্ত্রী মণিমালার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে সংসারের প্রতি কোন আসক্তি হতে লেখক দেখান নি। প্রথমদিকে পত্র দিয়ে খোঁজ নিলেও শেষের দিকে কোন পত্রের দ্বারাও বিবাহিত স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর নেওয়ার তাগিদ তার মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

সাগর চরিত্রের পাশাপাশি উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু আরেকটি ভাগ্যতাড়িত যুবক সত্যবানের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। সত্যবান-নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে নির্মলার কাছে যাতায়াত করেন। সত্যবান তাকে বিবাহ করে নি। কিন্তু অবৈধ সম্পর্কের গভীরতায় নির্মলা স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা দাবী করে। সত্যবানের দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সে সাগরকে যেন পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সত্যবান ছিল সাগরের শুভাকাঙ্ক্ষী। তারই পরামর্শে সাগর দ্বিতীয়বার কোলকাতায় চাকুরী পেয়েছিল। উপন্যাসে সাগর-লক্ষী, নির্মলা-সত্যবান, কন্দর্প-পত্রলেখা এই ত্রয়ী প্রেম যুগলের মাঝে শারীরিক সম্পর্ক নর-নারীর জীবনে কতখানি মাত্রা পায় লেখক তা দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের প্রথমেই যৌন উত্তেজনাপূর্ণ একটি স্বপ্ন দেখেছে সাগরের মা মলিনা। সাদা বরফের দেওয়ালে শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে উপরে ঠেলে ওঠার দৃশ্য মলিনার মধ্যে দেখতে পাই। সাগরের কান্নার মধ্যে দিয়েই মলিনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। এই স্বপ্নময় পরিবেশ দিয়েই উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছে। এখান থেকেই বুদ্ধদেবের অশ্লীলতার অভিযোগের অঙ্কুরলগ্ন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। লেখক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই অশ্লীলতার অভিযোগ বুদ্ধদেবের পিছনে তাড়া করে ফিরছে। আজকের দিনে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল কারণ যৌনতার প্রকাশ নয়, অবিবাহিত নর-নারীর প্রণয়ের নির্লজ্জ স্বীকৃতি। অশ্লীলতার প্রথম অভিযোগ আসে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন বুদ্ধদেব বসু স্কুলে পড়েন। কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন মাষ্টারমশাই তাঁর ইংরাজী গল্প "Joede Vivre" এর দ্বিতীয় অংশ স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপতে আপত্তি করেন। কারণ এই গল্পের মধ্যে কিছু অশ্লীল সংলাপ শিক্ষক মহাশয় দেখতে পান। তার পর "রজনী হ'লো উতলা" (১৯২৬ খ্রীঃ) নিয়ে তোলপাড় করার অভিযোগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে হয়। এরপর "সাড়া" উপন্যাস- যার নূতন সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন -

"আজকের দিনের পাঠকরা শুনে নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন যে প্রথম প্রকাশকালে "সাড়া" চিহ্নিত হয়েছিল অশ্লীলতার দুঃসহ নিদর্শন রূপে। কেউ এতে ঈডিপাস-এষণা আবিষ্কার করেছিলেন, কেউবা, অজাচার"। কিন্তু এই প্রথম (যদিও এই শেষ নয়) সেই অশ্লীলতার অভিযোগ গড়াল আদালত হয়ে পুলিশ পর্যন্ত।"- ৩

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন আদালতে এই অশ্লীলহীনতার প্রমাণ দিতে গিয়ে এক বিখ্যাত উকিলকে ধরেছিলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে "আনন্দবাজার পত্রিকা"-র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৩৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী সম্পাদকীয় কলমে লিখেছিলেন -

"উপন্যাসের নর-নারীরা কিভাবে প্রেম নিবেদন বা হৃদয় বিনিময় করিবে, তাহার হুদ্দা যদি পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে অতি শোচনীয় দুর্দিন সমাগত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু উচ্চশিক্ষিত; বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান তিনি পাইয়াছেন এবং অল্প বয়সেই বাংলা সাহিত্যে তাঁহার রচনাগুলি একটি

বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। পান্ডিত্য ও প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি দরিদ্র বলিয়াই যে এইভাবে নির্যাতিত হইলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা" - ৪

সুতরাং দেখা যায় বুদ্ধদেব বাবুর প্রথম উপন্যাস "সাড়া"- তে উপন্যাস রচনার-বিশেষত্বগুলি দোষগুণ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। এবার এই "সাড়া" উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণের যে গ্রহণ-বর্জন ঘটেছিল তা তুলে ধরা প্রয়োজন। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৭ খ্রীঃ) এই গ্রহণ-বর্জনে বুদ্ধদেবের জীবনের একটা দিক লক্ষ করা যায়। কারণ তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে এই "সাড়া" উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। কাজেই তখন যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন - আছাড়িয়া - আচড়াইয়া, চিপতে - নিংড়োতে, ছেলে পিলেরা - ছোটরা, পানে - দিকে, বায়োস্কোপ - সিনেমা, ব্যাচেলর - অবিবাহিত, মাজায় - কোমরে, স্টেজ - রঙ্গমঞ্চ। এছাড়া এই উপন্যাসে কয়েকটি স্থান, ব্যক্তি এবং রাস্তার নাম পরিবর্তিত করেছেন, যেগুলি বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ নির্দেশে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসে বিভিন্ন ঘটনায় তার ব্যক্তিগত জীবনের শৈশব স্মৃতি অনেকটাই ছিল। বুদ্ধদেব বসু আমার ছেলেবেলা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন -

"আমার ছেলেবেলার কথা আগে অনেকবার লিখেছি। "সাড়া" উপন্যাসের প্রথম অংশে নোয়াখালির ঘটনা রয়েছে" - ৫

এছাড়া "সাড়া " উপন্যাসে সাগরের থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ছেলেবেলার বর্ণনা ও "ঘুম পাড়ানির গান" খন্ডের "শর"-এর যে দৃশ্য আছে তা বুদ্ধদেব বসুর ছেলেবেলার সঙ্গে তুলনীয়। বুদ্ধদেব বসুর "সাড়া" উপন্যাসের রচনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তা হলো ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধকুমার সান্যালের "দুয়ে আর দুয়ে চার" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বিবাহের চেয়ে বড়" আর "প্রাচীর ও প্রান্তর", এবং "এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে" - এই চারখানা সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এসেছিল। এই অশ্লীলতা বুদ্ধদেব বসুর ষড়যন্ত্রে কিনা সন্দেহ করা হয়েছিল। তাকে লাল বাজার থেকে ডাকা হয়েছিল, কারণ বুদ্ধদেব বসুর "সাড়া" উপন্যাসের সঙ্গে প্রবোধকুমার সান্যালের "দুয়ে আর দুয়ে চার" এর সাদৃশ্য দেখে সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে সন্দেহের সত্যতা সম্পর্কে ভুল প্রমাণিত হয়।

"রডোডেনড্রন গুচ্ছ" উপন্যাসটি ১৯৩২ সালে রচিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ঐ সালের নভেম্বর মাসে। এন.এম. রায়চৌধুরী এন্ড কোং। ক্রাউন সাইজ ৪ + ১৬৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ২ টাকা। এই উপন্যাসটি "প্রগতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"রডোডেনড্রন গুচ্ছ" উপন্যাসটি আটটি পরিচ্ছেদ-এ বিভক্ত। উপন্যাসের প্রথমে দেখি মৃণালিনীর আভিজাত্যপূর্ণ সংসার। অল্প বয়সে মৃণালিনীর স্বামী মারা গিয়েছিল। সে দুই কন্যাকে নিয়ে সংসার চালায়। তার দুই কন্যা নীলিমা ও শীলা। নীলিমার প্রিয় বান্ধবী সুমিত্রা। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন যে, সুমিত্রার সঙ্গে নীলিমার সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল। মৃণালিনী নিজের মেয়েদের স্বভাব চরিত্র ও মেজাজ-মর্জির কথা সুমিত্রাকে জানায়। উপন্যাসে মৃণালিনীর সন্ন্যাসীর প্রতি আসক্তি দেখা যায়। এখানে মৃণালিনীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখি, সে একজন বাস্তব জ্ঞানহীন আবেগপ্রবণ মহিলা। যার ফলে নিজের মেয়ের সামনে আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে সে তিরস্কৃত হয়।

উপন্যাসের প্রথমে দেখি মৃণালিনীর সংসারে নীলিমা ও শীলা উচ্চ শিক্ষিতা, সংস্কৃতজ্ঞ দুই মেয়ে। তাদের খ্যাতি, সম্মান, সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরো দেখি উপন্যাসের প্রথমেই কলেজ বান্ধবী সুমিত্রাকে নীলিমা বাড়িতে নিয়ে আসে। সুমিত্রার মা, বাবা নেই, সে দাদামশাই-এর কাছে মানুষ। শিক্ষা জীবন কোলকাতার বোর্ডিংএ এসে শুরু হয়। উচ্চশিক্ষার শেষে সে এই প্রথম কলেজের হোষ্টেল ছেড়ে নীলিমার বাড়িতে এসেছে। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সুমিত্রাকে নীলিমার বাড়িতেই দেখি।

উপন্যাসের মধ্যাংশে জানতে পারি সুমিত্রা একজন শিক্ষিকা। সাহিত্য রচনা তার প্রিয় বিষয়। সুমিত্রার প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। নীলিমার মাকে সে পিসিমা বলতো পিতামাতা হারা নীলিমা দাদামশায়ের কাছে প্রতিপালিত হয়। দাদামশাই এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল শুধু মানি অর্ডারের। নীলিমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল সুমিত্রা। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে আমরা নটরাজ নাগ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে পুরন্দর সেন, বীরেন চক্রবর্ত্তী, পঞ্চম পরিচ্ছেদে চন্দ্রিকা, ষষ্ঠ পরিচ্ছদে ধীরাজপ্রসন্ন মহলনবীশ প্রভৃতি চরিত্রগুলির দেখা পাই। উক্ত পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে নীলিমা, শীলা, সুমিত্রা ও চন্দিকা এই চারটি নারী চরিত্র সবসময় সাহিত্য আলোচনা, রাজনীতি,

গালগল্পের মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে দেখা যায়, এবং এর মধ্যে দিয়েই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু প্রচলিত উপন্যাসের লিখন ধারা থেকে এ উপন্যাসে যেন বেরিয়ে এসেছেন। চরিত্রগুলি একে অপরের সঙ্গে গল্প বলে। তাদের সাহিত্য সমীক্ষা, কাব্য লেখার প্রতি ঝোঁক আমরা উপন্যাসে লক্ষ করি। প্রতিটি চরিত্র স্বাধীন। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম ছিল গল্প বলা। "ভালোবাসি" শব্দটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুদ্ধদেব বসু একটি সাহিত্য আসরের যেন আয়োজন করেছেন।

নটরাজ নাগ উপন্যাসের একটি ভোগী চরিত্র। ভোগবিলাস ছিল তার একমাত্র অভিপ্রায়। আদর্শহীন, স্থির বুদ্ধিহীন, একটি উচ্ছৃঙ্খল মনের মানুষ ছিল সে। বাইরে সে ইংরেজ বিরোধী কিন্তু ভিতরে ছিল স্বদেশের প্রতি ঘৃণা। নিজে ইংরেজ সরকারের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সে এখন ডাক্তারী করে। সে ছিল নীলিমার সম্পর্কে মামা কিন্তু নীলিমা তার আচরণে বিরক্ত হয়ে ওঠে। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর নটরাজ নাগ সামাজিক প্রথায় কোন মেয়েকে স্ত্রী রূপে মেনে নিতে নারাজ। সুন্দরী অপরের স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়াই তার এখন লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বিধবা নারী চন্দিকাকে সে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করতে ব্যবহার করতো। ইংরেজদের চাকুরী ছেড়ে দিলেও তাদের আদর্শ, সংস্কৃতির প্রতি নটরাজ শ্রদ্ধাশীল ছিল। বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী মেয়েকে সে ঘৃণা করে।

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে পুরন্দর সেনের পরিচয় পাই। সে কবিতা লেখে। সে মনে প্রাণে নীলিমাকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসার আকর্ষণ তাকে নীলিমার বাড়িতে আসতে বাধ্য করেছিল। নীলিমার বাড়িতেই সুমিত্রার সঙ্গে তার পরিচয়। সুমিত্রা ও নীলিমার মাঝখানে পুরন্দরকে শ্যাওলার মতো ব্যক্তিত্বহীন বলে মনে হয়। নীলিমা ও পুরন্দরের গল্পের পটভূমিকায় ঢুকে নীলিমাকে সে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। ফলে পুরন্দরের প্রতি সুমিত্রার আকর্ষণও খানিকটা বেড়ে যায়। পুরন্দরের সঙ্গী বীরেন চক্রবর্ত্তী, ধীরাজ প্রসন্নকে নিয়ে নীলিমার বাড়িতে শুরু হয় সাহিত্য আড্ডা। এই আড্ডায় ধীরাজ চক্রবর্ত্তীর নির্দিষ্ট কোন মেয়ের প্রতি আসক্তি এই উপন্যাসে দেখা যায় না। সে কখনও শীলা, কখনও চন্দিকা, কখনও নীলিমার সঙ্গে গল্প করেছে। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু ইংরেজ রাজত্বকালে ইংরাজী কালচারে প্রতিপালিত নর-নারীর প্রেমঘটিত দিকটি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের শেষে চরিত্রগুলির মধ্যে কোন বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিল দেখা যায় না। তারা যেন গল্প বলার জন্যই কোন হোটেলে বা পার্কে মিলিত

হয়েছে। উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রের সাবলীলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। সুমিত্রা স্কুল শিক্ষিকা হয়েও তার মধ্যে লেখক অসমাঞ্জস্যভাবে যৌন সাড়ার উত্তেজনা উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

নীলিমা পুরন্দরকে ভালোবাসলেও সুমিত্রার আবির্ভাবে সে প্রেম কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, তার পরিণতি কি হল; তা উপন্যাসে দেখা যায় না। নীলিমার ছোট বোন শীলা চরিত্রের কোন ব্যক্তিত্ব উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি। ইংরেজ রাজত্বকালেও চরিত্রগুলি যেন সকলেই সুখী। তারা স্বাধীনভাবেই প্রেম বিনিময় করেছে। এই উপন্যাসে নির্দিষ্ট কোন নারী বা পুরুষ প্রেম নিবেদন করে নি। এছাড়া উপন্যাসে মৃণালিনী বিবাহিত নারী হলেও সংসারে কোন বাধা বা নিয়মনীতি তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। উপন্যাসে প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন যৌবন তরঙ্গে কোথায় ভেসে চলেছে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারী চরিত্রের রোমান্টিক আত্মভাবনায় চরিত্রগুলি বিভোর হয়ে চলাফেরা করছে।

"ধূসর গোধূলি" উপন্যাসটি ১৯৩৩ সালে রচিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঃ জি.সি.সোম। ক্রাউন সাইজ, ৪+২৫২ পৃষ্ঠা, দাম ২ টাকা। "প্রগতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৫৮। এই সংস্করণ উক্ত পাব্লিসার্স করেছিলেন। মূল্য - চার টাকা। ক্রাউন সাইজ, ৪ + ২১৪ পৃষ্ঠা।

"ধূসর গোধূলি" উপন্যাসটি দশটি ক্রমিক সংখ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক নীলকণ্ঠ। লেখক যেন এই নীলকণ্ঠের জবানীতে কথা বলেছেন। নিজের জীবনকে নিয়ে সে সবসময় পরিক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরাম নাই। সমগ্র উপন্যাসে যেন কেউ আড়াল থেকে কাহিনী ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এখানে লেখকের জবানীতে যেন নায়কের কথা পাই।

নীলকণ্ঠের কাকার মেয়ে অপর্ণা। অপর্ণার স্বামীর নাম কল্যাণকুমার। কল্যাণকুমারের একমাত্র বোন মায়া। অপর্ণার বাবা ব্রজমোহন উদার ও শিক্ষিত মানুষ। কল্যাণকুমারের বন্ধু হিসাবে বিনিয়েন্দ্র চরিত্রকে উপন্যাসে পাই।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে লেখক বুদ্ধদেব বসু যুবক নীলকণ্ঠের মনের ভাব উচ্ছ্বাস, ও পারিবারিক কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে বয়সে কিশোর। সে সদ্য কলেজে ঢুকেছে। সে সারাক্ষণ বই এর মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। সে শেক্সপীয়র, শেলী ও রবী-দ্রনাথের বই পড়তে ভালোবাসে। নীলকণ্ঠের কল্পনায় সবসময় এক স্ত্রী মূর্তি বেরিয়ে আসে, সে হল তার দিদি অপর্ণা। সে অপর্ণাকে পূজনীয় রূপে জ্ঞান করে। কিশোর বয়সে অপর্ণাদিকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা করে সে ধন্য হয়েছিল। উপন্যাসে আরো জানা যায় অপর্ণা নীলুদের বাড়ি থাকত। মেয়ের বিয়ে দেবার উপক্রম হলে তার বাবা অপর্ণাকে নীলুদের বাড়িতে রেখে যায়। নীলু সবসময় অপর্ণার সৌন্দর্য্যকে লক্ষ করত। তারপর নীলের বাবার প্রিয় ছাত্র কল্যাণকুমারের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হয়। কিন্তু তাদের এই বিয়ে বেশীদিন স্থায়ী থাকে নি। বিয়ের একমাসের মধ্যে কল্যাণকুমার এম.এ. পড়ার উদ্দেশ্যে বিদেশে চলে যায়। ঐ সময়ে অপর্ণার ভ্রূণ সন্তান নষ্ট হয়। এর তিন বছর পর কল্যাণকুমার ফিরে আসে। প্রতি মুহূর্তে কল্যাণকুমার অপর্ণাকে সন্দেহ করে। বিশেষ করে এই সন্দেহের তীর ছিল নীলের প্রতি। একদিন সে নীলকে বলেই বসে-"You have acad poetry, you are a poet. A poet. A uorshipper of goodesess. And I will kill you, I will kill you!" (বুঃবঃ রচনা সংগ্রহ- পৃঃ১০৭)। এই অবস্থায় তাদের সংসার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। কল্যাণকুমারের স্থান হয় রাঁচীর হাসপাতালে এবং অপর্ণা মারা যায়। মরার আগে অপর্ণা নীলকে বলে গিয়েছিল "আমি জানি আমাকে তুমি খুব ভালোবাসো আমি মরে যাবার পরও এমনি করে তুমি আমায় মনে রাখবে"। এরই মাঝে নীলের সঙ্গে কল্যাণকুমারের বোন মায়ার সম্পর্ক তৈরী হয়। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে নীল ছিল ভীরু ও দুর্বল। শেষে মায়ার অন্যত্র বিয়ের ঘটনা উপন্যাসে দেখা যায়। এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে নীলের চোখের অন্তরালে অপর্ণা দিদির ছবি ভেসে ওঠে।

"ধুসর গোধূলি" উপন্যাসে অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠের নির্মোহ দৃষ্টি ধরা পড়েছে। কিন্তু কিশোর প্রেমের অংশীদার হিসাবে সে নিজে যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে নি। নীরবে সে অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের নিবিড়তা লক্ষ করেছে। কল্যাণকুমার এই উপন্যাসের একটি দুরন্ত চরিত্র। তার ইচ্ছাশক্তি প্রবল। নিজেকে নূতন করে দেখবার প্রয়োজন মনে করে নি। নিজের জীবনকে সে অন্যভাবে গ্রহণ করেছিল। অপর্ণাকে ভালোবেসেছিল ঠিকই কিন্তু তার

আকর্ষণ শক্তি তেমন ছিল না। নিজেকে সবসময় অবিশ্বাস করতো, নিজের মতকে স্থির সুস্পষ্ট ধারণায় কখনও এগিয়ে দেয় নি। কিন্তু তার মনের উচ্ছলতা অপর্ণা চরিত্রে নূতন মাত্রা এনে দিয়েছিল। অপর্ণা ছিল কল্যাণকুমারের বিপরীত মতাদর্শের মেয়ে। এই বিপরীত ধর্মী মেয়ে অপর্ণা কিভাবে কল্যাণকুমারের দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিল তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা উপন্যাসে পাওয়া যায় না। নীলকণ্ঠ তাদের নিয়ে যেন প্রেমের ভাষ্য রচনা করে চলেছেন। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু নীলকণ্ঠের জবানীতে কথা বলেছেন। গভীর অনুভূতি ও মূল্যায়ন শক্তির মাধ্যমে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের বুদ্ধদেব যেন বড়ো করে তুলেছেন। লেখককে সবসময়ে কল্যাণকুমারের প্রেমকে নিয়ে দ্বিধান্বিত হতে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের ব্যক্তি চরিত্রের গভীরতা দেখিয়েছেন। দুরন্ত এই জটিল আবর্তে কল্যাণকুমার ও অপর্ণার প্রেমকে বিকশিত হতে এবং নীলকণ্ঠ চরিত্রটির মধ্যে কোন জীবন্ত প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

"ধূসর গোধূলি" উপন্যাসে কেবলমাত্র গভীর অনুভূতি ও মূল্যায়ন শক্তির মাধ্যমেই চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। ব্যক্তি চরিত্রের নৈঃসর্গের আকাশে কেবল মাত্র ভাষার যাদুস্পর্শে চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যিকতার ঝোঁক অনেক বেশী প্রবল। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের ভাষা থেকে আমরা জানতে পারি -

"অপর্ণা-দি, তুমি জলের মধ্যে জল, তুমি নদীর লাবণ্য; স্রোতের আনন্দ। আমার ভাবনার আকাশে ছবির পর ছবি ভেসে যায় - এই আমার এক জাগা রাত্রি, আমার অন্ধকার, আমার নির্জনতা আজ তোমাকে দিলাম, নাও হাত বাড়িয়ে নাও, একবার বলো যে ভুলে যাওনি।"- ৬

এই উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর প্রথম জীবনের রচনা হলেও এর মধ্যে চরিত্র ও গল্প রচনার মধ্যে নূতনত্ব এনেছিলেন। কারণ চরিত্রগুলি আদর্শ ও সততার সরণী বেয়ে উপন্যাসে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছিল, যা বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে এভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় না। এই উপন্যাসে অপার্থিব জ্ঞানের আত্মসুরভিত সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাই তা কল্পনাতীত। এইরূপ দেহস্থূলতাহীন ইঙ্গিত উপন্যাসে আলাদা মাত্রা এনেছে। উপন্যাসে বুদ্ধদেবের চরিত্র সৌন্দর্য্যের নিখুঁত পরিমিতিবোধ ও যথাযোগ্য বর্ণন কুশলতার দ্বারা আমাদের অনুভূতিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু এই অপূর্ব রূপ পরিকল্পনা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে শেষের দিকে প্রত্যক্ষ

সমর্থন লাভ করে নি। কল্পনা জগৎ থেকে কর্ম জগতে উত্তরণ ঘটাতে গিয়ে যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে। এছাড়া দাম্পত্য সম্পর্ক ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে ব্যবহারে এই উপন্যাসে নারীর গভীরতার পরিচয় পাই। চরিত্রগুলির মধ্যে স্পর্শভীরু ও রমণীয়তা বুদ্ধদেব বসুর কল্পনার সুদূর উদ্দেশ্যময় চিন্তাশক্তির প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাস্তব জগতে সংঘাতময় পরিবেশ অপেক্ষা অসহায় নিষ্ক্রিয়তাই অধিক ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। চরিত্র গুলির সুকুমার কল্পনার রঙ্গীন পাখা বিস্তৃত হতে যতটা দেখা যায় বাস্তবের রূঢ় মাটিতে তাদের ততটা সাবলীল হতে দেখা যায় না।

নীলকণ্ঠের জীবন সমীক্ষার যে পরিচয় উপন্যাসে পাই, তার সক্রিয়তা উপন্যাসে লক্ষ্য করার মত। নীলকণ্ঠ ও অপর্ণার মায়াময় সম্পর্কের যে প্রশস্তি রচনা হয়েছে, জীবনে তার কোন প্রতিফলন দেখি না। সে বরাবর অপর্ণাকে বালিকা বলে গেছে। অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের উন্মেষ বাস্তব বোধহীন, মনে কোন গভীর রেখাপাত করেছে বলে মনে হয় না। উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র মায়ার সঙ্গে তার সদ্য বিকশিত প্রণয় মোহ অন্ততঃ চারদিক হতে সক্রিয়ভাবে সাড়া ফেলেছে। এই কিশোর প্রেমের কোন বিশেষত্ব আমরা এই উপন্যাসে দেখি না। অপর্ণার অপার্থিব মোহময় প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিমগ্ন হওয়ার জন্য নায়ক কিশোরসুলভ সাধারণ আকর্ষণ তার মানস চেতনায় ফুটে উঠেছে। নীলকণ্ঠের এই ভাব উপন্যাসে যেভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাদের সাধারণ অনুভূতির কোন তীক্ষ্ণ গ্রহণশীলতা আমরা দেখি না। উপন্যাসে সে উপেক্ষিত, আত্মসম্মানহীন ছেলেমানুষ- এমনকি, ব্যর্থ প্রেমিক রূপে তার ব্যক্তিত্ব দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। ভূমিকায় উপন্যাসের বহু ঘটনার মধ্যে তার গভীর অনুভূতি ও মূল্যায়ন শক্তি ফুটে উঠেছে কিনা উপন্যাসে তার কোন সমাধান পাওয়া যায় না।

কল্যাণকুমার চরিত্রটি উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও সক্রিয় চরিত্র, কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর বিশিষ্টতাকে ও সজীবতাকে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রে প্রতিফলিত না করে হঠাৎ যেন ছেদ টেনেছেন। তবু বুদ্ধদেব বসুর প্রথম জীবনের উপন্যাসে যে চরিত্র ও আবহাওয়া পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

"অপর্ণার অপার্থিব ব্যঞ্জনাময়, আত্মসুরভিত সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাই তাহা কল্পনার দিক দিয়া বাস্তবিকেই অপূর্ব।" - ৭

"সানন্দা" উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে "পরিচয়" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক - ডি.এম. লাইব্রেরী, শ্রী গুরুদাশ চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। উৎসর্গ ঃ পরিমল মিত্রকে। দাম - ৪ টাকা।

"সানন্দা" উপন্যাসের পরিকল্পনার মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর চরিত্র পরিকল্পনার মৌলিকতা লক্ষ করা গেলেও উপন্যাসের সূত্রপাত থেকে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত ঘটনা বিন্যাসের খাম-খেয়ালিপনা লক্ষ করা যায়। কবি উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের জবানীতে বুদ্ধদেব বসু কথা বলেছেন। সানন্দার আচরণের মধ্যে চরিত্র পরিকল্পনা বিশেষ কোন বার্তা বহন করে আনে নি। আবার তার আচরণ এবং কথাবার্তার মধ্যে সংহতির অভাব লক্ষ করা যায়। দেহজ আকর্ষণ ও কামনার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ধরা পড়েছে। লেখক নিঝুম পরিবেশে সানন্দাকে নিয়ে অনুভব করেছেন -

"অন্ধকারের অসীম রহস্য, সানন্দা বলতে লাগল, গোপন কথার ভারে সমস্ত আকাশ যেন গম্ভীর হয়ে আছে। এক রুদ্ধ আবেগে তারাগুলো থর থর করে কাঁপছে। তোমার তাই মনে হয় না। সানন্দা মুখ ফেরাতেই আমার গালের সঙ্গে ওর মাথার ঘষা লেগে গেলো।" - ৮

এই উপন্যাসের মধ্যে বাছাই সংলাপে কল্লোলীয় চেতনার আভাস দেখা যায়। এই উপন্যাসে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক সত্যকে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর ঐ ভাবনা পুরোপুরি পাওয়া না গেলেও উপন্যাসে যা পাওয়া গেল তার মূল্যও কম নয়। সানন্দা উপন্যাসের মধ্যে সমাজ এবং সময়ের ছবি কোন ভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ব্যক্তি চরিত্র হিসাবে সানন্দা দুর্বল রক্তহীন, সম্পর্কহীনতায় কোন ভাবেই দাঁড়াতে পারে নি।

"একদা তুমি প্রিয়ে" উপন্যাসটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রচিত হয় এবং ঐ বছরের মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রাউন সাইজ, ২+১৪৫ পৃষ্ঠা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট, কোলকাতা-৯।

এই উপন্যাসটি সংস্করণে অনেক পরিমার্জনা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উপন্যাসটির এই পরিমার্জনার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশই বাদ গিয়েছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলেছেন। এই উপন্যাসে জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে কাব্যানুপ্রেরিত বলে মনে হয়। এই উপন্যাসের কাহিনীকে বুদ্ধদেব বসু সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদ আটটি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সাতটি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ চারটি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ তিনটি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দুইটি, ষষ্ট পরিচ্ছেদ তিনটি ও সপ্তম পরিচ্ছেদ চারটি ক্রমিক সংখ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে। এই উপন্যাসে পলাশের পরিবারকে দেখা যায়। পলাশ উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র। তার বাবা ও দাদা বড় চাকুরি করে, বোন লাবণ্য মেয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল। এই অভিজাত পারিবারিক বলয়ের মধ্যে পলাশ বড় হয়েছিল। পলাশ নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন। তার এই আলস্যময় জীবন সম্পর্কে বাড়ির সকলেই চিন্তিত ছিল। সে বিলাসিতার মধ্যে দিয়েই জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। তার বান্ধবী রেবা ঘোষ। সে বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষিকা। কলেজ জীবনে তারা পরস্পরকে ভালোবাসত। তাদের এই ভালোবাসার বয়স প্রায় তিন বৎসর, কিন্তু কোন অজানা কারণে তাদের এই ভালোবাসায় ছেদ পড়েছিল। এই বিচ্ছেদের বয়সও প্রায় দুই বৎসর। কোনরকম প্রতিবাদ বা অশালীন কাজকর্মের জন্য তাদের এই সম্পর্কে ছেদ পড়েনি বলে লেখক জানিয়েছেন। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর পরে পলাশ মনের টানে রেবার কাছে রেলগাড়িতে চেপে দেখা করতে চলেছে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য পলাশকে পূর্বের স্মৃতি কিছুটা মনে করিয়ে দেয়। পলাশ ভাবে - রেবাকে সে একদিন ভালোবেসেছিল, এখন তাকে কেমন করে শুভেচ্ছা জানাবে - এ নিয়ে সে চিন্তিত। পলাশ রেবার সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছিল। সে সিদ্ধান্ত নিল সে যে করেই হোক রেবার কাছে তার করুণ হৃদয়ের কথা বুঝিয়ে বলবে। কিন্তু রেবা এখন আর পলাশকে ভালোবাসে না। এইভাবে পলাশ নিজেকে সহজ করে রেবার বাড়িতে কিছুদিন কাটাল। এখানে বুদ্ধদেব বসু আরেকটি চরিত্রকে এনে পলাশের প্রেমকে বিভাজন করেছিলেন। পলাশের প্রেম যেন কোন মোহনা দিয়ে আরেকটি সাগরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। এ প্রেমের মোহনারূপী মেয়েটির নাম প্রতিমা। প্রতিমা, রেবার পুরোনো ছাত্রী। তার অত্যন্ত কৈশোর বয়স। তার মন কৌতূহলী চঞ্চলা পাখির ন্যায় উন্মিলিত। প্রতিমা যেন চৈত্রের শুকনো পাতার মতো এলোমেলো। সে প্রতিদিন রেবার কাছে গোলাপ ফুল নিয়ে আসত। সে রেবাকে খুব শ্রদ্ধা করে এবং তার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসে। রেবাও প্রতিমাকে স্নেহ করে। নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে রেবার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটা বান্ধবীর মতো।

প্রতিমা, রেবার সঙ্গে পলাশের বিষাদঘন প্রেমের ব্যাপারটি অনুধাবন করে। রেবার অজান্তে প্রতিমা ও পলাশের সম্পর্কটি গভীরতর হয়। প্রতিমা ফুলের তোড়া দিয়ে পলাশকে শুভেচ্ছা জানায়। প্রতিমা লজ্জার আড়াল থেকে যেন পলাশকে প্রেম নিবেদন করে। এমনি করে প্রতিমার সংস্পর্শে পলাশ তার মনের অন্তরালে একটি নূতন জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। প্রতিমার বলা বিভিন্ন কথা তার মনে প্রেমের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কিন্তু এখানেও পলাশের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কাজ করেছিল। রেবা এবং প্রতিমা তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। প্রতিমা ঠিক বুঝতে পেরেছিল পলাশের মনের ছবি। এখানে রেবার মানসিক অবস্থার বিবরণ লেখক তুলে ধরেন নি। লেখক প্রতিমার মধ্যে রেবার স্নেহের স্মৃতি এনে উপন্যাসের হঠাৎ সমাপ্তি টেনেছেন। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় পলাশ এই পরিস্থিতিতে সব মোহ, বাধা অতিক্রম করে দুজনকেই রেখে নিজগৃহে ফিরে যায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে "অন্য কোন পুরুষ কি করত - এই অবস্থায়"? তবু যেতে যেতে পলাশের মনে হয় "গোলাপের তোড়াটা কেন ছুটে চলেছে তার জামা কাপড়ের বাক্সের মধ্যে ? তা নিয়ে সে কি করবে ?" (পৃঃ-২০৪)। এই উপন্যাসে পলাশ চরিত্রের কোন আলাদা ব্যক্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না। উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিণতি বিরহের মধ্যেই থেকে গেছে। রেবার মধ্যে প্রেমের গভীরতা লক্ষ করা যায় না। প্রতিমা চরিত্রটি এই উপন্যাসে আলাদা কোন তাৎপর্য এনেছিল বলে মনে হয় না। দুটি নারী চরিত্রের মাঝে লেখক পলাশ চরিত্রটির অসহায়তার দিকগুলি যেন তুলে ধরেছেন।

"অসূর্য্যস্পশ্যা" উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, মুদ্রণ, প্রিন্ট ও গ্রাফ, ৯ সি, ভবানী দত্ত লেন, কোলকাতা-৭৩।

"অসূর্য্যস্পশ্যা" উপন্যাসে কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসাবে সরমাকে পাই। সরমার জীবনের ঘাত প্রতিঘাত উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন। দার্জিলিং এর কুয়াশা ঘেরা প্রকৃতির মধ্যে সরমার প্রেমের রূপ লেখক অঙ্কন করেছেন। লেখক নির্জনতা ও নীরবতার মধ্যে দিয়ে সরমার চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন। একমাত্র প্রকৃতি তার চারিত্রিক বিকাশে যেন সাহায্য করেছে। অন্ধকার নির্জন পর্বতঘেরা যে মন্দির দার্জিলিং এ লেখক দেখেছিলেন সেই পেক্ষাপটকেই তিনি সরমার জীবনে স্থায়ী রূপ দিলেন। সরমার জীবনে যে নূতন বাঁক নিয়েছিল তা অনেকটা রহস্যময়ভাবে লেখক অঙ্কন

করেছেন। তার প্রেমের ভয়াবহ রূপ এখানে প্রকাশিত হয় না। উপন্যাসে বাস্তবতা চরিত্রের সঙ্গে ততটা সম্পর্ক রাখেনি। একটা সাংকেতিকতার গীতিকাব্যচিত অনুভূতির পরিচয় লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। পর্বত বেষ্টিত প্রকৃতি আত্মসচেতন ভাবে প্রেমের পূর্ব স্মৃতি যেন বহন করে চলেছে। প্রেমের দুরন্ত উত্তাপের পরিবর্তে একটা শীতল ও নীরব অনুভূতিতে সরমা চরিত্রের অর্ন্তদ্বন্দ্বের বিভিন্ন রূপ লেখক তুলে ধরেছেন। এছাড়া উপন্যাসে কৈশোরের স্বতস্ফূর্ত লীলাময়তার চঞ্চল রূপ কিছুটা দেখা যায়।

"সূর্য্যমুখী" উপন্যাসটির রচনা কাল ১৯৩৪ সাল। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের মে মাসে। ক্রাউন সাইজ ৮+১৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য - দেড়টাকা। প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক - শ্রীগুরু লাইব্রেরীর পক্ষে প্রভাস চন্দ্র মজুমদার।

উপন্যাসটি ১২টি খন্ডে বিভক্ত। উপন্যাসের প্রথমেই দেখি হৈমন্তীর পরিবার। হৈমন্তী বিধবা, বয়স আটত্রিশ। হৈমন্তীর ছেলে মিহির। মিহির বিবাহিত। তার বিয়ে দিয়েই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। মিহির ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মিহির তার সাহিত্যিক বন্ধুদের সকলকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল। বন্ধুদের সাহিত্য লেখায় মিহির ছিল তাদের প্রেরণাদাতা। বাংলা কবিতাকে মিহির নূতন রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সে গরীব ও বড় লেখক বলে ভাবতে শেখে নি। সে ছিল আবেগপ্রবণ। তার ভাবনা ও মূল্যবোধ তার কাছে চূড়ান্ত সত্য। বিধবা মায়ের স্নেহ ধারায় সে পল্লবিত হয়েছিল। মাকে ঘিরেই তার জীবন। মিহিরের আরামের জীবন, খাওয়া থেকে পোষাক এমন কিছুতেই তার অভাব নেই যাতে সে অশান্তি ভোগ করে। এই সুখ পিয়াসী মিহিরের বিয়ে হলো গরীব ঘরের মেয়ে মৃণালের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকে দাম্পত্য জীবনে সে মধুরতা আনতে পারে নি। তার ও মৃণালের মধ্যে তর্ক চলতো দিন-রাত। মিহিরের মা গোপনে তাদের মেলামেশার ঘাটতি অনুভব করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয় নি।

এই উপন্যাসে মিহিরের দাম্পত্য জীবনের জটিল মনোস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই। তার স্ত্রীর নাম মৃণাল। হৈমন্তীর ইচ্ছাতেই মৃণালের সঙ্গে মিহিরের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরও সাংসারিক জীবনের ভার হৈমন্তী সব সময় নিজের কাঁধে বহন করেছিল। কখনও ছেলেকে সংসারের হিসাবের মধ্যে সে রাখে নি। ছেলের সাহিত্য রচনায় যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্য আহার থেকে সমস্ত কিছুতে হৈমন্তী স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ

যোগান দিত। কিন্তু একদিন হৈমন্তী বয়সের ভারে ছেলেকে সাংসারিক হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মিহিরের মধ্যে তার সাহিত্য জগৎ থেকে সাংসারিক হবার অভিপ্রায় দেখা যায় না। কারণ হৈমন্তী একদিন নিজের পছন্দ করা পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। মিহির মার কথা ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃণালের সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে হৈমন্তী ছেলে ও পুত্রবধূকে বিভিন্ন উপদেশের ত্রুটি রাখে নি। কিন্তু তার এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ স্ত্রীর প্রতি ছেলের ব্যবহার লক্ষ করে হৈমন্তীকে একদিন ভাবতে হয়, বুঝি সে ভুল করেছিল। পুত্রবধূর মধ্যে সে কোন দোষ পায় নি। এখানে বুদ্ধদেব বসু মিহিরকে শুধু সাহিত্যিক জীবনের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মিহিরের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না। সে একজন সাহিত্যিক, কবি ও আর্টিষ্ট হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই গৌরব ও পদমর্যাদা, ভাবনা ও তার মূল্যবোধ- এ সব কিছুই তার সংসার জীবনে কোন কাজে লাগে নি। মিহির সবসময় ভাবতো সংসারের সময় নষ্ট করার চাইতে সাহিত্যের কয়েকটি লাইন লিখে ফেলতে পারলে সেটাই তার পরম ঐশ্বর্য্য। মিহির পরিপূর্ণ আত্মভোলা, উদাসীন ধরনের মানুষ। সে নিজের জীবন নিয়ে একা থাকতে ভালোবাসত। সে ছিল আরামের মানুষ, আর এর জন্য দায়ী ছিল তার মায়ের স্নেহ। স্ত্রী ছিল মিহিরের জীবনের চরম অনীহা, তার জীবনে স্ত্রীর প্রবেশ একেবারে অবান্তর, নিছক বাহুল্যও বটে। উত্তাপহীন ও আনন্দহীন হয়ে বিয়ে করলেও স্ত্রীর সঙ্গে সে কোনরকম সম্পর্ক তৈরী করে নি। স্ত্রীর প্রতি তার প্রতিক্রিয়া যেন খানিকটা শারীরিক বিকর্ষণ গোছের। যদিও স্ত্রী লোকের প্রতি প্রত্যেক কবি যতটা দুর্বল থাকে, মিহির সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, স্ত্রীর প্রতি তার ছিল অনতিক্রম বিমুখতা ও উদাসীনতা। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মিহিরকে তার আত্মার কোনখানেই স্থান দেয় নি। ফলে মিহির ও মৃণালের দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাদের জৈবিক সংস্পর্শ ছিল না এ কথা বলা যায় না। কারণ উপন্যাসের শেষে মৃণাল পেয়েছিল মাতৃত্ব। এটুকুই ছিল নারী হিসাবে মৃণালের সান্ত্বনা। এছাড়া প্রতি মুহূর্তে মিহিরের কাছ থেকে মৃণাল শুধু পেয়েছিল নিষ্ঠুরতা। কিন্তু মিহিরকে সারা জীবন স্ত্রীর সঙ্গ লাভ করতে হয় নি। অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তাই মৃণালের জীবন ছিল কানায় কানায় ভরা দীঘির কালো জলের মতো এবং মিহির ছিল তার কাছে দীঘির কালো জলে ছায়া মাত্র। মৃণাল তাকে কল্পনায় ধরতে চাইলেও বাস্তবে সে ছিল অনেক দূরে। সত্যিকারের ভালোবাসা সে কখনও তার স্বামীর কাছে পায় নি। আর এর জন্য তার স্বামীর কাছে সে কখনও নালিশ জানায় নি। যেমনটা তার স্বামী চেয়েছে সেভাবেই মৃণাল

নির্লিপ্ততার জগতে বাস করেছে। সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকত। তার মধ্যে কখনও প্রতিবাদের সুর উঠতে দেখা যায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃণাল যখন সন্তান সম্ভবা হবার মুহূর্ত সে সময় সে আস্তে আস্তে নিজেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এক সন্তান জন্ম দিয়ে সে প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু মরার আগে একবার তার স্বামীকে একটি কথাই বলেছিল - "কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে ? তুমি কি কখনও আমাকে এতটুকু ভালোবাসতে পারবে না ?" মিহির এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে নি। এই উপন্যাসে আরেকটি গৌণ চরিত্র তাপসীকে এনে মিহিরের দেহ কামনার উচ্ছ্বাসকে লেখক তুলে ধরেছেন। তাপসী ছিল একটি পত্রিকার সম্পাদক। কবিতা ছাপানোর মধ্যে দিয়ে তাদের দেহ কামনার দিকটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। কিন্তু যখনই তাপসী তার স্ত্রীর এই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কথা শুনেছিল তখন সে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মিহিরের এই উদাসীন জীবনকে ফিরিয়ে আনতে তাপসী তাকে আপন করে নিয়েছিল।

"পরস্পর" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৩২-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। অক্টোবর, ১৯৩৪ সনে ডি.এম লাইব্রেরী দ্বারা এই উপন্যাসটি প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই বইটির পরে আর কোন সংস্করণ হয় নি। উপন্যাসের শেষের পরিচ্ছেদ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। বাকী অনুচ্ছেদগুলি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। বই এর প্রচ্ছদ সজ্জা শ্রী অনিল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের করা।

"পরস্পর" উপন্যাসটি ৮ টি পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক অশান্ত রাত্রির অন্ধকারে, নিজস্ব জগতে বসে ছিল। নায়ক এবং নায়িকা ভাবনার জালে পরস্পর জড়িয়ে পড়েছিল। দুটো ঘরে দুটো প্রাণ যেন আলাদা ভাবে ভাবতে গিয়ে অন্য জগতে চলে যায়। এই ভাবনার পরিচয় পাই -

"- যে ভাবনা ব্যক্তি ভাবনার বাইরে কিছুতেই যেতে পারলো না। তারপর আর কিছুই রইল না, কোন আকাশ, কোন পৃথিবী, কোন অনুভূতি কিছুই রইল না। শুধু চিরন্তন রাত্রি আর রক্তের সমুদ্রের নিঃসীম অন্ধকার।" - ৯

বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসে সাহিত্য-ভাবনার দিকটাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে ইনটেলেকটের চাইতে ইনট্যুইশন বেশী

দেখাতে চেয়েছেন। আধুনিক জীবনের জটিল পট পরিবেশ, সমকালীন কল্লোলীয় সাহিত্য বিতর্ক থেকে তার উপন্যাসে এসেছে আলাদা বিশ্লেষণী শক্তি। এই মানসিকতা ইংরাজী উপন্যাস থেকে এসেছিল বলা যেতে পারে। লেখক যেন নিজের ভাবুকী স্বভাবের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সব চরিত্রকে অর্ন্তমুখী করে তুলেছিলেন।

এই উপন্যাসে বাসন্তীর পরিবারের ঘটনা বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছেন। বাসন্তীর এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার। ছেলের নাম অশান্ত ও মেয়ের নাম মালতী। এ ছাড়া এই উপন্যাসে অশান্তের বন্ধু বিমল, লতা ও রাণীকে দেখা যায়। অশান্তের ডাক নাম শান্ত। বুদ্ধদেব বসু এই শান্ত চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের মূল থীমকে দাঁড় করিয়েছেন। শান্ত ভীরু, দুর্বল ও প্রতিবাদহীন স্বভাবের ছেলে। সকলকেই সে ভালোবাসতে চায়। কিন্তু গভীরতর সম্পর্ক স্থাপনে সে রাজী নয়। শান্তের ছোট বোনের নাম মালতী। ছোট থেকে সে মায়ের সান্নিধ্যে থেকেছে। মালতী শান্তের থেকে দেড় বছরের ছোট। মালতী ও শান্ত দুজনেই বাবার ভালোবাসা কখনও পায় নি। বাবাকে তারা ভয় ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতো - সাধারণতঃ কখনো তার কাছে যেত না। লেখকের দৃষ্টিতে তাদের বাবা নিরীহ গোছের বনমানুষ বলে মনে হয়েছিল।

বাল্যকাল থেকেই শান্ত অবসর সময়ে কবিতা পড়তে ভালোবাসত। এছাড়া সাহিত্য সমালোচনা তার কাছে বেশ পছন্দের ছিল। এই কিশোর বয়সে শান্ত কাগজের অফিসে কাজ নিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে একটি পত্রিকার সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। শান্ত মালতীর চেয়ে দেড় বছরের ছোট হলেও মালতীর বিয়ের দায়িত্ব তার কাঁধেই পড়েছিল। শান্তর অফিসের এক অডিটর বন্ধু বিমলকে পাত্র হিসাবে তার বোনের জন্য পছন্দ করে। এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শান্তর নিজের জীবনে প্রেম তেমন করে আসে নি। তবু তার জীবনে দুজন মেয়ের অবস্থান ছিল। একজন লতা এবং অপর জন রাণী। লতাকে শান্ত চোখে দেখে ভালোবেসেছিল, লতাও শান্তকে গভীরভাবে অনুভব করত। এদিকে কলেজের বন্ধু বিকাশের দৌলতে সে লতার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। কিন্তু চাক্ষুষ দর্শনের পর লতার প্রতি তার আকর্ষণ আর তেমন দেখা যায় না। তবু সময় কাটানোর জন্য লতার অনুরোধেই সে মেলামেশা করত। উপন্যাসের পঞ্চম খণ্ডে লতাকেও তেমনভাবে শান্তের প্রতি আর আকর্ষিত হতে দেখা যায় না। লতা মনে করে শান্তর সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক, তা সাময়িক। যতদিন না শান্তর প্রতি আকর্ষণ ক্লান্ত হয়ে আসে ততদিন একটা হালকাভাবে

অবসর বিনোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ডে শান্তর জীবনে লতাকে কবিতার প্রতিমূর্তি রূপে আমরা দেখতে পাই। তাই সে লতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। এর পরই শান্তের জীবনে রাণী নামে একটি মেয়ের প্রবেশ ঘটে। রাণী ছিল শান্তর মা বাসন্তীর বান্ধবীর মেয়ে। রাণী একজন স্কুল শিক্ষিকা। রাণীকে দেখে শান্ত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এতদিন লতার উদ্দেশ্যে শান্তর মনে হত - "সময় টা কেটে যেতে দিই !" কিন্তু রাণী তার জীবনে আসার পর মাঝে মাঝে রাণীর অনুপস্থিতিতে শান্ত বুঝতে পারল - "ভালোবাসা জিনিসটা কি ?" এই অসীম শূন্যতার মাঝে মুহূর্তের জন্য একটি নূতন চেতনা ফিরিয়ে এনেছিল রাণী। উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা দেখি রাণী শান্তের বাড়িতেই থেকে যায়।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই শান্ত ও মালতী দুজনেরই ছিল প্রেমের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব কিন্তু তারা পরস্পর সঙ্গী ও সঙ্গিনী পাওয়ার পর তাদের এই মনের ভাবনা আস্তে আস্তে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্ককে তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শেখে।

বুদ্ধদেব বসু "অনেকরকম" উপন্যাসটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক দেবসাহিত্য-কুটীর (২১/১) বরানগর লেন, কোলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঐ একই। এই সংস্করণে উপন্যাসটি পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত হয়ে "ক্ষণিকের বন্ধু" নামে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিকে একটি নাট্যোপন্যাসও বলা যায়। উপন্যাসটি "পরিচয়" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

"অনেক রকম" উপন্যাসটি ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত। বালিগঞ্জের একটি ছেলে ও মেয়ের কথোপকথন দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। এরা ভাই-বোন। ভাই এর নাম মুকুল ও বোনের নাম বুবুন। উপন্যাসে আরো তিনটি পুরুষ চরিত্র আছে - পূর্ণেন্দু, কিঙ্করী, কিউকন রায় (কিকির), অকরুণবাবু, অনুরূপবাবু। নারী চরিত্র হিসাবে পাই লতা, অরুণা ও আয়নাকে। আয়নাকে ভালোবাসে মুকুল। এই ভালোবাসা প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। ভালোবাসা গড়ার কাজে মুকুল, বকুল লতাকে পরস্পরকে সাহায্য করেছিল। আয়না, মুকুলের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ভালোবাসার প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান এই নিয়ে উপন্যাসে যেন একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করে। কোন চরিত্রের মধ্যেই

ভালোবাসার নিবিড়তা লক্ষ করা যায় না। তারা যেন একটি সাহিত্যের আসরে মিলিত হয়ে বিভিন্ন চরিত্রের প্রেম সম্পর্কের ধারণায় বক্তব্য রেখেছে মাত্র। তাদের মিলনের দৃশ্য উপন্যাসে নেই। ক্ষণিকের বন্ধুত্বের পরিচয়ে তারা যেন উপন্যাসে এসেছিল। উপন্যাসে বুদ্ধদেব কোন চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেখান নি। বুদ্ধদেব বসু একটি সজীব চরিত্র পূর্ণেন্দুর মধ্যে দিয়ে আদর্শবাদের কিছু কথা বলতে চেয়েছেন। পুর্ণেন্দু পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক অধ্যাপক। আবার আয়না চরিত্রে লেখক ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছেন। সে নিজের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবন কাটিয়েছে। ভালোবাসার পর্যায়ক্রমিক স্থিরতা ও কৌতূহল এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বর্জন করেছেন। এই উপন্যাসে একটা অসার্থক প্রেমের গল্প বলা জবানীতে বহু চরিত্র নিজের মতামত প্রকাশ করছে মাত্র। উপন্যাসে কোন গতি লক্ষ করা যায় না। ঘটনার কোন ক্রমবিকাশ উপন্যাসে নেই।

খ) দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেমের উপন্যাস ঃ

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের একটি প্রিয় বিষয় ছিল দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেম। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই থীমটিকে তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। "লাল মেঘ", "কালো হাওয়া", "রূপালি পাখি" এই উপন্যাসগুলিতে আমরা এই থীমকে বাস্তবায়িত হতে দেখি। এই বিষয় পর্বের উপন্যাসে প্রেমের দেহজ কামনায় চরিত্রগুলি আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তবে এই দাম্পত্য জীবন উপন্যাসে দেহ সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয় নি। দেহকে ঘিরে উপন্যাসের নরনারীরা ভুলে গেছে যে তারা বিবাহিত। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে অনুশাসনহীন দাম্পত্য জীবনে নরনারীরা বাস করছে। বুদ্ধদেব এই সমাজে নিরপেক্ষভাবে নর নারীর চরিত্রে বিভিন্ন প্রেমের প্রসঙ্গ এনেছেন, যা নাগরিক জীবনের পক্ষে ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"লালমেঘ" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। "পরিচয়" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। ক্রাউন সাইজ, পৃ ঃ- ৬ + ২৫০, পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।

এক বছরে বুদ্ধদেব বসুর যে পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, "লালমেঘ" তাঁরই মধ্যে একটি। লালমেঘ উপন্যাসটিকে লেখক পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে, পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন।এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অবিনাশ রায় ও তাঁর স্ত্রী শোভনা রায়।

এই দুটি চরিত্রের মাঝখানে তৃতীয় চরিত্র হিসাবে সন্ধ্যামণিকে দেখি। অবিনাশ ও শোভনা রায়ের এক দাম্পত্য জীবনের বিবরণ লেখক উপন্যাসের প্রথমে তুলে ধরেছেন। তারা অর্থপূর্ণ অভিজাত পরিবারের মানুষ, কিন্তু তাদের পরিবারে সুখ ছিল না। এই পরিবারের বিবরণ দেবার আগে তাদের সম্পর্কের দিকটা জেনে নেওয়া দরকার। উপন্যাসের প্রথমে আমরা অবিনাশকে রুচিশীল ভদ্রলোক হিসাবে দেখি। শোভনা রায় বিখ্যাত তারিণীচরণ ঘোষের তৃতীয় কন্যা। অবিনাশ ও শোভনা বিয়ের দেড় বছর দিনাজপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকার পর রোগাক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে শোভনা রোগে ভুগতে থাকে। তাকে দেখাশুনার ভার কাজের মেয়ে সন্ধ্যামণির উপর পড়ে। শোভনার এই দীর্ঘ অসুস্থতার সুযোগে সন্ধ্যামণি তার সেবা যত্নের দ্বারা পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। শোভনা তার প্রতি একটি মমত্ববোধ জন্মে ছিল, কারণ শোভনাকে দেখার ভার সন্ধ্যামণীর উপর ছিল।

অবিনাশ শোভনার প্রতি প্রথম দিকে খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। স্ত্রীর দুঃখে সে কাতর, অফিসে যাবার পূর্ব মুহূর্তে শোভনার মুখদর্শন করে সে বাইরে যেত। শোভনার ব্যথায় সে ব্যথিত। কিন্তু এখন সে সন্ধ্যামণির দিকে ঝুঁকে পড়ে। শোভনার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যামণি অবিনাশকে সেবা করে। অবিনাশ জৈবিক দেহ চেতনায় সন্ধ্যামণির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সন্ধ্যামণি অবিনাশের থেকে দূরে থাকতে চায়, কিন্তু দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য অনেক সময় তাদের পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যামণিকে অবিনাশ আরো কাছে পেতে চায়। অবিনাশের অচেতন মন সন্ধ্যামণিকে নিয়ে বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু শোভনা রায়ের উপস্থিতি তাকে সেই কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

শোভনা তার স্বামীর ব্যথা বেদনার কথা বোঝে, কিন্তু তার পঙ্গু শরীর নিয়ে স্বামীর প্রতি যত্নশীল হতে পারে না। অবিনাশ ও সন্ধ্যামণিকে নিয়ে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা শোভনা উপলব্ধি করে, কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না।

উপন্যাসের শেষের দিকে সন্ধ্যামণি ও অবিনাশের সম্পর্কটা অনেক কাছাকাছি এসেছে। দেহ বিনিময় থেকে শুরু করে বিবাহের একটি পূর্ব পরিকল্পনা অবিনাশ ও সন্ধ্যামণি রচনা করে। এখন সন্ধ্যামণি অবিনাশের স্ত্রী রূপে পরিবারের কাজকর্ম

দেখাশুনা করে। সন্ধ্যামণিকে এখন শোভনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে একজন নার্সকে তার সেবা যত্নের ভার দিয়েছে।

শোভনা আজ বড় অসহায়, নিজের চোখের সামনে অবিনাশের চোখ ফিরিয়ে নেওয়া সে সহ্য করতে পারে না। সমগ্র উপন্যাসে এই মুহূর্তটা তৈরীর জন্যই যেন লেখক উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন।. লেখক এই ঘটনা দিয়ে এখানেই উপন্যাসের শেষ করেছেন। শোভনা মারা গেল, না বেঁচে রইল তার কোন তথ্য উপন্যাসে পাওয়া যায় না। তবে শোভনার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা তাদের দাম্পত্য জীবনে সন্ধ্যামণিকে এনেছিল।

এই উপন্যাসে বেশি সংখ্যক চরিত্রের সমাবেশ খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। অবিনাশ, শোভনা ও সন্ধ্যামণি এই তিনটি চরিত্রকে নিয়েই কাহিনী রচিত হয়েছে।

বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসের মতো আত্মস্মৃতির পরিচয় এই উপন্যাসে নেই। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। এই উপন্যাসে অবিনাশ সন্ধ্যামণিকে পেয়ে সুখী হতে পারে নি। না পাওয়ার দ্বন্দ্ব তাকে প্রতি মুহূর্তে ব্যথা দিয়েছে। সে নিজেকে সংসার জীবনে একান্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায় ভাবতে শুরু করেছিল। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"নিজেকে নিজের বাহিরে ছড়িয়ে দিতে পারে নি। আর তাই অন্যের সংস্পর্শে একটু অস্বস্তি ভাব তার কাটেনি এখনও। সে সংস্পর্শ যে কামনা করে তা থেকেও হঠাৎ কেমন সরে আসতে চায়। একা একা তার অদ্ভুত রকমের ভালো লাগা নিজের সঙ্গে দীর্ঘ, দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন আলাপের খানিকটা মস্তিষ্কপ্রসূত আনন্দ।" - ১০

"রূপালী পাখি" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে । প্রকাশক শ্রী সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিসার্স, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭০০০০৯।

লেখক আটটি পর্বে উপন্যাসটিকে ভাগ করে কাহিনী ধারাকে বিস্তৃত করেছেন। প্রতিটি পর্ব আবার ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা তিনটি।

উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসাবে কপিল চরিত্রকে পাই। কপিল লাজুক প্রকৃতির, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে সে বড়ই লাজুক। ভালোবাসা কপিলের কাছে ঈশ্বরের আশীবাদের মতো। কপিলের জীবন তপস্বীর জীবন। উপন্যাসের প্রথমেই দেখি, কপিল বসন্তের এক সকালে ঘুম থেকে উঠেছে। নানা চিন্তা ও চেতনা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে সে নিঃসঙ্গতায় কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না।

কপিল মিনিকে ভালোবাসে। মিনির ভালোবাসার মধ্যে কপিলের মানসিক স্তরের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই ভালোবাসা প্রথম দিকে কপিলের মনে কিছু আনন্দ ও উপভোগের বস্তু হিসেবে দেখা দিয়েছে। ক্রমে সেই অনুভূতি আরো গভীর হয়েছে। মাঝে মাঝে মিনির উষ্ণ হাতের স্পর্শ তাকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। তার স্পর্শে মনে জাগে সুখের অনুভূতি। এই অনুভূতি কপিলের জীবনে এনেছিল নূতন জীবনে প্রবেশের মন্ত্র। কপিলের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বাসবকে উপন্যাসের প্রথম থেকেই পাই। নিঃসঙ্গতাময় তপস্বীর জীবন থেকে বাইরের আলো পেতে কপিল বাসবের বাড়ীতে যায়। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কের মত এই উপন্যাসেও বাসবকে সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সুলেখক হিসাবে দেখতে পাই। বাসবের স্ত্রী ছিল মৈত্রেয়ী দেবী। সে সাহিত্যের একজন সচেতন পাঠক। মৈত্রেয়ী দেবী বাসবকে সাহিত্য লেখায় উৎসাহ প্রদান করে। সাহিত্য জগতে বাসব প্রতিষ্ঠিত হোক, মৈত্রেয়ী দেবী এই কামনা করে। মৈত্রেয়ী দেবীর বান্ধবী ইলার সঙ্গে একটি সাহিত্যের আসরে কপিলের পরিচয় হয়। এখন কোন অজানা কারণে বাসব ঘুরে বেড়ায়। কোন ধূসর ভাবনা বাস্তব পৃথিবী থেকে কোন কল্পনার জগতে তাকে নিয়ে যায়।

উপন্যাসে বাসব একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। বাসব গল্প লেখে। লিখনের মান যাই হোক না কেন, সে সম্পর্কে তার কোন খেয়াল নেই। লিখতে হলেই ভাবতে হয়, এই ধারণা বাসবের মনে বদ্ধমূল। এবার উপন্যাসের মধ্য অংশে কপিল ও মিনির সম্পর্কের গাঢ়তম রূপটি দেখতে পাই। উপন্যাসের পঞ্চম অংশ থেকে উপন্যাসের গতি অন্য দিকে মোড় নেয়। 'ঝমর' নামে এক সাঁওতাল মেয়ে কপিলের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। ঝমরের আচার আচরণ, জীবন যাপন সম্পর্কে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে কপিলের বাড়িতেই ঝমর একদিন গভীর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। কপিলের চোখের সামনেই তার মৃত্যু হয়। এর ফলে কপিল আরো বেশী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। এই আঘাতে তার কল্পনার জগৎ একটি মেঠো পথে নেমে আসে। এর পর

উপন্যাসের সপ্তম খণ্ডে কপিলকে মিনির কাছে যেতে দেখি। এই হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে একটু সান্ত্বনা পেতে মিনির কাছে ছুটে গিয়েছে সে। যে মিনিকে একদিন কপিল দূরে ঠেলে দিয়েছিল, একটি পরিচারিকার মৃত্যু দিয়ে বুদ্ধদেব বসু মিনিকে নূতনভাবে চেনার পথ দেখায়। কপিল তার ভাঙ্গাচোরা হৃদয় নিয়ে মিনির কাছে গিয়েছে এবং নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এখনও মিনি নির্বাক, তাকে সরাসরি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছে।

উপন্যাসের শেষ অংশে মিনিকে গ্রহণ করার জন্য একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছে কপিল। মিনি তার আবেদনে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়েছে। মিনির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবার পরেও ঝমরের যন্ত্রণা থেকে সে জীবনে মুক্তি লাভ করে নি। সাঁওতাল মেয়ের সরল জীবন যাপন তাঁর হৃদয়কে ছুঁয়ে গিয়েছিল। একটা সরল জীবনের ছাপ সে সারা জীবন বয়ে নিয়ে যায়। মিনুর সঙ্গে কাছাকাছি আসতে ঝমর যেন সাহায্য করে। এ থেকে বোঝা যায় কপিল ঝমরকে অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছিল।

"রূপালি পাখি" উপন্যাসের নায়ক উপন্যাসের শুরুতেই নিঃসঙ্গতার জগতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু শেষের দিকে বসন্তের সেই সকাল বেলায় সে ঘুম থেকে উঠল। আর উঠে দেখল সে একা, নিজেকে তার একা লাগছে। কপিল তার বন্ধুদের কাছে টেনে আনলেও তার একাকীত্বের জগতেই তার ভাবনা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরে যায়। মিনুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হলেও উপন্যাসের সমাপ্তিতে সেই একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তিলাভ ঘটে না। উপন্যাসে মিনুর ভালোবাসার তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়।

কপিল মিনুকে ভালোবাসে। মিনিকে ভালোবাসার মধ্যে কপিলের মানসিক স্তরের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই ভালোবাসা কপিলের মনে কিছু আনন্দ উপভোগের বস্তু হিসাবে দেখা দিয়েছে। ক্রমে সেই অনুভূতি আরো গুরুতর হয়েছে। মাঝে মধ্যে মিনুর উষ্ণ হাতের স্পর্শ তাকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। সেই স্পর্শে তার প্রাণে জাগে সুখের অনুভূতি। সে ভালোবাসা কপিলের জীবনে আনে ভালোবাসার সুর।

কপিল মিনির কাঁছে গিয়েছে হতাশা থেকে মানসিক শান্তি পেতে। সে অন্তরের মাধ্যম হিসাবে মিনিকে বেছে নিতে চায়। কপিল তার ভাঙ্গা-চোরা মনের ক্ষত ও

লাজুকতা পার হয়ে মিনিকে নিজের করে নিয়েছে। মিনিও কপিলের কাছে নিজেকে সপেঁ দিল।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে মিনির ভালোবাসার বিরহে কপিল চিঠি লিখেছে। মিনুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবার পরেও সেই যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তিলাভ করে নি। ঝমরকে সে এখন অনুভব করে। মিনিকে পেয়ে সেই জ্বালা প্রশমিত করতে চাইলেও অন্তরে ঝমরের প্রতি ভালোবাসা সে কোনদিন ভুলতে পারে নি।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শুরু করেন এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শেষ করেন। উপন্যাসটি ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ ও নামপত্র এঁকেছেন শ্রী দেবব্রত রায়। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, নর্দান প্রিন্টার্স, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা - ৬। মূল্য - ৬ টাকা।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসটিকে বারোটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ উপন্যাসে লক্ষ করি। "কালো হাওয়া" উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীতে প্রথম মঞ্চে অভিনীত হয়। তারপর তিন, চার, পাঁচই এপ্রিল পর পর তিন দিন এই নাটকের অভিনয় হয়। তাঁর স্মৃতি কথায় প্রতিভা বসু লিখেছেন -

"বুদ্ধদেব তার "কালোহাওয়া" উপন্যাস অবলম্বন করে একটি বড় নাটক লিখেছিলেন। কোলকাতার রেডিয়োর স্টেশন ডিরেক্টর তখন প্রভাত মুখার্জ্জী নামে একটি নবীন যুবা, দেখতে অসম্ভব সুন্দর, ব্যবহার অতি মনোরম, বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা করেই সে প্রথম ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ-এর বাড়িতে এলেও আমার সঙ্গে বৌদি পাতিয়ে দুদিনেই ঘরের মানুষ হয়ে যায়। অভিনয় করতে এক কথাতেই সে রাজি হয়ে যায়।"

- ১১

এর পর বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"এরপর বেবীকে ধরলাম, বেবী হাসতে হাসতে এতো অস্থির হলো যে, মনে হল যেন এক মস্ত রসিকতা করছি তার সঙ্গে। টুনু রায় (অজিত দত্তর ডাক নাম) শুনে তো আনন্দে মূর্ছা যান আর কি।

বাজীধরেই বেবীকে আমি দলে টানলাম। পঙ্কুবাবুর স্ত্রী লীলাকে অনুনয় বিনয় করে বাধ্য করলাম দলে আসতে, দেখা গেল তবু কম পড়ছে মেয়ে। মাঝে মাঝেই বুদ্ধদেবের কাছে একটি সুশ্রী তরুণ ফুল হাতে নিয়ে দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে ডাকত, "বেয়ারা, বেয়ারা।" - এরকম ভাবে আর কেউ ডাকত না। তাই বুদ্ধদেব আগন্তুককে না দেখেই বলতেন, কে ? শেখর ? এসো এসো! ছেলেটির নাম শেখর সেন। আমাদের নাটকের কথা শুনে এবং দুটি মেয়ের জন্য আমরা আটকে গেছি জেনে সে বললো, আমি দুটি মেয়েকে জানি, তারা দেখতেও ভালো, অভিনয়ও করতে পারবেন। আমাদের সাগ্রহ সম্মতি নিয়ে সত্যি সে দুটি মেয়ে নিয়ে এসে হাজির হলো। একজন কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, (লেখক সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সদ্য বিবাহিতা পত্নী) আর একজন তপতী মুখোপাধ্যায়, (কল্যাণীর ভাগ্নী)। মেয়ে দুটি প্রথম দিনই আমাদের নাটকের সব সদস্যরই প্রিয় হয়ে উঠল। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তাদের প্রাণাধিকা রানুদি হয়ে গেলাম - এই দুটি মেয়ে পেয়ে আমাদের রিয়ার্সাল পূর্ণবেগে জমে উঠল। পারবো না, পারবো না বলা লাজুক বেবীও সংকোচ কাটিয়ে দিব্যি মুখর হয়ে গেল। রিহার্সেল ছয় মাস ধরে চলেছিল। আনন্দের বন্যায় ভেসেছিলাম আমরা। জোর্তিময় রায় হলেন আমাদের প্রম্টার। ঘর ভর্তি হয়ে যেত লোকে। শোবার ঘরে সব সরিয়ে প্রশস্ত মেঝেতে আসর বিছানো হত। রিহার্সেল চলত যতটা; ইয়ার্কি-ফাজলামি, রসিকতা, উচ্চরোলে অকারণ হাসি, কারো পিছনে লাগা এসব চলত তার চেয়ে বেশি। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত বারোটা বেজে যেত এক পলকে। তাও কারো উঠবার ইচ্ছে নাই। বাড়ি যাবার তাড়া নেই।

এই রিহার্সেলে মাঝে-মাঝে বিখ্যাত পরিচালক নিউ থিয়েটার্সের বিমল রায়ও আসতেন। পরে বোম্বে যান। তাঁর সঙ্গে কবে কি সূত্রে পরিচয় হয়েছিল এবং সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়েছিল সে কথা মনে নেই।

রিহার্সেল যখন পেকে এলো, হাউস বুক করার এবং কার কি ধরনের পোশাক প্রয়োজন সে-সবের প্রশ্ন উঠল, তখন নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেক্টার সোরেন সেনকে নিয়ে এলেন বিমল রায়, সোরেন সেন এসে কয়েকদিনের মধ্যেই নিজের উপর সব কিছুর দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। আমরা সকলেই প্রায় অভাবিতভাবে নির্ভর করতে লাগলাম তার উপরে। হল তিনিই বুক করলেন, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা, মেকাপ ম্যান ঠিক করা, মঞ্চ সজ্জা সবই তখন তার হাতে। আরো অনেক খুঁটিনাটি সব প্রস্তুত

রেখে বুদ্ধদেবকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিলেন। একটা সহজাত ব্যক্তিত্ব ছিল ভদ্রলোকটার। ভার গ্রহণ করার মত বুদ্ধি এবং শক্তি দুই-ই প্রবল ছিল।

আমাদের রিহার্সেল ফুরিয়ে গিয়ে স্টেজে যখন যার যার গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় দেবার সময় হল, তখন সকলেরই মন খারাপ। পরপর তিন দিন (৩-৪-৫ এপ্রিল) শ্রীরঙ্গমে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। প্রশংসায় অনেক কাগজ পঞ্চমুখও হয়েছিল। টিকিট বিক্রিও কম হয় নি। তথাপি দেখা গেল ঘাটতি হয়েছে প্রায় এক হাজার টাকা।

পরে জানলাম ঐ ধারটা হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের কাছে পোশাক-পরিচ্ছদ, মেকাপ ম্যান, মঞ্চ সজ্জার উপকরণ ইত্যাদির জন্য। সোরেন সেন বুদ্ধদেবকে বলেছেন, ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি অন্যান্য কাজের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ওটা শোধ করে দেব। এই সময়টায় সোরেন সেনই বুদ্ধদেবের প্রাত্যাহিক বন্ধু এবং সহায় হয়ে উঠেছিলেন।" - ১২

উপন্যাসের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসু অশান্তিপূর্ণ পরিবারের ছবি এই "কলো হাওয়া" উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। পরিবারটি ছিল অরিন্দম ও হৈমন্তীর। তাদের দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে সুখী সংসার ছিল। দুই কন্যার মধ্যে বড়ো মেয়ে মিনি এবং ছোটো মেয়ে বুলি। মিনি বয়সে বড় হলেও বুলি চঞ্চলতার দিক দিয়ে অনেক বেশী দৃঢ়চেতা। অরুণ এই সংসারের একমাত্র ছেলে। অরুণ বিবাহিতা, অরুণের স্ত্রী উজ্জ্বলা। সে নিরীহ, সৎ ও সাংসারিক মহিলা। অরুণ ও উজ্জ্বলার একমাত্র পুত্র দীর্ঘরোগে শয্যাশায়ী ছিল।

অরিন্দমকে এই উপন্যাসে সহজ-সরল ও মুক্ত মনের মানুষ হিসাবে দেখি। সে সর্বদা প্রফুল্ল ও হৈচৈ স্ফূর্তির চড়া সুরে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। সে মন খারাপ হলে হৈ-চৈ চিৎকারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কিন্তু এই মেজাজ দীর্ঘ সময় অরিন্দম ধরে থাকতে পারে না। অপরিমিত আত্ম প্রশ্রয়ই অরিন্দমের জীবন হয়েছিল অসহনীয়। সে জীবনে সংযম কোনদিন শেখেনি। তার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার অভ্যাস নেই। ছোট বড় সমস্ত ঘটনার আগেই তারই স্পষ্ট জবাব সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভিতরে কোন রাগ জমা রাখতে সে ভালোবাসতো। অরিন্দমের স্ত্রী হৈমন্তী ছিল ভিন্ন মেজাজের মেয়ে। হৈমন্তী মহামায়া দেবীর একনিষ্ঠ সেবিকা। দেবীকে মনে প্রাণে

এমনভাবে স্থান দিয়েছিল যে, মহামায়ার প্ররোচনায় ছেলে অরুণের বিয়ে হয়। আসলে মহামায়া ছিল ভণ্ড, মাতাল শ্রেণীর সাধু। সে হৈমন্তীকে বশে নিয়ে সংসারের টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেছিল। হৈমন্তী ও তার পুত্র অরুণ মহামায়া দেবীর চরণতলে আশ্রয় নিয়েছিল। অরুণ নিজ স্ত্রী উজ্জ্বলার মোহর চুরি করে পালিয়ে যায়। নিরঞ্জন নামে এক যুবক অরুণের বন্ধু পরিচয় দিয়ে উপন্যাসের মধ্যাংশে অরিন্দমের বাড়িতে আসতে দেখা যায়। অরুণ নিরঞ্জনের কাছে অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। এরপর দীর্ঘদিন অরুণ সংসার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মা হৈমন্তীর প্রশ্রয়ে অরুণ এসে মহামায়ার চরণ তলে আশ্রয় নেয়। এদিকে অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে উজ্জ্বলা দিন কাটাতে থাকে।

অরিন্দম এ অবস্থায় আরো বাস্তবতার সম্মুখীন হল। শুরু হল সংসারে অশান্তি। অরুণের কাছে প্রাপ্য টাকা নিতে এসে নিরঞ্জনের সঙ্গে মিনির পরিচয় হয়। প্রথম দিকে নিরঞ্জন মিনির কাছে প্রত্যাঘাত পেলেও কোনদিন সে ভেঙ্গে পড়ে নি। মনে মনে আলাদা শক্তি সঞ্চয় করে সে নবশক্তি লাভ করতে থাকে। মিনির এই প্রত্যাখ্যানের পর বুলি এসে নিরঞ্জনের কাছে ধরা দেয়। তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুলি ও নিরঞ্জনের সম্পর্কের গভীরতা লক্ষ করে মিনি। বুলি এ ব্যাপারে মিনিকে সতর্ক করে দেয়। তাদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। এই তর্কের রেশ অরিন্দমের কানে এসে পৌছায়। অরিন্দম নিরঞ্জনের সঙ্গে বুলির বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করেন। এই শুভ বিবাহের আগে উজ্জ্বলা ও অরুণের ছেলের মৃত্যুতে বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া। উজ্জ্বলার মা, বাবা তারই নিঃসঙ্গ জীবন থেকে উজ্জ্বলাকে কোলকাতার বাড়িতে নিয়ে যায়।

উপন্যাসের শেষ অংশে উজ্জ্বলার এই প্রত্যাবর্তনে অরুণের কোন মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সে এখন মহামায়ার কাছে থাকে। মহামায়ার প্ররোচনায় বাড়ির অর্থ আত্মসাৎ করার নয়া কৌশল শুরু করে সে। মা ও পুত্রের এই যৌথ অন্ধ বিশ্বাস অরিন্দমের সংসার জীবনে নিয়ে আসে দুশ্চিন্তার কালো হাওয়া। এই হাওয়া শেষ পর্যন্ত বুলি ও নিরঞ্জনকে বিবাহের মাধ্যমে অরিন্দমের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই "কালো হাওয়া"-র শেষ পরিণাম অরিন্দমের মৃত্যু উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। মহামায়ার নির্দেশে অরুণের পিস্তলের গুলিতে অরিন্দমের প্রাণনাশ ঘটে। উপন্যাসের শেষে হৈমন্তী ও পুত্র অরুণ ভুল বুঝতে পারে। মহামায়ার কাছ থেকে তারা দূরে সরে যায়।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসটি বুদ্ধদেবের বাস্তব প্রবণতার প্রতি আনুগত্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব খাঁটি ঔপন্যাসিকের মত জীবন অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। বুদ্ধদেব এতদিনে কাব্য থেকে উপন্যাসকে আলাদা করে দেখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেবের ভাষার সংযম, মানসিক ঘাত প্রতিঘাতের দৃঢ় রূপটি দেখা যায়। উপন্যাসের চরিত্রে উপলব্ধির গভীরতা, বিশ্লেষণের সাবলীল নৈপুণ্য ও ঘটনা প্রবাহের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ- এসবই ছিল বুদ্ধদেবের মুন্সীয়ানার পরিচয়। অরিন্দম, মিলি, হৈমন্তী, বুলু, অরুণ, উজ্জ্বলা - অরিন্দমের পরিবার বর্গের আদর্শ বিরোধ ও পরস্পরের প্রতি বিমুখতার মিশ্র মনোভাব উপন্যাসে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সমগ্র পরিবারের উপর মা মহামায়ার সর্বনাশী প্রভাবের ছায়াপাত ঘটেছে। তীব্র লেলিহান জিহ্বায় মা মহামায়া অরিন্দমের পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হৈমন্তীর অন্ধ আনুগত্যের বশে মহামায়া পরিবারের কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। অরুণও শেষের দিকে মহামায়ার নির্দেশে বাবা অরিন্দমকে হত্যা করেছে। এই সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে হৈমন্তীর বিকার ও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বাড়ির লোকের নিদারুণ ছোটাছুটি ও অর্থহীন বিশ্বাস একটি পরিবারের ধ্বংসের এক চূড়ান্ত পরিণতি বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর বাস্তবতার পথগ্রহণ ও কাব্যের ঝোঁক কেটে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে বলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন। কাব্য ও উপন্যাস যে আলাদা এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু চরিত্রের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে তা তুলে ধরেছেন।

অরিন্দম, হৈমন্তী, মহামায়া, মিনি, বুলি, উজ্জ্বলা - অরিন্দম পরিবারবৃত্তের আদর্শ বিরোধ ও সন্দেহপ্রবণ প্রীতি বিমুখতা পরিবারের সর্বনাশের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। মহামায়ার সর্বনাশা প্রভাব পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে, হৈমন্তীর স্বামীকে গুলি করা এবং পরবর্তী নানা ঘটনার মধ্যে হৈমন্তীর উদভ্রান্ত মনের ছবি লেখক প্রশংসনীয় ভাবে এঁকেছেন।

"চৌরঙ্গী" উপন্যাসটি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। "প্রগতি" পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের প্রকাশক এম.সি. সরকার এণ্ড

সন্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা এর পক্ষে শ্রী সুপ্রিয় সরকার। ক্রাউন সাইজ, ৬+১১৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪ টাকা।

উপন্যাসটিতে অনেক লেখকের লেখা অংশ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসটি শুরু করলেও প্রভূ গুহঠাকুরতা, শচীন্দ্রনাথ কর এই উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ লিখেছিলেন। অনেক সমালোচক উপন্যাসটিকে "বারোয়ারী" উপন্যাস বলে থাকেন। উপন্যাসটির চারটি অংশে সমগ্র কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কোন লেখক কোন অংশ লিখেছিলেন তার পুরো বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

প্রথম অংশ ঃ আরম্ভ - বুদ্ধদেব বসু। (পৃঃ ৪০ - ৪৩)
দ্বিতীয় অংশ ঃ সুহাসিণীর কথা - প্রভূ গুহঠাকুরতা (পৃঃ ৪৪-১১১)
তৃতীয় অংশ ঃ ক) মালতির কথা - শচীন্দ্র নাথ কর (পৃ ঃ ১১২ - ১৯৮)
খ) বিজয়কৃষ্ণের কথা - শচীন্দ্র নাথ কর (পৃ ঃ ১৯৯ - ২৬৭)
চতুর্থ অংশ ঃ শেষ - বিপ্রদাস মিত্র - (পৃঃ ২৬৮ -৩২৩)
(বিপ্রদাস মিত্র বুদ্ধদেব বসুরই ছদ্ম নাম)

উপন্যাসের প্রথমে সুহাসিণীর পরিবারকে পাই। তার অভিজাত পরিবার ছিল। সুহাসিণীর একমাত্র মেয়ে মালতি। সুহাসিণীর স্বামী রেবতিমোহন সৎ ও সংসার সম্পর্কে উদাসীন এক ভাবুকী মানুষ। সুহাসিণী মালতির বিয়ে নিয়ে দুঃচিন্তার অন্ত ছিল না, তার দুচোখে ঘুম নেই, কারণ মেয়ের বিয়ে দেবার মতো আর্থিক সংগতি না থাকায় তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই আর্থিক দুঃচিন্তা সুহাসিণীকে উন্মাদের মতো করে তুলেছিল। এই অবস্থায় সুহাসিণীর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য ভাসুরই ছিল একমাত্র ভরসা। বরিশালের ছেলে সুরেশ দাসের সঙ্গে মালতির বিয়ে নিয়ে প্রাথমিক দেখাশুনা শুরু হয়। সুরেশের বাবা মাতাল। সুরেশ ছবি আঁকে, শখ ছিল বাঁশি বাজানো। সুতরাং এমন পাত্র সুহাসিণীর ভাশুরের মত হবে কিনা এ নিয়ে তার সংশয় দেখা গিয়েছিল। মালতির জ্যাঠামশায়ের এই বিয়েতে আপত্তি থাকায় সুরেশকে পাত্র হিসাবে বেছে নিতে সুহাসিণী ব্যর্থ হলো। এদিকে মালতির হৃদয়ে অপূর্ব নামে এক কারখানা মালিকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অপূর্বের বাবা জ্যোর্তিময়ের এই বিয়েতে সম্মতি ছিল না। কিন্তু অপূর্ব ও মালতির পারস্পরিক আকর্ষণ উভয়কে আরো কাছাকাছি এনেছিল। অপূর্ব মনের সৌন্দর্য ও কামনায় তাকে সম্ভাষণ করে। মালতির আধময়লা কাপড়খানি এলোমেলো চলাফেরা অপূর্বকে আকর্ষণ

করে। উপন্যাসের একটা অংশে একটি সময় দেখি তাদের প্রেম বিয়েতে রূপান্তরিত হতে চায়। মালতির সঙ্গে অপূর্বর বিয়ে উপন্যাসে না দেখালেও তাদের দুজনেই পরস্পরকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মেনে নিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানে দেখি মালতি-অপূর্ব দেহ বিনিময়ের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হতে। উপন্যাসের শেষে বুদ্ধদেব বসু অপূর্ব-মালতির প্রেমকে সম্মতি জানিয়ে সুহাসিনীর মতামত দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন। এখানে বুদ্ধদেব বসু প্রেমকেই বড় করে তুলেছেন। বাবা মা শেষ পর্যন্ত আত্ম সমর্পণ করেছে -

"অপূর্ব রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলে, আমি আর কেউ হলাম। তুমি তাহলে সব জানো, মালতি ?

মালতি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, হ্যাঁ, আমি জানি বলেই তো - বলে অপূর্বর মাথা ওর বুকের উপর শক্ত করে চেপে ধরলো।

অপূর্বর কানের কাছে মালতির হৃদয় দ্রুত ছন্দে স্পন্দিত হতে লাগলো। অনেক্ষণ ধরে অপূর্ব সেই উদ্দাম ধ্বনি শুনলে চুপ করে। ঐ হৃদয় ওর। চিরকালের মতো ওর। ঐ হৃদয় ও ওকে দিয়েছে - চিরকালের মতো।

ঐ হৃদয় ওর।

সুহাসিণী একবার মালতীকে ডাকতে এসে দরজা থেকে ফিরে গেল। অন্ততঃ আজকের রাত্তিরটা ওরা একলা কথা কয়ে কাটাক" - ১৩

গ) দেহ চেতনা মূলক উপন্যাস ঃ

বুদ্ধদেব বসুর অনেক উপন্যাসে দেহসর্বস্বতায় নর-নারীরা সুখী হতে পারে নি, এ থেকে নর-নারীরা পেয়েছে ব্যথা, বেদনা ও যন্ত্রণা। দেহকে ঘিরে প্রেমের রহস্যময় সত্তার আর্তনাদ বুদ্ধদেবের উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। সাময়িক গল্প বলার ছলে উপন্যাসে নারীর রূপ সৌন্দর্যের মোহে পুরুষদের আকর্ষণ অনুভব করলেও এখানে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বুদ্ধদেব যৌন চেতনাকে তাঁর উপন্যাসের নর-নারীর চরিত্রে দেখিয়েছেন। একে প্রতিষ্ঠা করাই বুদ্ধদেবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাই দেহ চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে তিনি তেমন-আগ্রহ দেখান নি। এটা মূলতঃ তুলে ধরেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তেরা সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে

কিভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতেন তার সুখ প্রিয় মনোভাবকে উপন্যাসে দেখতে পাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্রদের আগ্রহ দেখা যায়। বুদ্ধদেব পাশ্চাত্য কালচারের সংস্পর্শে দাম্পত্য জীবন কি প্রভাব ফেলেছিল এবং নর নারীরা কিভাবে জীবনকে উপভোগ করেছিল তার ছবি এঁকেছেন। মূলতঃ এটা ছিল সমকালীন সমাজের ব্যঙ্গ প্রবণতা। এই ব্যঙ্গ মূলতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজ থেকে এসেছিল। তারই নিস্ফল, অন্তঃসারশূন্য প্রেমের যন্ত্রণা লেখক উপন্যাসে দেখিয়েছেন। যেমন "যবনিকা পতন" উপন্যাসে চরিত্রগুলি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, অথচ তারা শিক্ষা সংস্কৃতিতে ছিল উচ্চমানের, কিন্তু তাদের জীবনে কোন স্থিরতা নেই। ভালোবাসার নামে সাহিত্য আড্ডায় মিলিত হয়, এক ভয়ঙ্কর যৌন ক্ষুধার তাগিদে চরিত্রগুলি সব কিছু ধ্বংস করতে চায়। তাই এই উপন্যাসের খল চরিত্র মৃগাঙ্ক বন্ধুর বান্ধবীকে ভোগ করেছে, আবার সে শেষ পর্যন্ত বন্ধু মৃগাঙ্ককে খুনও করেছে। তবুও মুক্তির স্বাদ সে পায় নি। সে অর্থ সংকটে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত ছিল। শুধু মৃগাঙ্ক নয়, প্রেমকে বিবাহে পরিণত করার তাগিদ আমরা কোন চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই না। শুধু শরীরকে পাবার আশায় তারা যৌবন জোয়ারে ভেসে বেড়ায়। এই ধরনের উপন্যাস গুলি হলো "যবনিকা পতন", "মন-দেয়া-নেয়া", "হে বিজয়ী বীর" ইত্যাদি।

"যবনিকা পতন" বুদ্ধদেব বসুর একটি অন্যতম উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শুরু হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাস থেকে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঃ ডি.এম. লাইব্রেরী, ক্রাউন সাইজ। ৪+২৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪ টাকা।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডের আলাদা নামকরণ আছে।

প্রথম খণ্ড ঃ দুই বন্ধু

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ অঞ্জলী বসুর প্রেমোপাখ্যান।

তৃতীয় খণ্ড ঃ অতি-পুরাতন বিরহ-মিলন কথা।

উপন্যাসটির প্রত্যেকটি খণ্ড আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের তিনটি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডের চারটি পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় খণ্ডে চারটি পরিচ্ছেদ আছে।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসের নায়ক অমিয়। সে ভোগবাদী ও মাতাল শ্রেণীর চরিত্র। মৃগাঙ্ক তার বন্ধু। মৃগাঙ্কর প্রিয় শখ ছিল কবিতা ও গল্প রচনা করা। মৃগাঙ্কের বন্ধু ইন্দ্রজিতের মাধ্যমে অঞ্জলী বসুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অঞ্জলী বসু তার লেখার একমাত্র ভক্ত। স্ত্রী জাতির প্রতি তার যে খুব অনীহা আছে তা নয়, যেহেতু অঞ্জলী বসু কবিতা লেখে তাই তার প্রতি একটা হৃদ্যতা। অঞ্জলী বসু দীর্ঘ পত্র লেখে মৃগাঙ্ককে তার ভালোবাসার কথাটি জানাতে চায়। মৃগাঙ্ক নীরব, নিস্তব্ধ ও ভাবুক প্রকৃতির। মন নিয়ে সে বিষয়টি অনুধাবন করে। সে সাহিত্য সাধনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। প্রেম নিয়ে আলাদা করে ভাববার অবকাশ তার নেই।

অঞ্জলী বসু সাধারণ ঘরের মেয়ে। বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসের কেরানী। মা ছায়াময়ী দেবী সাধারণ গৃহবধূ। অঞ্জলী গান ভালোবাসে। কবিতা লেখার হাতও তার মন্দ নয়। তার কবিতা মৃগাঙ্ককে পড়িয়ে সে আনন্দ পায়। মৃগাঙ্কের কবিতা, গল্প তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

অমিয় এই উপন্যাসে একটি খল চরিত্র। সে কর্পোরেশন অফিসের কেরানী, কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য সে প্রতি মুহূর্তে অর্থাভাবে পড়ে। অপরকে ঠকিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে অর্থ আদায় করা তার অভ্যাস। এক জনের কাছ থেকে ধার করে আরেক জনকে শোধ করে সে। এত অর্থ কষ্টের মধ্যেও সে বিলাসিতা করে। বিলাসিতা তার জীবনের অঙ্গ। সে নবাবী চালে চলতে চায়। আবার ভিখারীর মতো ঋণের জন্য ছোটাছুটি করে। সে নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে চাটুকতা ও প্রতারণার মধ্যে দিয়ে মানুষকে ঠকায়। অপরদিকে তার বন্ধু অমিয়র মাতলামির মধ্যেও তার নিঃসঙ্গতাবোধ ও যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল। ইলা নামে এক রমণীকে ভালোবাসা ও ব্যর্থতার মধ্যে অমিয়র চরিত্রের এক নূতন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

এই উপন্যাসের মধ্যাংশে অঞ্জলী বসুকে স্কুলের শিক্ষিকা রূপে আমরা দেখি। অঞ্জলী বসু অমিয়ের প্রেমের ফাঁদ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়। অমিয়র প্রেমের অভিনয়ের কাছে সে যেন হার মেনেছে। অঞ্জলী বসু দেহ চেতনার কাছে যেন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি। অন্যদিকে মৃগাঙ্কের নারীর প্রতি অটল ধৈর্য্য অঞ্জলী বসুকে ধৈর্য্যহীন করে তুলেছিল। অঞ্জলী যা বলতে চায় সে বুঝেও যেন এড়িয়ে যায়। অঞ্জলী তার ভালোবাসার ডালা সাজিয়ে যখন মৃগাঙ্কের কাছে নিয়ে যায় তখন সে

কবিতা লেখায় ব্যস্ত। দীর্ঘ পত্রের দ্বারা তাকে কাছে আনার জন্য যে মানসিকতা আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই, তার বহিঃপ্রকাশ মৃগাঙ্ক চরিত্রে ঘটে নি।

অমিয় ছায়াময়ীকে ভুল বুঝিয়ে মৃগাঙ্ককে তিরস্কৃত করেছে। বন্ধুর মর্যাদা রক্ষা তো করেই নি বরং তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অমিয় সব সময় আবেগের দ্বারা নীচু, হীন, ভেদবাদী মানসিকতায় পরিচালিত হতো। নিজের অহমিকাই বারবার তার ধ্বংস ডেকে এনেছিল। মৃগাঙ্ককে ফোন করে সেই ধ্বংস আরো তীব্র আকার ধারণ করেছিল। নিজের বংশ মর্যাদা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের দরুণ তার এই করুণ পরিণতি আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে অমিয়র এই মনোভাবকে যেন নিন্দা করেছেন। সে নিজের পবিত্রতা ধরে রাখতে পারে নি। গোটা উপন্যাসের মধ্যে অমিয় চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ করা যায়।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু প্রবল আদিম যৌন চেতনার উচ্ছ্বাস যে কতটা নীচে পৌঁছোতে পারে তার এক বীভৎস চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসে দেহ চেতনার আকর্ষণকে মৃত্যু পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে গেছেন লেখক। দেহ চেতনা ও কাব্য চেতনার মিশ্রণে বুদ্ধদেব বসু তার উপন্যাসে আলাদা মাত্রা এনেছেন। যৌন চেতনার এই দেহবাদী ভাবনার পরিচয় বুদ্ধদেব বসু "যবনিকা পতন" উপন্যাসে দেখিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক অমিয় ছিল উগ্র মনোভাবের। বন্ধুকে সে অপবাদ দিতে দ্বিধা করে নি। ইলার কাছে অমিয়ের ছলনা ধরা পড়ে যায়। মৃগাঙ্ককে অমিয় ফোন করেও শান্তি পায়নি, বরং আরো হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। অমিয়কে বলতে শুনি -

"তবু এক একটা সময় আসে, যখন আমার সব কাজের তারা ফাটা বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়, বিস্তীর্ণ দশদিক একেবারে ফাঁকা-নিঃসীম মহাশূন্যে আমি ঝুলছি- আমি যেন আর নেই।" - ১৪

মৃগাঙ্কের চিঠির মধ্যে একাকীত্বের যে ছবি ফুটে উঠেছে তার সূত্র ধরেই এগিয়ে যাওয়া যায় উপন্যাসের পরিণতির দিকে। অমিয়ের এই বৈশিষ্ট্য মৃগাঙ্ক ভালো করেই জানতো। কিন্তু অমিয়কে অর্থ অনুযায়ী চলার পরামর্শ দিলে সে রেগে যেত। মৃগাঙ্ককে

পরক্ষণে কৃপণ ব্যক্তি নামে তার কাছে তিরস্কৃত হতো। অন্যদিকে অমিয়ের আরেকটি প্রেমের কাহিনী ইলা চরিত্রকে নিয়ে দেখা যায়। ইলা শিক্ষিতা ও রুচিশীল মহিলা। সে অমিয়ের ছলনাময় প্রেমের অন্তসারশূন্যতা প্রথমে বুঝতে পারে নি। তাই ইলা অমিয়কে ভালোবাসতো। অমিয়র পিছনের এই কু-আদর্শ অজ্ঞাত থাকায় অঞ্জলী ও অমিয়র ভালোবাসা অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। অমিয়কে ধরে অঞ্জলীর বাড়িতে মৃগাঙ্ক প্রবেশ করে এবং নির্জনতার নীরব গৃহকোণে অমিয়র হাতেই অঞ্জলী বসু ধর্ষিত হয়, কিন্তু এই অপবাদ মৃগাঙ্কের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। চরিত্র অনুযায়ী মৃগাঙ্ক যে অঞ্জলীর সর্বনাশ করবে এটা অনভিপ্রেত। কিন্তু বদনাম হয় মৃগাঙ্কের। মিথ্যা অপকর্মের বোঝা মাথায় নিয়ে মৃগাঙ্ক ছটফট করতে থাকে। অঞ্জলী নীরবে সবই সহ্য করে। অঞ্জলীর মা ছায়াময়ী দেবী মৃগাঙ্ককে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতো। মৃগাঙ্কের এই অপকর্মে সে গভীরভাবে মর্মাহত হয়। ছায়াময়ীর কাছে এই ব্যাপারে মৃগাঙ্ক তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়। মৃগাঙ্ক নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কারণ এতদিন সে মুখ বুজেই বন্ধুর নীরব অত্যাচার সহ্য করেছিল। মৃগাঙ্কের কাছে অমিয়ের নীচুতার শেষ অবস্থাটি ধরা পড়ে। কিন্তু এই প্রতিবাদই হয় তার জীবনের কাল। মৃগাঙ্ক এতদিন অমিয়কে উচ্ছৃঙ্খল ও যৌনকামী পুরুষ হিসাবে জানত। কিন্তু আজ অমিয়র কাছে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাঁচের তৈরী কাগজ চাপা দেওয়ার বস্তুটির আঘাতে মৃগাঙ্ক ভূপতিত হয়। এই ঘটনাটি অমিয়র নিজের বাড়িতেই ঘটে। সেখানেই মৃগাঙ্কর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় উপন্যাসে মৃগাঙ্কের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না। মানুষের নিষ্ঠুরতার সর্বশেষ স্তর এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। অমিয়ের ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। সে তুলনায় মৃগাঙ্ককে অত্যন্ত নীচু ও পিশাচ শ্রেণীর মানুষ হিসাবে লেখক অঙ্কন করেছেন। সমগ্র উপন্যাসে যৌনতা মৃগাঙ্কর চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। শেষের দিকে এই নেশা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে নি। যার ফলে অমিয় মৃগাঙ্কের হাতে খুন হয়।

"মন-দেয়া-নেয়া" উপন্যাসটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রচিত হয় এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ক্রাউন সাইজ। ৬ + ১৫৪ পৃষ্ঠা। প্রকাশক ঃ এম.জি. সরকার এণ্ড সন্স। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৩২। মূল্য - ১টাকা ৭৫ পয়সা। উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিলঃ

"শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দিলাম"

"মন-দেয়া-নেয়া" উপন্যাসটি নয়টি পরিচ্ছদে বিভক্ত। এই উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছদে সুলতা দ্বিজেনকে যে জাপানী কবিতার বঙ্গানুবাদ শুনিয়েছেন, "প্রগতি" তে অজিত কুমার ও বুদ্ধদেবের যুগ্ম নামে এটি প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধদেব বসুর "মন-দেয়া-নেয়া" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা" কাব্যের মনের কথা এখানে স্মরণ করা যায়। "মন-দেয়া-নেয়া"-র অষ্টম পরিচ্ছদে দ্বিজেনকে বলতে শোনা গেছে আমাদের মনের কোন নিজস্ব চরিত্র নেই; মন বলে কোন একটা জিনিস আছে তাও বলা যায় না। "জিনিস" শব্দটা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাদৃশ্যে লেখা বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। এই উপন্যাসে তিনটি পুরুষ চরিত্র - দ্বিজেন, ঈশান, সিতাংশু এবং নারী চরিত্র সুলতা, মীরা ও মালিনী। এই তিন জন পরস্পরকে ভালোবাসে। তাদের মেলামেশায় কোন সামাজিক বা পারিবারিক বাধা নেই। তাদের মেলামেশা অন্য উপন্যাসের মতো নির্দিষ্ট ঘরে আবদ্ধ নয়। নিজস্ব গাড়ি করে কোলকাতায় বিভিন্ন পার্কে তারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের চলাফেরার মধ্যে দিয়ে নাগরিক কোলকাতা জীবনের বিভিন্ন রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বর্ণনা পাই। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র সাহিত্যপ্রেমী। উপন্যাসে কবিতা লেখায় তাদের কম বেশী অভিজ্ঞতা আছে। তারা জীবনকে উপভোগের বস্তু হিসাবে দেখেছিলো। সাহিত্য লেখার যে আনন্দ, সে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যেকটি চরিত্রই চৌরঙ্গী, ধর্মতলাকে প্রেমের বিনোদনের স্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে।

উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্বের দিকে তাকালে একটি কেন্দ্রিয় চরিত্র ভেসে ওঠে, তার নাম ইন্দ্রজিৎ। উপন্যাসের প্রথম থেকে তৃতীয় পরিচ্ছদে এর উপস্থিতি লক্ষ করি। ইন্দ্রজিৎ স্বল্পভাষী ও সুলেখক ছিলেন। সে নির্জীব ও অলস প্রকৃতির মানুষ। তার স্বভাব মেয়েলি প্রকৃতির। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সে ভালোবাসতো। সে এম.এ. পাশ করে সাহিত্য চর্চাকেই প্রিয় বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সে ছিল অনেকটা অন্তর্মুখী ও ভাবুক মনের মানুষ। সত্যিকার কোন মেয়েকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতো কি না বোঝা যায় না। সে বাস্তব সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন ছিল। তাই দ্বিজেন, ঈশান, এই ধূর্ত বন্ধু মহলে সে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল। লেখক হবার সুবাদে ইন্দ্রজিৎ দু-তিনটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিল বলে বন্ধু মহলে প্রচারিত। তার মধ্যে এক জনের নাম ছিল সুলতা। সে স্কুল শিক্ষিকা। প্রথম জীবনে সুলতার বাবা তাকে চার বার বিয়ে দিতে গেলেও তার আপত্তিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। সুলতার গৃহ সঙ্গিনী ছিল মালিনী। মালিনী তার বাড়িতে

কাজ করলেও, সে ছিল স্পষ্টভাষী। উপন্যাসের অষ্টম খণ্ডে সুলতা ও ইন্দ্রজিতের আলাপচারিতার মাঝে মালিনী চরিত্রের আবির্ভাব।

মালিনীকে ঈর্ষা করে সুলতা। সে মালিনীর কাজ কর্মের প্রতি বিরক্তময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। সে সুলতার বন্ধু সিতাংশুর কাছাকাছি চলে যায়। সিতাংশুর সঙ্গে সে গাড়ি চালায়, সিগারেট খায়, বড় বড় হোটেল ও রেঁস্তোরায় সময় বিনোদন করে। এক সময় সিতাংশুকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেও দেখা যায়। উপন্যাসের শেষে দ্বিজেনকে ইন্দ্রজিতের বাড়িতে দেখতে পাই। দ্বিজেন, ঈশান, সিতাংশু ইন্দ্রজিতের বাড়িতে উপস্থিত হয়। এক সঙ্গে সুলতা ও মালিনীর আবির্ভাব ঘটে সেখানে। এই বাড়িতেই দ্বিজেন ও সুলতার দেহ বিনিময় ঘটে। দ্বিজেন চরিত্রটি উপন্যাসে সুযোগসন্ধানী, ভোগী চরিত্র রূপে দেখি। দ্বিজেনের খুড়তুতো বোন মীরার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ের ব্যবস্থা হয়, দ্বিজেনের প্রচেষ্টায় ও প্ররোচনায় এই সম্পর্কে প্রায় ফাটল ধরে। মীরা উচ্চ শিক্ষিতা, নম্র স্বভাবের মেয়ে। উপন্যাসের শেষ অংশে তাদের বিবাহের চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই না। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র আপন খেয়ালে মেলামেশা করে। তার চকিত আভাস দিয়ে লেখক যেন উপন্যাসটি হঠাৎ শেষ করেছেন। ইন্দ্রজিতের বন্ধু হিসাবে সুলতার বাড়িতে দ্বিজেনের আবির্ভাব ঘটে। আবার ইন্দ্রজিতের বাড়িতে সুলতার সঙ্গে দৈহিক মিলন উপন্যাসে দেখা যায়। দ্বিজেন নিজের খেয়ালের বসে যৌন চাহিদা মেটাতেই মালিনীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মালিনী তার লালসাময় রূপটি সহজেই ধরে ফেলে। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

উপন্যাসের শেষ অংশে মীরা, ইন্দ্রজিৎ দ্বিজেন, সুলতা, মালিনী, সিতাংশুর কোন মিলন দেখি না। বুদ্ধদেব বসু নর-নারী এক বিশেষ মুহূর্ত কিভাবে চলা ফেরা করে তারই একটি প্রতিচ্ছবি উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

<u>ঘ) প্রেরণাত্মক ও বিশুদ্ধ প্রেমের উপন্যাস ঃ</u>

"অকর্মণ্য" উপন্যাসটির রচনা কাল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নামপত্রে ও মুদ্রকের পৃষ্ঠায় ছিল - ডি.এম. লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কোলকাতা, ১৯৩১ ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে শ্রী গোপাল দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী প্রেস, ৩৩ এ, মদন মিত্র লেন থেকে শ্রী সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক মুদ্রিত। "পরিচয়" পত্রিকা, বর্ষ - ১, সংখ্যা- ৩, মাঘ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। বিচিত্রা (বর্ষ-৫, খন্ড-১, সংখ্যা-৬ পৌষ-১৩৩৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে উপন্যাসটির কিছু অংশ "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জলধর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন- ১৫ "(১) এ সম্বন্ধে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না; (২) সম্মান মূল্য ফিরিয়ে দিতে পারিবেন না; (৩) এ কথা আপনার ও আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, তৃতীয় কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। ..... এই তিনটি অনুরোধ আপনি রক্ষা করিবেন, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ, নিবেদন ও প্রার্থনা।"

এর উত্তরে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"জলধর বাবুর প্রথম অনুরোধ আমি অনায়াসেই রক্ষা করেছিলাম; দ্বিতীয়টি আমার পক্ষে রক্ষা না করাই কঠিন হতো; কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ লঙ্ঘন করতে হলো বলে জলধরবাবুর কাছে আমি লজ্জিত, দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।" - ১৬

এই উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল -

"শ্রী প্রভূ গুহঠাকুরতাকে -

সানুরাগ কৃতজ্ঞতায়.

১/১০/১৯৩১ - শ্রী বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম "সাড়া" উপন্যাসে অশ্লীলতার যে অভিযোগ এসেছিল, এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনকেই লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রে এনেছিলেন। এই উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের সাবলীলতা লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের নায়ক সরোজকে অনেকটা কাপুরুষই মনে হয়। লেখক সে তুলনায় নারী চরিত্রগুলিকে বুদ্ধিমান ও উচ্চশিক্ষিতা করে তুলেছিলেন।

"অকর্মণ্য" উপন্যাসটি ১২ টি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে খন্ড বা পর্ব করা হয়েছে। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ খন্ড পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে উপন্যাসটিকে খন্ডান্তর করা হয়েছে। ১ম থেকে

৭ম খণ্ড পর্যন্ত জ্যোর্তিময় বাবু, অনুসূয়া, শশাঙ্ক, রিণি এই চারটি চরিত্রের আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। ৮ম খন্ডে রিণির ডায়েরী লেখা শুরু হয়েছে। ৫ই চৈত্র থেকে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত এই খণ্ডের তারিখ সন্নিবেশিত হয়েছে। ৯, ১০, ১১ তম খণ্ডের কোন ডায়েরীর তারিখ নাই। ১২ তম খণ্ডে ১লা বৈশাখ থেকে রিণির ডায়েরী লেখা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু "অকর্মণ্য" উপন্যাসে এক সম্পদশালী গৃহস্থ পরিবারের চিত্র এঁকেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান কর্তা জ্যোর্তিময় বাবু। তার দুই কন্যা ও এক ছেলেকে নিয়ে সংসার জীবনের পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই। বড় মেয়ে অনুসূয়া ও ছোট মেয়ের নাম রিণি। পুত্র সরোজ দুই মেয়ের বড় ছিল। উপন্যাসে নায়িকাদ্বয় দুই সহোদরা ভগ্নী ছিল। অনুসূয়া ধীর, শান্ত এবং কনিষ্ঠা রিণি অতি আধুনিকা, সপ্রতিভ। সে কথার চটকতায় সকলকে হার মানিয়ে দেয়। তাই উপন্যাসে শশাঙ্ক খুব জোরের সঙ্গে রিণিকে ভালোবাসে এই কথাটি বলতে পারে নি। একটি অপদার্থ পুরুষ চরিত্র শশাঙ্ককে দুই বোনের মাঝে খুবই বেমানান দেখিয়েছিল। তাদের চিন্তাধারার স্রোতে শশাঙ্ককে নির্বোধ মনে হয়েছিল। সরোজের দুই ভগ্নীর চিন্তা ধারার স্রোতে বিবেক, বুদ্ধি যেন ভেসে বেড়ায়। সরোজ পুরীতে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। শশাঙ্কের সেবা-যত্নে সে আরোগ্য লাভ করে। সরোজ বাড়িতে ফিরে আসছে এই সংবাদে জ্যোতির্ময়বাবুর সংসারে আয়োজনের আড়ম্বরের বাড়াবাড়ি লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এই আয়োজন উপলক্ষে ডিনার টেবিলের ব্যবস্থা, সতেরো বছরের রিণির পিয়ানো বাজানোকে কেন্দ্র করে আয়োজনগুলি নিতান্তই অবান্তর বলে মনে হয়েছে। এইগুলি বাড়াবাড়ির ফলে লেখক উপন্যাসটিকে খানিকটা প্রহসনে পরিণত করেছেন বলে অনেকে মনে করেন।

"অকর্মণ্য" উপন্যাসে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে নূতন ঢঙে বুদ্ধদেব এই উপন্যাস খানি লিখেছিলেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে অশ্লীলতার যে অভিযোগ অনেক সমালোচক আনেন, কিন্তু এই উপন্যাসে তেমন নেই বরং আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক বন্ধনে উপন্যাসটি আলাদা স্বাদ এনেছিল। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলির মধ্যে এই "অকর্মণ্য" উপন্যাসটি স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে। শশাঙ্ক এই উপন্যাসের নায়ক। সে একটা সুপ্ত বাসনা বা সংকল্পকে যেন বুকের মধ্যে সবসময় লালন পালন করত। উপন্যাসের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ ক্রমিক খণ্ড সংখ্যায় আমরা দেখি, শশাঙ্ক বিভিন্ন গল্পের মধ্যে গিয়ে নিজেকে অতিবাহিত করেছে। অনুসূয়া ও রিণিকে নিয়ে সে গান বাজনার

এক পরিবেশ তৈরী করে। রিনি খুবই চঞ্চল ও স্পষ্ট কথার মেয়ে। তার সাহসী কথাবার্তায় শশাঙ্ক মুগ্ধ হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক রিণিকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসাটা ছিল খুবই নীরবে ও সন্তর্পণে। রিণিকে তার ভালোবাসা স্বীকার করানোর চেষ্টা উপন্যাসের শেষ অংশ পর্যন্ত দেখা যায়। অনুসূয়া ছিল রিণির ঠিক বিপরীত মনের মেয়ে। রিণির চারটি খেলা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তার মনের কথা জ্যোতির্ময় বাবু, রিণি, অনুসূয়া ও শশাঙ্ক শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শশাঙ্ক কী বলতে চায় রিণি তা এই খেলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আবার শুরু হয় রিণির ডায়েরী লেখা। ৫ই চৈত্র থেকে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত এবং দ্বাদশ খণ্ডে ১লা বৈশাখে ডায়েরী লেখার মধ্যে দিয়ে রিণির মনের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের শেষ অংশ পর্যন্ত এই ডায়েরীর তারিখ ছিল। এই ডায়েরী লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি অনুসূয়া অসুখে পড়েছিল। শশাঙ্ক নিয়মিত তার সেবা করে।অনুসূয়ার আরোগ্য লাভের পর সরোজ, শশাঙ্ককে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অনুসূয়ার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব খুবই আকস্মিক ঘটনা। কারণ শশাঙ্ক রিণিকে ভালোবাসে। কিন্তু রিণির পক্ষ থেকে সে ধরনের সাড়া আমরা উপন্যাসে কোথাও দেখি না। শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক রিণিকে ভালোবাসার কথা মুখে বলতে পারে নি। এই ঘটনা দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে। বাধ্য হয়ে সে অনুসূয়াকেই জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর নারী চরিত্র সম্পর্কে যে ব্যক্তিত্বহীনতার অভিযোগ অন্য উপন্যাসে দেখি, এই উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে একই অভিযোগ অনেকে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে অনুসূয়ার স্বগোতোক্তি আর রিণির ডায়েরী লেখা উপন্যাসের গতিকে অনেকটা রুদ্ধ করে দিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু অভিজাত পরিবারের চিত্র আঁকতে গিয়ে ডায়েরীর তারিখ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অসঙ্গত বলে মনে হয়। প্রত্যেকটি চরিত্রই মুখে মুখে যেন গল্প বলছে। গল্প বলার মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলির কোন ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ করা যায় না। অনেকটা গানের জলসায় যেন প্রতিটি চরিত্র প্রতিযোগিতা করছে। স্থির বুদ্ধি ও আত্ম মর্যাদা কোন চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষ করে শশাঙ্ক চরিত্রটিতে কোন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে নি। সুপ্ত মনোজগতের মধ্যে শশাঙ্ককে লেখক রেখেছিলেন। তাই তার ভালোবাসা রিণির কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়।

বুদ্ধদেব বসুর "সাড়া" উপন্যাসের চার বছর পর "যেদিন ফুটলো কমল" রচিত হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, ডি.এম লাইব্রেরী। ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা ১ + ১৭৫। মুদ্রাকর - বাণী প্রেস।

"যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। বিখ্যাত গায়িকা (রানু সোম) প্রতিভা বসু (বুদ্ধদেবের স্ত্রী) এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন "মায়া মালঞ্চ" নামে। ঢাকার পাবলিক স্টেজে এই নাটকটি অভিনয় হয়েছিল। ঢাকা শহরে স্ত্রী-পুরুষের প্রথম মিলিত অভিনয় এই নাটকটি। প্রতিভা বসু এই নাটকে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু অন্য উপন্যাসের মত "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটিকে খণ্ড বা ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেন নি। লেখক উপন্যাসটিকে বিভিন্ন শিরোনাম খণ্ড দিয়ে ভাগ করেছিলেন। উপন্যাসটি উনিশটি শিরোনাম খণ্ডে বিভক্ত। শিরোনামগুলি অধিকাংশই চরিত্র অনুযায়ী, কোনটা নায়ক নায়িকাদের আনুসঙ্গিক অবস্থার পরিপেক্ষিতে নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিরোনাম যেন এক একটি ছোট গল্প। কিন্তু চরিত্রগুলির বিবর্তনে শিরোনামগুলির উপযোগিতা রয়েছে। শিরোনামগুলি হলো ঃ

১) পার্থ প্রতিম। ২) শ্রীলতা। ৩) প্রবন্ধপর্ব। ৪) সেই ব্যক্তি। ৫) শ্রীলতার বাড়িতে এক সন্ধ্যা। ৬) কবিতা। ৭) বর্ষার সুর। ৮) পরিচ্ছেদ। ৯) দু-খানা চিঠি। ১০) প্রস্তাবনা। ১১) মা ও ছেলে - ও একটি কবিতা। ১২) মানসীর মান। ১৩) পূর্বরাগ। ১৪) নতুন দিন। ১৫) প্রণয় জিজ্ঞাসা। ১৬) দেখা। ১৭) নতুন রাত্রি। ১৮) বাগানের ছায়া। ১৯) অতিরিক্ত।

উপন্যাসের প্রথমেই পার্থপ্রতিম চরিত্রটিকে পাই। পার্থপ্রতিম এই উপন্যাসের নায়ক। সে কলেজে এখন নবাগত ছাত্র। সে উদার প্রকৃতির যুবক। পুথিগত বিদ্যা অবলম্বনে সে ডিগ্রী অর্জন করার বিরোধী। এই ধরনের ডিগ্রী লাভ পার্থপ্রতিমের পক্ষে এক ধরেনের শাস্তি ও অত্যাচার।

অন্য উপন্যাসের মত বুদ্ধদেব বসুর "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটিতে তরুণ কবিকে উপন্যাসের নায়ক করেছন। উপন্যাসের প্রথমে পার্থপ্রতিমের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়, নবাগত ছাত্রী শ্রীলতা কলেজে এসে এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম

পুরস্কার লাভ করে। শুরু হয় শ্রীলতাকে নিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা বিনিময়। শ্রীলতা ইংরাজী মিডিয়াম স্কুল থেকে এসেছিল, এখন সে ইংরাজী অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

কলেজে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতই পার্থপ্রতিমের সঙ্গে শ্রীলতার পরিচয় হয়। পরিচয়লগ্ন থেকেই বন্ধু মহলে জোর গুজব রটে যায়। কলেজে শ্রীলতার বাড়িতে পার্তপ্রতিম এবং পার্থপ্রতিমের বাড়িতেও শ্রীলতার আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রেমের প্রথম সোপান রচিত হয়। শ্রীলতা পার্থকে না দেখলে পত্রের দ্বারা অনুশোচনা জানায়। এরপর পার্থপ্রতিমের মা ইন্দ্রার আদর তাদেরকে আরো কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে। পার্থপ্রতিমের মা পরোক্ষভাবে তাদের এই প্রেম সমর্থন করে। কিন্তু পার্থপ্রতিম অন্য প্রকৃতির ছেলে। শ্রীলতার সঙ্গে মেলামেশা করে বুদ্ধির আলোয় বুদ্ধিভ্রষ্ট ও আবেগ তাড়িত হয়ে শ্রীলতাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। পার্থপ্রতিম বাস্তববাদী ও দরিদ্র ঘরের ছেলে। সুতরাং নিজের অচেতন মন শ্রীলতাকে ভালোবাসলেও নিজের আর্থিক অবস্থার কারণে ভালোবাসার প্রস্তাবটি দিতে সে ভয় পেয়েছিল। অন্যদিকে শ্রীলতাও ছিল বুদ্ধিমতি উদার মনের মেয়ে। শ্রীলতা ছিল মাতৃহারা, দাদা ও বৌদির যত্নে লালিত মেধাবী মেয়ে। পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার প্রেম উপন্যাসের শেষ শিরোনাম - "অতিরিক্ত" অধ্যায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

শ্রীলতার দাদা কুমুদবাবু পার্থপ্রতিমকে বিয়ের ব্যাপারে পত্র দ্বারা প্রস্তাব পাঠায়। পার্থপ্রতিম এর উত্তর না দিয়ে তাদের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। উপন্যাসের শেষ অংশে মা ইন্দ্রার সহযোগিতায় ও পরামর্শে বিয়েতে পার্থপ্রতিম সম্মতি জানায়।

এই উপন্যাসে পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার মধ্যে ভালোবাসার সহজ সরল, মার্জিত ও রুচিসম্মত আচরণের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। "ভালোবাসি" এই কথাটি নায়ক-নায়িকা দুজনে সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেউ বলতে পারে নি। পত্র দ্বারা শ্রীলতা পার্থপ্রতিমকে জানিয়েছে-

"আমার সবকিছুর প্রতি তোমার সমান অধিকার।" -১৭

এই কথা দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর চরিত্র চিত্রণের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের গঠন ও চিন্তাধারায় কেন্দ্র সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়। পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার প্রেম ছিল বুদ্ধদেব বসুর মনের অনুভূতি দিয়ে সাজানো। লেখক তাদের প্রেম কাহিনীর পরিণতির দিক লক্ষ করে ঘটনাগুলিকে যেন পরপর সাজিয়েছেন। অন্যান্য উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের এলোমেলো মনোভাব, যৌন কামনার উচ্ছলতা থাকলেও এই উপন্যাসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। দাম্পত্য জীবন বাঁধার আগে নায়ক-নায়িকাদের প্রণয় নিবেদনকে কেন্দ্র করে নির্লজ্জ অবৈধ প্রেম উপন্যাসে দেখা যায় না। পার্থপ্রতিম কোন অবস্থাতেই শ্রীলতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় নি। বরং এবিষয়ে খানিকটা উভয়ের মধ্যে সঙ্কোচ লক্ষ করা যায়। শ্রীলতার মধ্যে বধূ জীবনের অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যকে বুদ্ধদেব চিরন্তন সাধারণ নারীর মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছেন। শেষ একটি পত্রে শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিমকে সম্মতি জানিয়েছে।

"যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে দেহ কামনার ও গভীর যৌন আকর্ষণ থেকে বুদ্ধদেব বসু নিজেকে সংযম রেখেছিলেন। যার ফলে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। পার্থপ্রতিম সবসময় একটা আবেশের মধ্যে থেকে প্রেমিকাকে বোঝার চেষ্টা করেছিল। পার্থপ্রতিমের মনে অহঙ্কার ছিল, যে অহঙ্কার এই উপন্যাসে প্রেমের বিরহের ভাবটি প্রকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

আবার পার্থপ্রতিম শ্রীলতাকে গ্রহণ করার জন্য কবিতা লেখে। শ্রীলতা ছিল পার্থপ্রতিমের জীবনের একমাত্র ভরসা। বুদ্ধদেব বসু পার্থপ্রতিমের মধ্যে পুরুষোচিত কোন লক্ষণ দেখান নি। শ্রীলতা তার মাকে হারিয়ে দাদার কাছে মানুষ হয়েছিল এবং দাদা কুমুদবাবু সবসময় স্নেহ আদরে বোনকে বড় করে তোলে। বিয়ের পরে শ্রীলতার মনোভাব সে উপলব্ধি করে। পার্থপ্রতিমকে কুমুদবাবু নিজের বোনের বিয়ের প্রস্তাব দিতে দ্বিধা করে নি। কুমুদবাবু তার উদার মনের গভীরে পার্থপ্রতিমকে মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিমকে বিয়ের প্রস্তাব না দিলেও উভয়ের আকর্ষণ ছিল না, একথা বলা যায় না। পার্থপ্রতিমের বিধবা মাকে নিয়ে সবসময় বাড়িতে থাকতে চেয়েছে শ্রীলতা। তাদের এই সম্পর্কে অর্থনৈতিক অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়াবে এই বোধ ও বিবেক পরীক্ষা করার জন্য পার্থপ্রতিম হয়তো সরাসরি শ্রীলতাকে বিয়ে করতে রাজি হয় নি। তাছাড়া পার্থপ্রতিম ভেবেছিল তার মতো বেকার যুবকের পক্ষে বিয়ে করা মুখে তোলাই ছিল বোকামী। এদিকে প্রেমের গভীরতার দিক দিয়ে শ্রীলতাই ছিল পার্থপ্রতিমের

জীবনের প্রেমের কমল। যে কমলকে হাতের মুঠোয় আনতে পার্থপ্রতিম অনাগ্রহী ছিল। প্রেমের পূর্ণতার আগে নায়িকার মধ্যে অর্ন্তজ্বালার দিকটা বুদ্ধদেব উপন্যাসে দেখিয়েছে। বিচ্ছেদ বেদনা প্রেমকে মৃত করে। প্রেমের গভীরতার মধ্যে নায়িকা সবসময় প্রহর গুণেছে। তার অন্ত বেদনার কথা দাদা না বললেও পার্থের পাহাড়প্রমাণ ব্যক্তিত্বের কাছে শ্রীলতার একটা দুর্বলতা ছিল। পার্থপ্রতিম একবার না করলে সহজে ফিরবে না এ ধারণা ছিল শ্রীলতার। শ্রীলতাও পার্থপ্রতিমের বিরহ বেদনা, উপন্যাসে একটা আলাদা সুর এনেছে যা অন্য উপন্যাস থেকে আলাদা স্বাদের। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে দুটি চরিত্রকে প্রেমের যথার্থ মূল্য দিতে শিখিয়েছিলেন। আর এই মূল্য রক্ষা করতে গিয়ে তারা কখনও দুঃখ, কখনও নিঃসঙ্গতা, আবার কখনও বিয়ের আলাপের ব্যাপারে সবসময় জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের মধ্যে দিয়ে তারা দিন কাটিয়েছে। পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতার প্রেম পবিত্র মনের উপহার। শ্রীলতা অন্তর দিয়ে পার্থপ্রতিমকে চিনেছে, পার্থপ্রতিমও দেখেছে শ্রীলতাকে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে নায়ক নায়িকাকে একই মেরুর মধ্যে রেখে যেন বিরহকে প্রবল করার মানসিকতা দেখিয়েছেন। লেখক শেষের দিকে দুটি পত্র লিখনের মাধ্যমে দুটি চরিত্রের মিলন এনেছিলেন।

উপন্যাসে পরিণত চরিত্র এঁকেছেন বুদ্ধদেব বসু। প্রেম কাহিনীর পরিণতি বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে স্থির করে দেখিয়ে ছিলেন, তিনি প্রেমের চূড়ায় উঠতে নায়ক নায়িকাদের প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব কোন বিরহমনা চিন্তাধারা উপন্যাসে দেখান নি। বুদ্ধদেব চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরফলে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের চরিত্র তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল ।

"পরিক্রমা" উপন্যাসটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক- ডি.এম.লাইব্রেরী, কোলকাতা। ক্রাউন সাইজ, ৪ + ২০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য - দুই টাকা।

"পরিক্রমা" উপন্যাসটি আটটি খণ্ডে বিভক্ত। তিনটি দম্পতির ঘটনা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী রচিত। এই তিনটি পরিবার হলো- বরুণা ও প্রশান্ত, সুমিতা ও বিজন ও কুমকুম- মল্লিকা। উপন্যাসের প্রথমে রয়েছে বরুণার পরিবারের ছবি। বরুণা ও প্রশান্তর একমাত্র মেয়ের নাম বাবলি। বাবলির জন্মদিনের আয়োজন উপন্যাসের প্রথমেই দেখি। প্রশান্ত পেশায় কলেজের অধ্যাপক। তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ ছিল না।

কারণ বরুণা প্রথম জীবনে সোমনাথকে ভালোবেসেছিল। বরুণার বিয়ে হলেও তার বাড়িতে সোমনাথ যাতায়াত করত। বরুণা ও সোমনাথ এখন বন্ধু। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে তারা আগের জীবনের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন বরুণার ননদ সুমিতার সঙ্গে সোমনাথের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানেও সোমনাথ ব্যর্থ হয়। সুমিতা বিজন ঘোষ নামে এক পিশাচ শ্রেণীর ধনী মানুষকে বিয়ে করতে মনস্থ করে। এর পর দেখি বিজন ঘোষের পরিবার। বিজন ঘোষ আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী কিন্তু শিক্ষা তার মধ্যে ছিল না। তার রুচি ছিল নিম্নমানের। তার সঙ্গে কথা বলা যায় না। সে দুরন্ত গতিতে যেন সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। এদিকে সোমনাথ উদার মনের মানুষ, তার মনে ঈর্ষা নেই। উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত এই চরিত্রগুলির কোন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠেনি। বরুণা ও প্রশান্তের সুখের সংসারে সোমনাথ কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। সোমনাথ পরোক্ষভাবে বরুণাকে দিয়ে সুমিতাকে পেতে চেয়েছিল। সোমনাথ উপন্যাসের প্রথম পর্ব থেকে অষ্টম পর্ব পর্যন্ত নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছে। এখন সোমনাথ প্রশান্তের বোন সুমিতাকে পেতে চায়। এদের মাধ্যম ছিল বরুণা কিন্তু সুমিতা বিজন ঘোষকে ভালোবাসে। সুমিতা সোমনাথের কাছে একথা অকপটে স্বীকার করেছিল। বিজন ঘোষ নির্বোধ ও অর্থলোভী ছিল সুতরাং এরকম ব্যক্তিত্বকে সুমিতা বিয়ে করুক তাতে সোমনাথের ইচ্ছা ছিল না। এই ভালো মন্দের বিচার সুমিতার মধ্যে দেখা যায় নি। কারণ সুমিতা ধনীর মেয়ে। জীবনে সুখী হবার একমাত্র শর্তই ছিল তার কাছে টাকা। সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছিল বিজন ঘোষের কাছে। সোমনাথের দৃষ্টিতে সুমিতার মন, বুদ্ধি, আত্মা কিছুই ছিল না; শুধু ছিল তার শরীর। সোমনাথ ভেবেছিল সুমিতা তার কাছে আগুনের বন্যা। সে এতদিন সুমিতাকে ভালোবাসত এটাই তার কাছে লজ্জার। এখন বাকি জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়েছে সোমনাথ। এক সময় সোমনাথ ভেবেছিল সুমিতাকে বিয়ে করে সে সুখী হতে চায়। এখন সংসারকে সে ঘৃণা করে। এর পরে দেখি কুঙ্কুম ও মল্লিকার সংসারে কোন অশান্তি না থাকলেও তাদের আচরণ খুবই সুখের ছিল না। তারা দুজনেই পরস্পরকে ভালোবাসলেও তাদের সেই ভালোবাসার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। সবসময় তারা নিজের সংসারের বিভিন্ন আয়োজনে উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। উপন্যাসের শেষে আবার বরুণা ও প্রশান্তের মেয়ের জন্মদিনে সকলে উপস্থিত হয়েছে। উপন্যাসে সুমিতা ও সোমনাথের সম্পর্কটা কোথায় গেল তার একটা ইঙ্গিত বরুণা দিয়েছিল। লেখক এই অনুষ্ঠান বাড়িতে তাদের সম্পর্কে বলেছেন -

"সোমনাথের হঠাৎ একবার নিস্বাস আটকে এল, সেই সূক্ষ্ম সৌরভে। কি সুন্দর, সে ভাবলে, কী সুন্দর।

দাদার এখানে এসে একটু যে নিজের মনে থাকব তার কি উপায় আছে ! বললে সুমিতা।

ঐ সোমনাথ -

সুমিতা দরজায় টোকা দিল

ঐ এলো, বললে বরুণা দত্ত।" -১৮

"আমার বন্ধু" উপন্যাসটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে "পরিচয়" পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী। উপন্যাসটি শ্রী প্রভু গুহঠাকুরতাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ক্রাউন সাইজ। ৪ + ১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য - ৪টাকা।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু দুটি চরিত্রকে নিয়ে যেন গল্প করেছেন। লেখকের বাল্যকালের স্মৃতির বিবরণ এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের বন্ধু লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছে। তার বন্ধুর নাম ভবভূতি।

উপন্যাসের প্রথমেই ভবভূতি ও রামতনু মজুমদার নামে দুটি চরিত্রকে পাই। এই উপন্যাসে গৌণ চরিত্রের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। মূল চরিত্রের পাশে এদের অবস্থান অস্তিত্বহীন বলে মনে হয়। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু রামতনু মজুমদারের জবানীতে কথা বলেছেন। রামতনু ভবভূতির বাল্য বন্ধু। ভবভূতি ছিল অতি দরিদ্র ও রোগগ্রস্ত, কিন্তু তার সাহিত্য রচনার অভিপ্রায়ের অন্ত নেই। ভবভূতি বিভিন্ন লেখা নিয়ে বন্ধুকে দেখিয়েছে। লেখক হবার যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল না। লেখা উচ্চমানের নয়, কল্পনা শক্তির গভীরতা ছিল না। দুর্বল ও মাঝারিমাপের কিছু চরিত্রকে অবলম্বন করে ভবভূতি গল্প লিখেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই কবি মধুসূদনের কথা উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। কারণ তাঁর সঙ্গে ভবভূতি সাহিত্য লেখার সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। এই পটভূমিকায় সে সাহিত্য রচনা করে। বাল্যকালের বন্ধু, শ্রেণী সাথী ভবভূতির দীর্ঘকাল যাবৎ লেখকের সঙ্গে পরিচয় নেই। ভবভূতি ছাত্র হিসাবে নিতান্তই সাধারণ মানের। ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে সে সংসার জীবনে নেমে পড়ে। ভাগ্যের জোরে ভবভূতি সওদাগরী অফিসে চাকুরী পায়। এক সময় দরিদ্রতা ভবভূতির জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। এখন সে বিয়ে করেছে। স্ত্রী, পুত্র, সন্তান নিয়ে সে ভাড়া বাড়িতে বাস করে।

আলো বাতাসহীন স্যাঁতস্যাঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘকাল বসবাসকালে ভবভূতি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। রোগে এখন সে শয্যাশায়ী। বাড়ির পরিবার পরিজন তাকে ডাক্তার দেখাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ভবভূতির মনে চলে নীরবে কবিত্বের সাধনা। কাউকে তার লেখার কথা বলতে পারে না। ভবভূতির লেখার মান উচ্চ না হলেও তার মধ্যে উৎসাহ ছিল। বর্তমানে ভবভূতিকে যক্ষ্মা রোগ গৃহন্দী করেছে। তার জীবনের কোন আশার আলো ভবভূতির মা বা ডাক্তাররা দেখতে পায় না। এই মুমূর্ষু মুহূর্তে রামতনুকে দেখে ভবভূতির বাল্যকালের সাহিত্য লেখার সুপ্ত বাসনা উৎসাহিত এবং পল্লবিত হয়েছিল। ভবভূতির লেখা কবিতা ছিল পত্রিকায় ছাপানোর অনুপযোগী। কিন্তু তার প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ভবভূতির লেখা পাণ্ডুলিপিটি উৎসর্গ করা হয়েছিল এইভাবে -

"শ্রী রামতনু মজুমদারকে
আমার এই দীন প্রচেষ্টা
উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম"

এই পাণ্ডুলিপিটি ছাপানোর জন্য ভবভূতি রামতনুকে দিয়েছিল। ভবভূতি ছিল অনুভূতিহীন মানুষ। তার অনুভূতিতে কোন কুণ্ঠা ও বিচারবোধ ছিল না। অশান্তিময় জীবনে সাহিত্যকে নিয়ে সে বাঁচতে চেয়েছিল। সাহিত্য জ্ঞান ছিল ভবভূতির সীমিত। ভবভূতির মধ্যে যা আছে তা হল, সাহিত্য সৃষ্টির অতিরঞ্জিত, হাস্যকর ও মজ্জাগত আবেগ। ভবভূতির সাহিত্য লেখার উচ্ছ্বাস শুনতে গিয়ে রামতনু বিরক্ত হয়ে ওঠে।

রামতনু বন্ধুকে লেখায় বাধা দিতে চায় নি। কিন্তু রামতনুর মিথ্যা পাণ্ডুলিপি ছাপানোর নমুনা ভবভূতি বুঝতে পারে। এখন মৃত্যু ভবভূতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। বন্ধুকে তার লেখা পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিয়ে সে যেন মুক্ত হয়েছে। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে ভবভূতি ভুল বুঝতে পারে। বাস্তবকে বাদ দিয়ে সে যেন এতদিন পাগলামি করেছে। তবু তার অচরিতার্থ মনের বাসনা থেকে গেল। জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন, তার নমুনা ছিল পাণ্ডুলিপিটি - সে কথা তিনি ভুলতে পারে নি। কারণ ভবভূতির লেখা পাণ্ডুলিপিটি ছিল ছাপার অযোগ্য। এই সত্য কথাটি রামতনু তাকে বলতে পারে নি। এইভাবে অসুস্থ শরীরে, দুর্বল কল্পনা শক্তি নিয়ে ভবভূতি ৩১২ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিল। সে রামতনুকে এই পাণ্ডুলিপি ছাঁপানোর অনুরোধ

করে। রামতনু-পাণ্ডুলিপিটি ছাপানোর দায়িত্ব নেয় এবং এটি ভবভূতির সর্বোচ্চ শ্রেণীর লেখা দাবী করে। শেষ পর্যন্ত রামতনু ভবভূতিকে বোঝাতে সক্ষম হয়। অনেক বন্ধুর আশ্রয়ে রামতনু ঐশ্বর্য্যবান হলেও ভবভূতিকে নিয়ে সে চিন্তায় পড়েছিল। ভবভূতির সাহিত্য লেখার ঝোঁক ছিল পাগলের আচরণের মত। ভবভূতি তার দরিদ্র ও কৌতূহলী মনোভাবের সঙ্গে আসল কথাটি কাউকে বলতে পারে নি। শেষে রামতনু একটি মিথ্যার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। রামতনু এক টুকরো কাগজ ছাপানোর নমুনা ভবভূতিকে দেয়। তাতে লেখা ছিল একটি পত্রের নাম ও লেখকের উৎসর্গকৃত নমুনা ঃ

বঙ্গের সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
বহুদূর বিস্তারী যশের অধীশ্বর,
অতুলনীয় লেখনীর অধিকারী
নিরহংকার, নির্মল চিত্ত
স্নেহময়, হৃদয়বান
আমার শ্রেষ্ঠ
বন্ধু

তবু রামতনুর প্রতি ভবভূতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে এই লেখাটা যাতে ছাপানো হয়, এবং সে আরো ভালো বই লিখবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রামতনুর চোখের সামনেই ভবভূতি মারা যায়। বন্ধু ভবভূতির সাহিত্য লেখার প্রতি একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, সততা রামতনুর মনে এক নূতন অনুভূতির সঞ্চার করেছিল।

"আমার বন্ধু" উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে ভবভূতিকে দাঁড় করিয়ে তার মনের বেদনা ও আকস্মিক চেতনাকে বুদ্ধদেব অনেক বেশী তাৎপর্য দিয়েছিলেন। ভবভূতি ছিল সাহিত্যিক। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে লেখকের সুগভীর পরামর্শ সে অনুভব করেছে। বুদ্ধদেব ভবভূতির পাণ্ডুলিপি ছাপানোর মধ্যে দিয়ে নিজের ব্যক্তি জীবনের প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কের যেন স্মৃতি তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে ভবভূতির মতো দরিদ্র মানুষের মধ্যে দিয়ে লেখক হবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

<u>ঙ) প্রেম ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ঃ</u>

"অদর্শনা" উপন্যাসটি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, কোলকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, দেব সাহিত্য কুটির, কোলকাতা। এই সংস্করণে "অদর্শনা" নামটি পরিবর্তিত হয়ে "তুমি কি সুন্দর" নামকরণ হয়েছিল। এই উপন্যাস থেকে বুদ্ধদেবের চরিত্র নির্মাণের সাবলীলতা ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় লক্ষ করা যায়। চারটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী রচিত। মানসকুমার পালিত, সরোজ, কালীতারা ও মালবিকা - এই উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই উপন্যাসে মানসকুমার পালিত উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

এই উপন্যাসের পর্ব বা খণ্ড দ্বারা বিভাজন দেখানো হয় নি। যা বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসে দেখা যায়। এখানে তিনটি তারকা চিহ্ন দ্বারা পর্বভাগ করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমে বিখ্যাত সাহিত্যিক মানসকুমার পালিতের সাক্ষাত পাই। বাংলা সাহিত্যে মানসবাবুর নাম সর্বজনবিদিত। তার খ্যাতি ও সম্মান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এলাকার আদর্শবান মানুষ হিসাবেও সে বিখ্যাত হয়েছিল। উপন্যাসের প্রচলিত ছক থেকে বেরিয়ে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে প্রেমের সৌন্দর্যের বিশেষ রূপটি প্রকাশ করেছে।

মানসবাবু ছিল সেতার সঙ্গীতের নিয়মিত শ্রোতা। বেতারে নাম শুনে, দর্শন না পাওয়া গায়িকার প্রতি তার অনুরাগ জন্মায়। ঐ গায়িকাকে কাছে না পেলেও মানসবাবু হৃদয়ের মাঝে তাকে অনুভব করে। ঐ গায়িকার গান মানসবাবুকে অভিভূত করে।। সেই অদর্শনা গায়িকার নাম ছিল মালবিকা রায়। মালবিকা দক্ষিণ আলিপুরের এক উকিলের মেয়ে। অভিজাত পরিবারে সে প্রতিপালিত হয়েছিল। রূপে গুণে তার খ্যাতি বেতার জগতে ছড়িয়ে পড়ে। এই মালবিকা ছিল স্বপ্ন শয়নে তার গানের প্রেয়সী।

মালবিকার বান্ধবী ছিল কালীতারা। এই কালীতারার সঙ্গে কোন অনুষ্ঠানে মানসের পরিচয় হয়। এখন সে মানসের প্রিয় বান্ধবী। আবার কালীতারার মাধ্যমে ওই মহাশিল্পী মালবিকার সঙ্গে মানস পালিতের পরিচয় হয়। ক্রমে তাদের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কালীতারার চেহারা ছিল কুৎসিত। নামের সঙ্গে তার চেহারার নামকরণ বলে মনে হয়। ক্রমে কালীতারা সাহিত্যিক মানস পালিতকে ভালোবাসতে লাগল। এই ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে একটি নূতন গতি এনে দিয়েছিল। উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা

দেখেছি কালীতারা ও মালবিকার মধ্যে একটি গোপন চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিটি হল মালবিকা নাম ধরে কালীতারা বেতারে গান করবে, কিন্তু এই গানের চুক্তিটি সে সারাজীবন গোপন রাখবে। একদিন গোপন চুক্তি সকলে জানতে পারে। জনমানসে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ পায়। এই ঘটনার কথা কালীতারা মানসবাবুর কাছে স্বীকার করে।

উপন্যাসের শেষে দেখি কালীতারা ও মানস পালিতের মিলন দৃশ্য। তার স্বপ্নের গায়িকা আজ তার হাতের মুঠোয় মধ্যে এসেছে। এই নিয়ে উপন্যাসের আরেকটি উপকাহিনী লক্ষ করি। সেটা ছিল মালবিকা ও সরোজের মিলন। মালবিকা ও মানস পালিতের একটা বন্ধুত্বের গভীরতা দেখা গেলেও অন্তর দিয়ে মালবিকা তাকে মেনে নেয় নি। তাই সরোজ মালবিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাত্র সে তা গ্রহণ করে। সরোজ ছিল লোভী মনের মানুষ। সে ছিল পরশ্রীকাতর ও বড়লোকের ছেলে। পরিণামে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের দিন মালবিকাকে ফুল উপহার দিয়েছিল মানসপালিত, অন্য উপন্যাসের নায়কের মতো এখানে মানসকে হিংসাপরায়ণ হতে দেখি না। মানস-মালবিকার দেহকে নয় সে তার গানকে ভালোবেসেছিল। সুতরাং মালবিকা ও সরোজের বিবাহ-দিনে উপস্থিত হয়ে তাদের মিলনের সৌন্দর্য মানস দু-চোখ ভরে দেখেছিল। এখানেই মানসের চরিত্রের স্বতন্ত্রতা।

মানস চরিত্রটিকে বুদ্ধদেব বসু সৌন্দর্য্যের মূর্তিমান পুরুষ হিসেবে দেখিয়েছিলেন। সে মালবিকাকে সুরে ভালোবেসেছিল, রূপে নয়। মানসের কাছে এতদিনের সুরের গোপন চুক্তি জানার পর তার আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। মানস এতদিন অজানা পথে চলেছিল। কিন্তু আজ সেই সুরের দেবী ভেসে উঠল চোখের সামনে। মানস এই সুর মূর্তিকে কোনদিন চোখের সামনে দেখতে পাবে বলে মনে করে নি, কারণ গানই ছিল মানস পালিতের কাছে একমাত্র সুন্দর, রূপের মধ্যে নয়। সুরের মধ্যে যার অবস্থান সেই মনের পূজারী ছিল মানসপ্রতিম। এখন নিজে গিয়ে সে কালীতারার ছদ্মবেশ গ্রহণ করল। দূরের অদেখা গান ঝড়ের মতো তার মনকে আরেকবার ঝাঁকিয়ে দিল। আঁকাবাঁকা অজানা পথে ঘোরাফেরা সুর আজ সে নিজের হাতে গ্রহণ করল। এখানে যেন তার সুর দেবীর কাছে লেখকের আরেকবার পরাজিত হওয়া। কালীতারা কুৎসিত ছিল ঠিকই কিন্তু তার মনের ভিতর যে সঙ্গীত ভুবন ছিল তা

অপরূপ। তার মূল্য মানসপ্রতিম দিয়েছিল। তাই মানস নিজের জীবন সঙ্গিনী রূপে কালীতারাকে বরণ করে নিল।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু একটা সঙ্গীতের অচেতন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, যা সাহিত্যিক মানস পালিতের মধ্যে সুন্দর একটা সুরের জগৎ কল্পনা করালেন। এই সৌন্দর্য্য দেহাতীত যা প্রেমকে অতিক্রম করে গেছে। মানস মালবিকাকে যে ভালোবাসতেন, মালবিকাও তা অনুভব করতো। কিন্তু মালবিকার মধ্যে সবসময় একটা দুর্বলতা কাজ করছিল। মানস যখন মালবিকার সঙ্গীতের প্রশংসা করে তখন সে ইচ্ছা করে এড়িয়ে যায়। তাই সরোজকে বিয়ে করতে মালবিকা দ্বিধা করে নি। মানসকে নূতন সঙ্গীতের সুর বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। আর এই হাতছানির অন্তরালেই ছিল কালীতারা। কালীতারার মুখে সমস্ত শোনার পর মানস তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসে। সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল মানসের সুর সৌন্দর্য্যময় একটা উজ্জ্বল মনের আদর্শ। এখানে উপন্যাসটির স্বতন্ত্রতা বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন।

"বাসরঘর" উপন্যাসটি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। প্রকাশনা ডি.এম. লাইব্রেরীর পক্ষে, গোপালদাস মজুমদার, কোলকাতা। ক্রাউন সাইজ, ১+২০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য - ৪টাকা। উপন্যাসটি ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ড ঃ অনেক দিনের মধ্যে একদিন

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ আরো একদিন

তৃতীয় খণ্ড ঃ বাড়ি

চতুর্থ খণ্ড ঃ কালপুরুষ

পঞ্চম খণ্ড ঃ উত্তরায়ণ

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ নতুন সূর্য

এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র পরাশর ও কুন্তলা। তারা দুজনেই পরস্পরকে ভালোবাসত। সাবেকী আমলের ধ্যান ধারনায় তারা বিশ্বাসী ছিল। আধুনিক যুগের রীতি নীতি গ্রহণ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। কুন্তলার সদিচ্ছাতে পরাশরকে সে ভালোবেসেছিল। এই ভালোবাসাকে কুন্তলার মা বিয়েতে সমর্থন জানায়। কুন্তলার মধ্যে সামাজিক দিক দিয়ে খানিকটা দোটানা ভাব দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত কুন্তলা ও পরাশরের বিয়ে হয়। কুন্তলা খেয়ালী ও আবেগপ্রবণ মেয়ে। সে যেন সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। কুন্তলা বিয়ের পর থেকে স্বামীর ব্যবহার নিয়ে তার মনে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সে স্বামীকে পুরোপুরি নিজের করে নিতে পারে নি। এ নিয়ে সমাজ কি ভাববে তা তার কছে বড় কথা নয়। তাই সে স্বামীর কাছ থেকে অতি সতর্কতার সঙ্গে দূরে সরে থাকতে চায়।

বিয়ের পর কুন্তলা অনুভব করেছে স্বামী তাকে কাছে পেতে চায়। এই মনোভাবকে কুন্তলা ঘৃণা করে। বিয়ের পর কুন্তলা ও পরাশর কেউই দাম্পত্য জীবনকে ঠিকমতো মেনে নিতে পারে নি। কুন্তলার পক্ষ থেকে বার বার প্রত্যাখান পরাশরকে আঘাত করেছিল। তাই জোর করে পরাশর কুন্তলার সঙ্গে দেহ মিলনে লিপ্ত হয়েছে। পরাশরের পক্ষ থেকে কুন্তলার এই উদাসীনতা তাকে বীতশ্রদ্ধ করে। তাই উভয়ের দিক থেকে সমাজ সম্পর্কে অতি সতর্কতা লক্ষ করা যায় না। এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত দুটি চরিত্রকে পরস্পরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। শেষে পরাশর ও কুন্তলা ভুল বুঝতে পারে। তারা দাম্পত্য জীবনকে আরো ভালোভাবে মেনে নিল। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেবের নাগরিক প্রেমের ধারণা বিরহের আগুনে শুদ্ধ হয়ে গভীরতম ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

"বাসর ঘর"-এ মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, এখানে কবিতারই অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য।" -১৯

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা করেছেন। সমাজ জীবন এই উপন্যাসে তেমনভাবে স্থান পায় নি। ফলে সমাজ জীবন বহির্ভূত এক কল্পলোকে নর-নারীদের নিয়ে "বাসরঘর" উপন্যাসে কাহিনী তৈরী হয়েছে। এই কল্পলোকের বৃত্তের মধ্যেই নায়ক নায়িকারা চলাফেরা করেছে। তাই তারা কখনও নিঃসঙ্গ ও একাকীত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেছে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের এক খণ্ড রবীন্দ্রনাথকে মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন-

"তোমার গল্পের বিশেষত্ব এই যে, যেখানে শেষ হলো বই, গল্প রয়ে গেছে তার পরের দিকে। দেখালে প্রবল ভালোবাসার আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের মধ্যেই অনিবার্য হিংস্রতা, যুগ্ম জ্যোতিষ্কের পরস্পর আকর্ষণের মধ্যে দূরত্ব থাকলে তাদের যুগলযাত্রা নিরাপদ হোত, আবেগের দুর্দ্দমতায় সেইটে কমে গিয়ে আসন্ন প্রলয় সংঘাতের আশঙ্কা উগ্র হয়ে উঠল। এই তোমার গল্প-না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছো সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে। একটা কথা বলে রাখি, কুন্তলা নামটা ভালো লাগল না। কুন্তলা মানে চুল, আ-কার যোগ করে তাতে স্ত্রীত্ব আরোপ করা বৃথা।" -২০

বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের ২৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন -

"বাসর ঘর বইটা আমি যেমন করে কল্পনা ও রচনা করেছি তার মধ্যে একটু অভিনবত্ব অবশ্যই আছে। গল্পকে আগাগোড়া বর্জন করে গল্প বলা। আমার নিজের কথা বাদ দিয়ে বলতে পারি, এই ধরণের রচনা যে উপন্যাস বলে গ্রাহ্য, এই ধারণাই দেশের অনেক লোকের মনেও নেই। অথচ ভবিষৎ বাংলা উপন্যাসের যে-সব রাস্তা খোলা দেখতে পাচ্ছি এটা তার মধ্যে অন্যতম। কুন্তলা নামটি সম্বন্ধে আপনার আপত্তি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। - কথাটা শুনতে ভালো, কুন্তি ডাকতে ভালো, সেজন্যই নিয়েছিলাম - মানের কথা অত ভাবিনি। নাম নির্বাচনে মনের চোখ-রাঙানিকে আমাদের বাঙ্গালীদের বড় বেশি মেনে চলতে হয়, এটা খুব সৌভাগ্যও বিবেচনা করিনি। নামের ধ্বনিই আসল।" - ২১

বুদ্ধদেবের এই বাসর ঘর উপন্যাসে কুন্তলা ও পরাশরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা মানসিক দ্বন্দ্ব। সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। বুদ্ধদেব বসু মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা দিয়ে চরিত্র দুটিকে অঙ্কন করেছেন। দুজনের রাগ ও ক্রোধ মূলতঃ এক পশলা বৃষ্টির মতো। ভালোবাসার উপর তাদের কোন রাগ ছিল না। আবার তাদের দ্বন্দ্বে বাইরের সাহায্যকেও তারা নিতে অস্বীকার করেছে। তারা উদাসীন ভাবে যেন একে অপরের উপর অভিমান করেছে। জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী সংঘাতে যখনই ভুল বুঝতে পেরেছে, তখনই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের নর নারীর বিশেষত্ব তাদের মধ্যে দেখা যায় না। তারা যেন বুদ্ধদেবের কল্পনার ও প্রেমের ইন্দ্রজালে বিচরণকারী প্রেমিক প্রেমিকা। কিন্তু আসলে তারা দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়া স্বামী-স্ত্রী। প্রতিদিনের পরিবারিক জীবনের যে সাধারণ ব্যাপার থাকে বুদ্ধদেব সেই কামনা ও ভাবনার নকশা এই উপন্যাসে বিস্তার করে চলেছিলেন। তারা দুজনেই যেন আত্মভোলা নর-নারী। দাম্পত্য জীবনের ঘেরাটোপে তারা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সবকিছু ভেঙ্গেচুরে একটা নূতনত্বের পথে তারা যেন ছুটে চলেছিল। এই উপন্যাসে শহরের জীবন কথা ছিল না। আবার পাড়াগাঁয়ের লোকের কথাও ছিল না। লেখক উপন্যাসে যেন একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নর-নারীর মনকে বিশ্লেষণ করেছেন। নিঃসঙ্গ, গভীর এক স্রোতহীন সমাজ কল্পনা করে লেখক নর-নারীর হৃদয় পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসে মানব মনের একটা বিশেষ ভাব বা বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কুন্তলা ও পরাশরের বিবাহিত জীবনের মুহূর্তগুলি বুদ্ধদেবের কবিত্বপূর্ণ সংলাপে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টির মাঝে চরিত্রদুটিকে বুদ্ধদেব সবথেকে উজ্জ্বল মনে করেছেন। বুদ্ধদেব বসু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কুন্তলা ও পরাশরের জীবনের অভিমান ও বিচ্ছেদের মূহূর্তগুলি তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৫-১৯৭২)

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বুদ্ধদেবের উপন্যাসগুলিকে আমরা দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। যদিও বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই পর্ব বিভাগ আমরা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে করছি তা নয়। কারণ তাঁর উপন্যাসের বিবর্তনের চেহারাটা খুব স্পষ্ট নয়। তবে এই পর্ব বিভাগকে খুব অযৌক্তিক বলেও মনে করা যায় না। প্রেম, রোমান্টিকতা, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কল্লোলীয় যুগের নরনারীরা কিভাবে বিচরণ করেছিল, তা বুদ্ধদেবের উপন্যাসে দেখতে পাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আরো গভীর, সজীব ও জীবন্তভাবে দেখা গিয়েছিল। প্রথম পর্বের উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন প্রেমের আবর্তে পড়ে দিশেহারা হতে দেখা যায়। উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত চরিত্রগুলি কোন চূড়ান্ত পরিণতি খুঁজে পায় নি। দ্বিতীয় পর্বে কিন্তু তা নয়। এই পর্বে কিছু উপন্যাস আছে যেমন, "মৌলিনাথ", "পাতাল থেকে আলাপ", "শোনপাংশু" ইত্যাদিতে দেহ চেতনা একেবারেই নেই। এখানে যেন বুদ্ধদেব বসু আদর্শ রচনার এক স্বাক্ষর রেখেছিলেন। জীবনাদর্শের এক মহান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তিনি এই সব উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। জীবনকে উপভোগ করেও নর-নারীরা যেন প্রবলভাবে বাস্তবের মাটিতে নেমে এসে একটি বিশেষ আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের উপন্যাস "সাড়া"তে যা দেখি দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে সেই জৈবিক দেহ চেতনার উচ্ছ্বাস থাকলেও, তা প্রবলভাবে ছিল না।

বুদ্ধদেবের এই পর্বের উপন্যাসে প্রেমের উচ্ছ্বলতার মধ্যে দিয়ে লেখক যেন কিছু আবিষ্কার করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, প্রেম বুদ্ধদেবের উপন্যাসের প্রিয় বিষয় ছিল। চল্লিশের দশকের পর থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনি বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়েছিলেন। বিশেষ করে "তিথিডোর" উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই পর্বের উপন্যাসে দেখা যায় প্রেমের প্রত্যক্ষ সজীব ও গাঢ় গভীর অনুভূতি, যা দিয়ে চরিত্রের মনোলোকে বার বার লেখক আলো ফেলতে চেয়েছেন। তিনি চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। এই পর্বে প্রেম মৃদু, হালকা ভাবে দেখা যায়। প্রেমের গতিতে এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে শেষ পর্যন্ত

দিশেহারা হতে দেখা যায় না, কখনো বা প্রেমের পরিবর্তে চরিত্রে নূতন চেতনা দিয়ে লেখক পূরণ করেছেন। এই পর্বে আরো দেখা যায় চরিত্রগুলি যেন বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায় বুদ্ধদেব বসু প্রেমের মধ্যে দিয়ে নূতন জীবনাদর্শকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। উপন্যাসের বিষয় ভাবনা, চরিত্র ও আঙ্গিকে একটি বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ করি।

এবার আমরা দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিকে বিষয়ানুসারে শ্রেণী বিভাগ করবো ঃ ১) চেতনা মূলক উপন্যাস, ২) জীবনাদর্শমূলক উপন্যাস, ৩) দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও নূতন পথের দিশারী, ৪) প্রেমের উপন্যাস, ৫) কুসংস্কার ও প্রেম

১) চেতনা মূলক উপন্যাস ঃ

বুদ্ধদেবের এই চেতনা ধর্মী উপন্যাসে সামজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষের সচেতন হবার প্রয়াস লক্ষ করি। বুদ্ধদেব এই ধরনের উপন্যাসে জীবনের কয়েকটি সুপরিচিত ঘটনাকে একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি যেন সমাজের কাছে বিচার চাইছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানুষ শিক্ষিত হলেও, অন্ধ ধর্মের মোহ পরিবারের সকলকে গ্রাস করে। বুদ্ধদেব এই পর্বে প্রত্যেকটি চরিত্রের উপর পারিবারিক প্রভাব দেখিয়েছেন। তবু পরিবারের কোন সদস্য ঐ কু-অভ্যাসে যোগ দিতে চাইলে অন্য চরিত্র তাকে অনুকরণ করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে পরিবারের কর্তাকে নীরব দর্শকের আসনে বসে থাকতে দেখা যায়। যখন তার বংশের ঐতিহ্য একেবারে শেষের দিকে গিয়ে পৌঁছোয় তখন কোন তৃতীয় চরিত্রের অঙ্গুলি নির্দেশে গোটা পরিবার সমাজ অনুশাসন মেনে চলতে থাকে। যখন চরিত্রগুলির জ্ঞান ফিরে আসে তখন আর কিছু করার থাকে না। এই ধরনের উপন্যাসগুলি হল - "লালমেঘ", "পরিক্রমা", "কালো হাওয়া"। এই বিষয়ধর্মী উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে মানব মনের বিকৃতি লক্ষ করা যায়।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই চেতনা প্রবণতা বলতে প্রধানত কল্লোলের চেতনাকেই বুঝে থাকি। ত্রিশের দশকে এবং চল্লিশের দশকের প্রথম দিকের উপন্যাসে বাংলাদেশে কল্লোলকে আশ্রয় করে একটি সজীব সাহিত্য আন্দোলনের মাধ্যমে একটি তরুণ গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সব চেতনা আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের প্রেক্ষাপটে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। বর্তমান বিষয় পর্ব ভাগে সেই ধর্ম বিভিন্ন

উপন্যাসের মধ্যে কিভাবে এসেছিল তা তুলে ধরবো। বুদ্ধদেব বসু অবশ্যই সেকালের দেশ ও সমাজকে অস্বীকার করেন নি। আবার অনেকে তার উপন্যাস সম্পর্কে একটি অতি আধুনিক অশ্লীলতার অভিযোগ এনে ছিলেন। একথা জনিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, সত্যিকার সৃজনশীল লেখকের মতো বুদ্ধদেব বসু সে কালের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এই চেতনা প্রবণতা এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার পূর্ব মুহূর্ত থেকে। তারই প্রতিফলন বুদ্ধদেবের এই পর্বের সমস্ত উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এই পর্বের উপন্যাসগুলিকে আলোচনা করে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কতটা ফুটে উঠেছে তা আমরা তুলে ধরবো।

"রুকমী" উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। মুদ্রণ, প্রিন্ট ও গ্রাফ- ৯/সি. ভবানী দত্ত লেন, কোলকাতা- ৭৩।

"রুকমী" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর জীবিত কালের প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি লেখার সময় বুদ্ধদেব বসুর শারীরিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। এই বই লেখার আগে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ কন্যাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন -

"পূজোয় একটা উপন্যাস, একটা নাটকের কথা দিয়েছি- আজ যে মাসের মাঝামাঝি হতে চললো, অথচ কোনটাই মনে ধরা দিচ্ছে না - আমার অবস্থা শোচনীয়। টেনে টেনে নাটকটা যদি বা শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি, এ মুহূর্তে উপন্যাস অসম্ভব মনে হচ্ছে। কোন একটা বিবরণ লিখতে হবে, ঘটনা বানাতে হবে ও সাজাতে হবে, তা ভাবতেই যেন ক্লান্তি আসে। ভাবছি সামনের বছর থেকে উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেব - যদিও রোজগার সেটাতেই। " - ২২

"রুকমী" উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ছয়টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আটটি ক্রমিক সংখ্যায় খণ্ডান্তর করা হয়েছে। উপন্যাসের শেষে একটি খণ্ডান্তর অংশ আলাদা ভাবে দেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু ধীরাজ দত্তের জবানীতে বিভিন্ন চরিত্রর সঙ্গে কথা বলেছেন। ধীরাজ দত্ত বারো বছর আগে দার্জিলিং-এ বেড়াতে

এসে যে ঘটনা ঘটেছিল তার স্মৃতি এখানে বলেছেন। বারো বছর পর আবার তিনি দার্জিলিং-এর সেই হোটেলে বেড়াতে এসেছেন। আগে তিনি ছিলেন অবিবাহিতা, এখন পতিতা বাড়ির মেয়ে কমলাকে নিয়ে তার দাম্পত্য জীবন। পূর্ব ঘটনার স্মৃতি দিয়েই উপন্যাসটি শুরু করেছে ধীরাজ দত্ত।

উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে চৌধুরী পরিবার। হরেনবাবু ও, মৃণালিনীর চৌধুরী পরিবারের বর্ণনা ও তার চূড়ান্ত পরিণতি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। হরেনবাবুর এক কন্যাকে নিয়ে সুখের সংসার। মেয়ের নাম রুকমিনী বা রুকমী। রুকমি ছিল আদরের কন্যা। অবনী নামে এক মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায়। এখন সে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। সে ব্যাঙ্গালোরে চাকুরী করে। এই পরিবারের সঙ্গে ধীরাজ দত্ত বেড়াতে গিয়েছিল এবং সেখানেই ধীরাজ দত্তের সঙ্গে অবনীর পরিচয় হয়। ধীরাজবাবু ঔপন্যাসিক হিসাবে বাড়ির সকলের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ক্রমিক খণ্ডান্তরে দেখি রুকমীর সঙ্গে গগনবরণ মুনসীর বিয়ে। পেশায় গগনবরণ একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। রাজনৈতিক মহলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন সুযোগ্য পাত্রের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করে হরেনবাবু গর্ববোধ করে। মেয়ে রুকমীকে সকলে ভাগ্য কপালী বলে প্রশংসা করে। রুকমীকে নিয়ে উপন্যাসে আরো দুটি চরিত্র দেখতে পাই তারা হলো অঞ্জনা ও বিকাশ। কিন্তু তারা উপন্যাসের মূল ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।

রুকমী এখন পাটনায় থাকে। সরকারী কাজে স্বামীর সঙ্গে মাঝে মধ্যে কলকাতায় আসে। বছরে দুবার তারা দার্জিলিং-এ বেড়াতে যায়। অভিজাত, অর্থবান হরেনবাবু বেড়াতে আসার জন্য দার্জিলিং-এ দ্বিতীয় বাড়ি বানিয়েছিলেন। সে সংবাদ ধীরাজবাবুর অজানা ছিল না। বিয়ের পর দার্জিলিং এর পোষ্ট অফিস মোড়ে রুকমীর সঙ্গে ধীরাজবাবুর দেখা হয়। ধীরাজ তাদের সঙ্গে বেড়ানোর সাথী হল। রুকমী গগনবরণের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা দেখছি দার্জিলিং-এর বৃষ্টি ভেজা দিনে গগনবাবু সরকারী কাজে বাইরে চলে যায়। তারই অবর্তমানে রুকমী একদিন ধীরাজবাবুর বাড়িতে এসেছিল। এখানেই উপন্যাসের গতি অন্যদিকে ঘুরে যায়। ধীরাজ এই বৃষ্টি ভেজা দিনে রুকমীকে দিয়ে তার যৌন চাহিদা চরিতার্থ করে। এই

ঘটনায় রুকমী ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়ে। বিশ্বাস ঘাতক ধীরাজের এই আচরণ রুকমী মেনে নিতে পারে নি। নিজেকে সে অপরাধী ও কলঙ্কিনী ভাবতে থাকে। সে তার স্বামীর কাছে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ করে। রুকমী নিজেকে ভাবে সে ব্যর্থ। এই ব্যর্থ জীবন নিয়ে একদিন সে স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। পরে অবনী ঘোষের কাছেও রুকমীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি, কারণ অবনীকে সে প্রথম জীবনে ভালোবাসতো। এই ঘটনার বারো বছর পর সেই ধীরাজ দত্ত পতিতা কমলাকে নিয়ে আগের সেই পরিচিত গোবিন্দ বাবুর হোটেলেই উঠেছে। উপন্যাসের এই বিষয় আলোচনার পর রুকমী চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। রুকমী ছিল সহজ সরল। তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ ছিল। সে সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করতো। তাই সে সহজ সরলভাবে ধীরাজ দত্তের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিল।

রুকমীকে তাঁর স্বামী খুবই ভালোবাসতো। রুকমী এই ভালোবাসাকে ধরে রাখার জন্য তার ধর্ষিত জীবন স্বামীর কাছে দেখায় নি। সে বেঁচে ছিল, না আত্মহত্যা করেছিল তার কোন বিবরণ আমরা উপন্যাসে পাই না। ধীরাজবাবুর মনে সংশয়, জীবনের স্মৃতিগুলি আজ ঘুরে বেড়ায়। রুকমী নিজের কথাই ভেবে ছিল। গগনের মুখের দিকে না তাকিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। এখন এই লজ্জাকর ঘটনা ভণ্ড ধীরাজের মনে পাক খায়। সেইসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন রুকমী নিরুদ্দেশ হয়ে তার আত্মসম্মান ও মানবিক মূল্যবোধ কিভাবে ধীরাজের মত মানুষদের আঘাত করেছিল।

"আয়নার মধ্যে একা" উপন্যাসটি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শেষ হয় এবং ঐ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয়। দে'জ প্রকাশন, মহাত্মা গান্ধী রোড, ৩১/বি. কোলকাতা - ৯। প্রচ্ছদ- দেবব্রত রায়। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, নর্দান প্রিন্টার্স, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা - ৬। মূল্য - ৬ টাকা।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসকে ১৬টি পর্বে ভাগ করেছেন। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু কমলার জীবনের ঘটনাকে রূপ দিয়েছিলেন।। উপন্যাসের প্রথমে দেখি শান্তি মাসির পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার। তার মধ্যে একজন কমলা। কমলা বিধবা নারী। অল্প বয়সে স্বামী মারা যাবার পর থেকে মাসির বাড়িতে থাকে। বাড়ির সকলের কাছে সে ঘৃণ্য ও অবজ্ঞার পাত্র। বাড়ির প্রত্যেকে তার দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্ত নিলো। পাত্র হিসেবে মেশোমশাইয়ের অফিসে বিনোদ নামে উদার, স্বাধীনচেতা যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ

ঠিক হয়। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তার জীবনে নেমে আসে লম্পট অম্বু। অম্বু ছিল শান্তি মাসির ভাইপো। সে শান্তি মাসির খুব প্রিয় পাত্র। অম্বুর প্রতি বাড়ির সকলের অগাধ বিশ্বাস। কমলার সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হয় অম্বু। কমলাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। সিনেমায় সুযোগ করে দেবার নামে তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে অম্বু। কমলা প্রথমে তার তীব্র প্রতিবাদ করে কিন্তু বাড়ির শান্তি মাসির অত্যাচারের কাছে এখন তার প্রতিবাদী মন আত্মসমর্পণ করে। শান্তি মাসি অকথ্য ভাষায় কমলাকে তিরস্কার করে। কমলার জীবনে দেখা দিল এক কালো মেঘ। অম্বুর সঙ্গে কলকাতায় কমলা দিনের পর দিন নূতন কাজের খোঁজ চলতে থাকে। কমলা নিজেকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। অম্বুর সঙ্গে এখন সে মিশতে দ্বিধা করে না। সে আন্তরিকভাবে নিজেকে সিনেমার কাজে নিয়োজিত করতে চায়। কিন্তু অম্বু অসৎ উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য কমলাকে আসানসোলের এক কয়লা ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যায়। এক অন্ধকার ঘরে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে কমলাকে যৌন নির্যাতন শুরু করে অম্বু। উপস্থিত বুদ্ধিতে কমলা সে যাত্রায় রক্ষা পায়। বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে বাড়ি ফিরে আসে। অম্বু শান্তি মাসির কাছে কমলার নামে নানা কুৎসা রটনা করে। শান্তি মাসির উদ্দেশ্যও ছিল অসৎ। সে চেয়েছিল যে কোন বদনামের শিকার হয়ে কমলা বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাক। আবার শান্তি মাসির শুরু হল কমলার প্রতি নির্যাতন।

উপন্যাসের শেষে উন্মাদ প্রায় কমলা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কমলা এখন অস্থির চঞ্চলা হয়ে, সাধারণ শাড়ি পরে কলকাতার রাস্তায় ঘুড়ে বেড়ায়। রাস্তায় শ্যামলী নামে এক বান্ধবীর সঙ্গে কমলার পরিচয় হয়। শ্যামলী কমলাকে মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কারণ কমলার মতই মানুষের কাছে সে প্রতারিত হয়েছিল, এখন শ্যামলীর জীবনে অবনী এসেছে। অবনী পেশায় আর্টিষ্ট। সে ভালো ছবি আঁকে, জীবন সংকটের এক চরম মুহূর্তে অবনী শ্যামলীকে পথ দেখায়। অবনী ছিল নূতন পথের দিশা। অবনী ও কমলার মধ্যে গড়ে উঠল ভালোবাসা।

কমলার দ্বিতীয় যাত্রার শুরু হয়েছিল মডেল হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। সেখানেই সে খুঁজে পেয়েছিল অবনীকে। এখন সে যেন প্রেমের আয়নার মধ্যে একা। চারিপাশে এতদিন যারা ছিল, তারা এখন ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়।

প্রতারিত কমলার মনে এখন দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, কারণ অবনী তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবে কি না- এ নিয়ে কমলার মনে সংশয় কাজ করে। অবনীর ভালোবাসা পেয়েও শ্যামলী আজ অশান্ত। কারণ শ্যামলী চেয়েছিল আর পাঁচ-জনের মত সাংসারিক হতে। শ্যামলীকে কেন্দ্র করে কমলার মনে জেগে ওঠে নূতন করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। নিষিদ্ধ জগৎ এর মধ্যে থেকেও সে স্বপ্ন দেখা শুরু করলো, কমলার মধ্যে দেখা গেল অসহিষ্ণুতার ভঙ্গী। শ্যামলীকে পেয়ে সে নূতনভাবে অর্থ উপার্জন করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল।

উপন্যাসের শেষ অংশে দেখি অবনী কমলা পরস্পরের মধ্যে একটি ঘর বাঁধার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত অবনীকে কমলা জীবন সঙ্গী করলো। অবনীর সংস্পর্শে তার ভাঙ্গা জীবন আবার যুক্ত হল। তার জীবন আকাশে আবার নূতন তারা ফুটে উঠল।

অবনী ও কমলা পরস্পরকে ভালোবাসে। এখন তারা স্বামী-স্ত্রী। কমলার সুখে অবনী সুখ পায়, আবার দুখে অবনীর দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। কমলা পেল স্বামী। এতদিন মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল কমলা। এখন অবনীকে পেয়ে সে ফিরে পেল নূতন জগৎ। অবনী ছিল কমলার কাছে আয়না। যে আয়নায় কমলা শুধু একাকী ভেসে উঠল। এই আয়নার সম্মুখে উদিত হতে সাহায্য করেছিল কমলার বান্ধবী শ্যামলী। শ্যামলীর বুকে একটা দুঃসহ বেদনা রয়েই গেল। অসুস্থ পিতাকে বাঁচাবার জন্য শ্যামলী মডেল হয়েছিল কিন্তু ভালোবাসার স্বর্গীয় সুখ থেকে সে চিরদিন ছিল বঞ্চিত। নিজে বঞ্চিত হয়েও কমলাকে দেখালো নূতন পথের ঠিকানা। কমলার জীবনে শ্যামলী ছিল দেবদূত। শ্যামলীর সুপরামর্শে অবনী কমলাকে কাছে নিয়েছিল। উপন্যাসের শেষে কৃতজ্ঞতাবশত কমলা জানালো -

"তুমি খুব ভালো মডেল, শ্যামলী, আমার ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছিলাম, আচ্ছা তাহলে, এতক্ষণে আমার উপলব্ধি হল যে আমি এতক্ষণ উপলব্ধি করিনি ব্যাপারটা, কিছু না বুঝে কথা শুনছিলাম, বলছিলাম। চলে যাচ্ছো- অন্য দেশে - অনেক দূরে - পরশু। পরশু, তার মানে আজ শুক্রবার, আজই শেষ, এই মুহূর্তেই শেষ। আমি একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়ালাম, মনে হল আমি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমার বুকের ভেতরের কলকব্জাগুলো খুলে নিয়েছে, এই ঘরের আলোগুলো তেমন উজ্জ্বল নেই আর, অলোক পালের মুখটাও কেমন অস্পষ্ট। উনি কাশলেন একবার ট্ট অর্থাৎ, আমার যাবার জন্য

ইঙ্গিত। অন্য একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল, চেষ্টা করে কথা বের করলাম গলা দিয়ে - ছবিটা দেখতে পারি একটু ? দেখতে চাও ? আচ্ছা। তিনি ঢাকনা খুলে দিলেন। আমি একটি চোখ ধাঁধানো ঝলক দেখতে পেলাম।" - ২৩

কমলার অতীতের বিষাদের স্বর্গ ও স্বার্থপর মানুষের ষড়যন্ত্রের কথা ভুলে গিয়ে আয়নার সামনে লাল বেণারসীতে নিজেকে কেমন একা দেখতে লাগল। কমলা এখন নূতন ঘরের বধূ। ফেলে আসা দিন তাঁর কাছে স্মৃতি মাত্র। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু দুইটি চরিত্র শ্যামলী ও কমলাকে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। উপন্যাসে শ্যামলীকে বুদ্ধদেব সুখহীন উড়ন্ত পাখি করেই রেখেছিলেন। উপন্যাসের প্রথম ঘটনার সঙ্গে শেষের ঘটনার কোন মিল দেখা যায় না। ঘটনাগুলি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন এসেছে। কমলা চরিত্রের মধ্য দিয়েই বুদ্ধদেব এই পরিবর্তন এনেছেন। কমলাকে উপন্যাসে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসাবে তুলে ধরেছেন। অম্বু তার জীবনে বিড়ম্বনা দিলেও অম্বুই তাকে এই বিবর্তনে সাহায্য করেছিল বলা যায়। তা না হলে রাস্তায় অথবা মাসির বাড়িতে দাসী হিসাবে তাকে সারা জীবন থাকতে হত।

"নির্জন স্বাক্ষর" উপন্যাসটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলোশিং, ৩১/১ বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। প্রচ্ছদ ও নামপত্র এঁকেছেন শ্রী দেবব্রত রায়। মুদ্রাকর- নিরঞ্জন বোস, নর্দাণ প্রিন্টার্স, ৩৪/২ বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৬, মূল্য - ৬ টাকা।

"নির্জন স্বাক্ষর" উপন্যাসে কেন্দ্রিয় ঘটনায় সোমেন দত্ত ও মীরার দাম্পত্য জীবনকে পাই। সোমেন উপন্যাসে এক খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে দাবী করে। কিন্তু তার সাহিত্য প্রতিভা ততটা উচ্চমানের ছিল না। কিন্তু সাহিত্য রচনায় তার প্রেরণা ছিল, তুলনাহীন। তার আদর্শ বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশে তাকে দুর্বল বলে মনে হয়। তার স্ত্রী মীরাকে বুদ্ধিমতি সজীব ও সক্রিয় চরিত্র রূপে উপন্যাসে দেখা যায়। মীরার সামনে সোমেনকে দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে হয়।

উপন্যাসের প্রথমে সোমেনকে একটি বাংলা সংবাদপত্রের কর্মী হিসাবে দেখি। সে সংবাদপত্রের প্রচার বিভাগে বিজ্ঞাপনের কাজ করে। দীর্ঘদিন এই কাজ করতে গিয়ে

তার দৃষ্টিশক্তির অপচয় ঘটে। যার ফলে তার আদর্শ ও মতামত পারিবারিক জীবনে অনেক সময় হেয় প্রতিপন্ন করে। স্ত্রী মীরার অভিপ্রায়ের কাছে বার বার সে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

উপন্যাসের মধ্যাংশে মালতী সেন চরিত্রকে এনে লেখক প্রেমের এক নূতন মোড় আনার চেষ্টা করেছেন। একটা চাপা ও গোপন অবচেতন মনের বিকাশ এখানে দেখা যায়। কিন্তু উপন্যাসে তার বিস্তৃতি লেখক না দেখিয়ে সোমেনের কবি মনের ও লেখক হবার স্বপ্নকেই উপন্যাসের শেষের দিকে তুলে ধরেছেন। মালতী সেন সোমেনের জীবনে একটা বুঁদ বুঁদের মত। এক দিকে সাহিত্য অন্য দিকে মালতী এই দুয়ের মধ্যে সোমেন চরিত্রের অস্থিরতার বিভিন্ন দিক উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সোমেন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদভ্রান্ত ও উন্মাদপ্রায় অবস্থায় তার আচরণগুলি অনেকটা বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। উপন্যাসের শেষে সোমেন আত্মহত্যার দ্বারা তার মনোবিকারগ্রস্ত জীবনের অবসান ঘটায়। উপন্যাসে স্ত্রী মীরার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের অসহিষ্ণুতা ও মনোমালিন্য সোমেনকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। লেখক মীরার দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে সোমেনের কাম-সম্মোহনের অভাবকেই দায়ী করেছেন। এর ফলে তাদের সাংসারিক জীবনে অশান্তি দখা দেয়।

২) জীবনাদর্শমূলক উপন্যাস ঃ

"মৌলিনাথ" উপন্যাসটি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর লেখনীর দৃঢ়তা ও সাবলীলতার ছাপ লক্ষ করি। উপন্যাসটির প্রকাশক ডি.এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কোলকাতা - ৬। দ্বিতীয় প্রকাশঃ আশ্বিন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে।

উপন্যাসটির তিনটি খণ্ড ও একটি উপসংহার আছে।

১) একটি গ্রীষ্মের সকাল

২) একটি বর্ষার সন্ধ্যা

৩) শীতের সকাল

৪) একটি বসন্তের রাত্রি (উপসংহার)

একটি গ্রীষ্মের সকাল - পর্ব শিরোনামটি তিনটি ক্রমিক সংখ্যায় পর্বান্তর করা হয়েছে।। মৌলিনাথ কবি, সাহিত্য রচনায় সে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। মৌলিনাথ গীতাকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা চিত্রা (গীতার দিদি) মেনে নিতে পারে নি। এরই পাশাপাশি উপন্যাসে দেখা যায় বুদ্ধদেব বসু মৌলি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তার লেখক জীবনের অপূর্ণতার কাহিনী যেন আমাদের জানিয়েছেন। মৌলিনাথ ধৈর্য্যশীল ও ভাবুকী মনের লেখক। তিনি গল্প লিখেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। মৌলির মা গীতাকে ভালোবাসেন। মৌলি ও গীতার সম্পর্কটা সে বুঝতে পারে। মৌলির মা মৌলিকে বিয়ে করতে অনুরোধ জানায়। এমনকি গীতার সঙ্গে মৌলি বিয়েতে সম্মতি না দিলে সে বাড়ি থেকে চলে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত মৌলির কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মৌলির মা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাই নিঃসঙ্গ বাড়িতে মৌলি একাকী রইল। মৌলিও এ বাড়ি ছেড়ে একদিন চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। মৌলিনাথ শীতের সকালে মা ও গীতাকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজেকে গল্প ও সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত রাখা ছাড়া আর কোন উপায় সে দেখে না। কিন্তু মৌলি সচেতনভাবে এই শূন্যতা সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে উপভোগ করে।

মৌলিনাথ চরিত্রে বুদ্ধদেব বসু আরো দেখালেন এই সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই জীবনের শেষ নয়। কাজেই বাকি জীবনকে উপভোগ করার জন্য মৌলিকে চিত্রা মনের মাঝখানে স্থান দিলেন। সে চিত্রা এবং মৌলির মুখের মলিন অবস্থা দেখে দুঃখ পায়।

চিত্রা মৌলির জন্য যেন ব্যথা পাচ্ছে। তার জন্য একটা অদ্ভুত অনুভূতি সে কাউকে বলতে পারে নি। মৌলি এই সময় চিত্রার শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু মৌলি তার এই কল্পনা মাঝে মধ্যে হারিয়ে ফেলে। মৌলি এখন নীরব হয়ে পড়ে থাকল। এখন সে চিত্রার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চায়। চিত্রার বাড়িতে সে উপস্থিত। সেই মূহুর্তে মা নেই। মৌলি তার মানসিক অস্থিরতার বিষয়টি চিত্রাকে বুঝিয়ে বলে। চিত্রা তার মানসিক অবস্থা ভালোভাবে অনুধাবন করে, মৌলিনাথের কোন খানে অসুখ। এখন মৌলি সাহিত্য লেখা থেকে অনেক দূরে। মৌলিনাথ চিত্রাকে তার এই অবস্থার জন্য দায়ী করে না। কিন্তু চিত্রা গভীর অনুতপ্ত মনে বিষয়টি অনুধাবন করে। মৌলি নিজেকে তার মৃত হৃদয়কে উজ্জীবিত করে তুলতে চায়। বর্তমানে মৌলির সঙ্গে চিত্রার যেন কোন সম্পর্ক নেই। এই পরিস্থিতিতে লেখক মৌলির কাছে থেকে গীতাকে সরিয়ে নিয়েছিল।

উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা দেখতে পাই গীতার সঙ্গে বিমলেন্দু নামে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বিয়ে। মৌলিনাথ একটা দীর্ঘ চিঠি লিখে গীতা ও বিমলেন্দুকে ধন্যবাদ জানায়।

বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে লিখেছেন -

"বুদ্ধদেব বসু রচনার অজস্রতা ও অভিনব লিখন ভঙ্গী পুরাতন সীমারেখা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া উপন্যাসকে নতুন আকার দেওয়া ও নতুন পথে পরিচালিত করার কৃতিত্বে দাবী করিতে পারেন। পরিকল্পনা ও রচনা ভঙ্গীর মৌলিকতা ইহাদিগকে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস-সাহিত্য-বিবর্তনের যে প্রধান ধারা প্রবাহিত হয়েছে ইহারা সেই স্রোতের সহিত না মিশিয়া শাখা পথে পাড়ি জমাইয়াছেন। অবশ্য এই শাখাপথে স্রোতের বেগ স্থায়ী হয়ে অথবা মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই ইহার রসপ্রবাহ অল্পদিনেই শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে তা নিশ্চিত যে ইহারা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির নতুন সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছেন।" - ২৪

মৌলি সবসময় একটি ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে আনমনা চিত্তে উদাসীনভাবে থাকত। মৌলির জীবনে তার মায়ের ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি চিত্রার ভূমিকাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই উপন্যাসে চিত্রার ছোট বোন গীতা ও ছোট ভাই বেনুকে দেখা যায়। গীতা খুব চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। তার মধ্যে স্থিরতা ও ধৈর্য্যেরভাব ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মৌলির সামনে এলেই যেন গীতা তার সব চঞ্চলতা ভুলে যায়। সে মৌলির সামনে হতবাক হয়ে যায়। চিত্রা এসব দেখে অবাক হয়ে ওঠে। তবে মৌলি চিত্রাকেই বেশী ভালোবাসত বলে উপন্যাসে মনে হয়। তাই চিত্রাই মৌলিকে তার ভাবনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবিহিত করে দেবার আপ্রাণ প্রয়াস করত।

মৌলি ও চিত্রা যেন একে অপরের পরিপূরক। লেখকের দৃষ্টিতে দুজনের জন্যই যেন পৃথিবীতে প্রেম এসেছিল। মৌলি বেশিরভাগ সময়েই কবিতার সারমর্ম বুঝে আনন্দ পেতে বেশী ভালোবাসত। মৌলির ধারণা, যারা কবিতা পড়ে না, কবিতার প্রকৃত অর্থ বোঝার যারা চেষ্টা করে না, তারা কিভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। মৌলির এই

চিন্তাভাবনা চিত্রা যেন খুব ভালোভাবে বোঝে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিত্রা নিজেও মৌলিকে বুঝতে বিমোহিত হয়ে পড়ে। মৌলি চরিত্রের মধ্যে কিছুটা জেদি প্রবণতা থাকলেও চিত্রার কথাকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করে। চিত্রা মৌলির কাছে এম.এ. পড়েছে। মৌলি খুব মেধাবী ছাত্র। সে ক্লাসে সঠিকভাবে উত্তর দিতে না পারলেও লেখার মধ্যে তার অপরূপ প্রতিভা সে ফুটিয়ে তুলেছিল। মৌলি মাঝে মধ্যে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা হারিয়ে ফেলত। সে এমন এক খেয়ালী চরিত্র যে নিজেও সঠিকভাবে নিজেকে চিনতে পারে না। সে কি করতে চায় তার সঠিক দিক চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না। সে বন্ধুদের সঙ্গেও সঠিকভাবে আচরণ করে না। কিন্তু মৌলির অদ্ভুত গুণ হলো, সকলেরই ভালোবাসা পায় ও সকলেরই প্রিয় পাত্র। বিনিময়ে সে সকলের ভালোবাসার সঠিক প্রতিদান দিতে পারে না।

মৌলি কখনও চিত্রাকে ধরে রাখতে চায় আবার কখনও গীতাকে। গীতার উচ্ছলতা মাঝে মধ্যে মৌলিকে বিস্মৃত করে তোলে। মৌলির মধ্যে একটি রহস্য শক্তি যেন তাকে বিলীন করে দেয়। তবে চিত্রা মৌলিকে সঠিকভাবে বুঝতে ও চিনতে পেরে তার ভুলগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করে। কিন্তু মৌলি ক্ষণিকের জন্য চিত্রার বক্তব্যকে সমর্থন করলেও পরক্ষণে সে উদাস হয়ে পড়ে। চিত্রা তার কথার মধ্যে দিয়ে মৌলিকে বিয়ে করতে চাইলে সে কখনও উত্তর দেয় না। আবার চিত্রাকে সে পছন্দও করে সে কথাও জানায়। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে বা চিত্রাকে নিয়ে সে কি করবে তা বোঝা যায় না। মৌলি কবিতা পড়তে গিয়ে বিমোহিত ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় বশীভূত হয়ে পড়ে। সে কবিতা পড়ার সময় তার অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে অথবা তার গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে যায়। উপন্যাসের মধ্য অংশে আমরা দেখি চিত্রা মৌলির জীবন থেকে স্বল্প সময়ের জন্য দূরে সরে গিয়ে আবার কাছে আসে। মৌলি তাকে তখনও ধরতে পারে নি।

মৌলি ছিল প্রকৃতি প্রেমিক, প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসকেই সে ভালোবাসত। প্রকৃতিকে সে ঈশ্বরের দান মনে করত। তাই প্রকৃতি তাকে অপরূপ আনন্দ প্রদান করে। সে গ্রীষ্মের সকালে যেমন সৌন্দর্য খুঁজে পায়, তেমনি বর্ষার সন্ধ্যার মধ্যেও অপর এক সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে। এসব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন তার কাছে এক অলৌকিক আনন্দদায়ক বস্তু। আর এই আনন্দকে মৌলি তার লেখনীর মাধ্যমে সারা জীবন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই মৌলিও গীতাকে বিয়ে করার সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায় বিমলেন্দুর সঙ্গে গীতার বিয়ে। সেখানেও মৌলির

কোন দুঃখ নেই। মৌলি দীর্ঘ পত্র লিখে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। উপন্যাসে মৌলি সাংসারিক জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কবিতা লেখাই তার জীবনের যেন মূল মন্ত্র। সে পড়াশুনায় ভালো হলেও শিক্ষকতা করা তার পছন্দ ছিল না। তাই প্রতি মুহূর্তে মৌলির মনে হতো, যারা কবিতা পড়ে না তারা পাগল হয় না কেন। মৌলি সারা জীবন এক নিঃসঙ্গ জীবনকেই বেছে নিয়েছিল, তা উপন্যাসের শেষে বোঝা যায়। চিত্রাকে শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারে নি।

বুদ্ধদেবের উপন্যাস অবশ্য বাস্তব বর্জিত এ কথা বলা যায় না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কল্পনা দিয়ে মৌলিনাথের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে বাস্তবতা একেবারেই নেই এ কথা বলা যায় না। মৌলি জীবনের সহজ গতিপথে চলে নি। সে জীবনের গৌরবময় মুহূর্তগুলি বার বার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। সে নিজের জীবনের বিশ্লেষণ নিজেই করেছে। আর এটাই ছিল এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। কোন কোন সমালোচক অবশ্য এর মধ্যে রোমান্সের সুর দেখতে পেয়েছে। কিন্তু মৌলিনাথ ছিল বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত এক সংযমী আদর্শবান পুরুষ। বিভিন্ন ঘটনায় তার জীবনে যে ফুল ফুটেছিল, তাকে মৃত্তিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বিচার করতে দেখা যায়। তিনি উপন্যাসে যে আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"-র লাবণ্য ও অমিতের সঙ্গে তুলনীয়। লাবণ্য ও অমিত রায়ের যেমন বিবাহ হয় নি, তেমনি মৌলিনাথ উপন্যাসে মৌলিনাথের সঙ্গে চিত্রা অথবা গীতার বিবাহ হয় নি।

"নীলাঞ্জনের খাতা" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসু মৌলিনাথের উপসংহার রূপে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। ঐ সালের মে মাসেই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-১৩, ক্রাউন সাইজ ২+১৮০, মূল্য - দেড় টাকা। মৌলিনাথ এবং নীলাঞ্জনের খাতা - এই দুইটি উপন্যাসের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসুর নিজের জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের ঘটনা এই উপন্যাসে অনুপ্রবেশ করেছিল। মৌলি চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ "নীলাঞ্জনার খাতা" উপন্যাসে সার্থকতা লাভ করেছিল।

এই উপন্যাসে নীলাঞ্জন তার খাতার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নীলাঞ্জন উপন্যাসে দুটি নারীকে ভালোবেসেছিল। তারা হলো মিলি ও

তাপসী। নীলাঞ্জন মিলির প্রতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ ছিল। তবে তাপসীর প্রতিও তার আকর্ষণ কম ছিল না। তার মতে মেয়েদের বিয়ে করার অর্থ হলো, অনেকটা তাদের দাসী করে রাখা। এই দ্বৈত প্রেমিকার মাঝে নীলাঞ্জন নিজেকে অপরাধী ও ব্যর্থ বলে মনে করে। তবে নীলাঞ্জন ও মিলির প্রেমের গভীরতা অনেক বেশী ছিল - একথা উপন্যাসের মধ্যাংশে তাপসী স্বীকার করে।

এই উপন্যাসের কাহিনীতে গিরিজা মজুমদার, রাধাকান্ত ও স্বর্ণলতার পরিবারকে দেখা যায়। গিরিজার মেয়ের নাম মিলি। গিরিজাবাবু অত্যন্ত ব্রাহ্ম মনোভাব সম্পন্ন ও রোমান্টিক মনের মানুষ। সে এবং তার স্ত্রী নদীর ধারে নিঝুম রাতে বেড়াতে যেত। এর মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃতিকে ভালোবাসার এক মানসিকতা ও আবেগ উপন্যাসে দেখতে পাই। অন্যদিকে রাধাকান্ত ও স্বর্ণলতার মেয়ের নাম তাপসী। তাপসীর জন্মের কিছুদিন পরেই তার মা স্বর্ণলতা মারা যায়। রাধাকান্তের স্নেহ যত্ন তাপসী তেমনভাবে পায় নি। কারণ রাধাকান্ত মদের নেশায় মাঝে মধ্যে মেয়ের নামও ভুলে যেত। হঠাৎ একদিন ক্লাব থেকে ফেরার পথে গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তাপসীর বাবা মারা যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাপসী বড় হয়ে উঠেছিল।

এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নীলাঞ্জন। তার চরিত্রের বিশেষত্ব হল তিনি অনেক বিষয়েই জানেন কিন্তু কোন বিষয়েই বিশেষজ্ঞ নন। তার বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা দু-চার খানা গ্রন্থ সাহিত্য জগতে জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষকরে তার এই লেখায় মিলির মনে অসাধারণ দাগ কেটেছিল। তার বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঞ্চাশ বছরের এই অবিবাহিত নীলাঞ্জনের ছিপছিপে চেহারা, ধূসর চুলের বাহার নিয়ে ঠোঁটের রমণীয় হাসির আভায় মিলি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার নরম কণ্ঠস্বর তার গাম্ভীর্যকে ব্যক্ত করে। বাংলা অধ্যাপকের অনুপস্থিতির কারণে নীলাঞ্জনকে সাহিত্য বিভাগে পরীক্ষা নিতেও উপন্যাসে দেখা যায়। তার মতে ভালোবাসা না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই তার জীবনে মিলি ও তাপসী দুটি নামই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দশ-এগারো বছর বয়সে সে হাতে লিখে একটি পত্রিকাও চালাতো - যার ভক্ত পাঠিকা ছিল মিলি। এক সময় মিলি নীলাঞ্জনের জন্য অনেক কিছু করতে রাজী হয়েছিল। তাই সে মাঝে মাঝে চাকরের হাতে সুগন্ধী কাগজের চিঠি-পত্র নীলাঞ্জনের কাছে পাঠাত। এছাড়া উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায় নীলাঞ্জনের সঙ্গে মিলি খেলা করত। মিলি সহজ-সরল ও বড় হওয়ার পরেও তার আচার আচরণে শৈশবত্ব লক্ষিত হয়। মিলি তাপসীকেও খুব ভালোবাসত। তাকে

দিদির মতো আদর ও শ্রদ্ধা করত। শুধুমাত্র নীলাঞ্জনকে দেখা ও কথা বলার জন্য সে নীলাঞ্জনদের বাড়িতে যেত। উপন্যাসের মধ্যাংশে আমরা দেখি নীলুকে ছাড়া মিলি আর কাউকেই স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। কিন্তু এরই মাঝে উপন্যাসে মাতৃহারা তাপসীর প্রতি নীলাঞ্জনের দুর্বলতা ছিল, তা আলোচ্য উপন্যাসের শেষের দিকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদিও নীলাঞ্জন প্রথমে তাপসীকে পছন্দ করে নি। তবে সে মিলিকেও বঞ্চিত করতে চায়নি। তার এই জীবন যন্ত্রণার ব্যথা তাপসী অনুভব করে। তাই তাপসী চেয়েছিল মিলি ও নীলাঞ্জনকে এক করে দিতে। শেষ পর্যন্ত নীলাঞ্জনের অপেক্ষায় তাপসী বিয়ে করে নি। আবার মিলিকে জীবন সঙ্গিনী রূপে মেনে নেবার স্পষ্ট ইঙ্গিতও উপন্যাসে দেখা যায় না।

"প্রভাত ও সন্ধ্যা" উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা ৭৩। গ্রন্থ স্বত্ত্ব ঃ প্রতিভা বসু। । মুদ্রাকর ঃ ফটো টাইপ সেটিং গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা - ৫।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র পৃথ্বীশ। সে সিংহ পরিবারের গ্রন্থাগারের একজন দক্ষ লাইব্রেরীয়ান। তার ক্যাটালগ তৈরীতে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকেই লাইব্রেরীয়ান হবার স্বপ্ন তার ছিল না। সিংহ পরিবারে কাজের খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি লাইব্রেরীর দায়িত্ব পান। আলাদা স্বাদের ক্যাটালগ তৈরীতে তিনি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। লাইব্রেরীর নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। এমনকি সিংহ পরিবারের লোকজনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য ছিল। লাইব্রেরীর কর্মসূত্রে সিংহবাড়ির রাণীমা থেকে অরুন্ধতী, অনিন্দিতা, সুব্রত, গৌরী থেকে চাকর-চাকরাণী, কিরণময়ী প্রত্যেকের সঙ্গে তার একটা আত্মীয়ের বন্ধন গড়ে উঠেছিল। সিংহ পরিবারের আভিজাত্যের কথা তার সব সময় মাথায় ছিল। উপন্যাসে লাইব্রেরীর মধ্যে গোটা পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছিলেন।

উপন্যাসের প্রথমে দেখি অলোকচন্দ্রের মেয়ে অনিন্দিতার বিয়ে। তারপর সিংহ পরিবার হতাশা ও দুর্দশায় নিমজ্জিত হতে থাকে। হেমনলিনী ছিলেন অলোকচন্দ্রের স্ত্রী। হেমনলিনী, অলোকচন্দ্র ও পুত্র নবকুমার - এই তিনটি মৃত্যুতে সিংহ পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। এই উপন্যাসে মা, ছেলে ও কিছু প্রিয় সখী-ভ্রাতৃবধূর পরপর মৃত্যুর

আঘাত বিমলপ্রতিভার মনে চরম আঘাত হেনেছিল। বিমলই ছিল এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এর পরে ত্রিশ বছর কেটে গেলেও আরো কয়েকবার সিংহ-পরিবারে হানা দিয়েছে মৃত্যু। অবনী, শশাঙ্ক, অলোকচন্দ্রের আয়ু শৈশবেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। আবার অনিন্দিতার দ্বিতীয় সন্তান অরুন্ধতী। তার বয়স এখন কুড়ি। হরিশঙ্কর থেকে আরম্ভ করে সত্যানন্দ ও উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ অবনীভূষণকান্ত সকলের স্মৃতির পরিচয় উপন্যাসে দেখা যায়। এই পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে পৃথ্বীশ লাইব্রেরীর চার হাজার বই এর ক্যাটালগ দক্ষতার সঙ্গে তৈরী করে। উপন্যাসের শেষের দিকে পৃথ্বীশ কাজ ছেড়ে দেবে ভেবেছিল। কারণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা অরুন্ধতী লাইব্রেরীর বিশেষ কর্মচারীদের প্ররোচনায় সে প্ররোচিত হয়ে পৃথ্বীশকে কাজ থেকে সরানোর চক্রান্ত শুরু করেছিল। কিন্তু রাণীমার অনুরোধে পৃথ্বীশ সেই কাজ ছাড়তে পারেনি। কারণ এখানে এসে পৃথ্বীশ গোটা আত্মীয়র পরিমণ্ডল খুঁজে পেয়েছেন। পৃথ্বীশ ছোটতেই মাকে হারিয়েছিল এবং সে বিমাতার কাছে মানুষ হয়। যদিও সে তার বিমাতাকে কখনও মা বলে ডাকে নি। পৃথ্বীশ টিউশনি করে পড়াশুনা করেছে, তবু এখানে সে অনায়াসে ডাকছে রাণীমা, নন্দিতা দি, কিরণ দি, আর এটাই ছিল পৃথ্বীশের স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক মনের ডাক।

এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড থেকে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত পৃথ্বীশের জীবনে কোন নারী চরিত্র সেভাবে আসেনি। আট ক্রমিক খণ্ডান্তরে লেখক দুজন নারী চরিত্র এনে তার জীবনের একটা দিক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। একজন মালতী ঘোষ অপরজন শোভা। শোভার সঙ্গে গ্যারিসন রোড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত পৃথ্বীশ ঘোরে। শেষপর্যন্ত সিংহ পরিবারে ঘরানায় পৃথ্বীশের এই আচারণ অরুন্ধতীর চোখে লাগে, কারণ অরুন্ধতী ছিল চঞ্চলা ও পরশ্রীকাতর। তাদের পরিবারে পৃথ্বীশ এইভাবে প্রভাব বিস্তার করুক এটা অরুন্ধতী চায় নি। আবার পৃথ্বীশের লাইব্রেরীর কর্মচারীরাও এটা ভালোভাবে দেখে নি। যার ফলে পৃথ্বীশ অনেকটা একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সিংহ পরিবারের অন্য সদস্যরাও অবশ্য পৃথ্বীশকে সমানভাবে ভালোবাসে। এইভাবে পারিবারিক অশান্তির মাঝখানে সে কাজ ছেড়ে দেবার মনস্থ করে। উপন্যাসে দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায় মৃগাঙ্ক ও পৃথ্বীশ নামে দুইটি চরিত্রের রাণীমার সঙ্গে মতামতের পার্থক্য ও তাদের প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। মৃগাঙ্ক মনে করে পৃথ্বীশ লাইব্রেরীর একজন সাধারণ কর্মচারী। সে অনেক বিষয়ে পৃথ্বীশকে তুচ্ছজ্ঞান করে। রাণীমার কাছে তার নামে নালিশ জানায়। রাণীমা এই অভিযোগের সত্যহীনতা বুঝতে পারে। শেষ পর্যন্ত রাণীমা

দিল্লীতে চলে যায়। পৃথ্বীশ একটা দীর্ঘ পত্র লিখে অরুন্ধতীকে দিয়ে সিংহ পরিবারের লাইব্রেরী থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সে সিংহ পরিবারের প্রতি তার ব্যথা বেদনার ইতিহাস কখনও কাউকে বলে নি।

"শোনপাংশু" উপন্যসটি ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ সুধাংশু শেখর দে'জ পাব্লিকেশন, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৯।

"শোনপাংশু" উপন্যাসটি আদিম ও নানা জটিল বিধি নিষেধের জালে অবরুদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাহিনী নিয়ে রচিত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাদের অতিনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার জন্য ও কর্তৃপক্ষের অনমনীয় নিয়ম নীতির জালে অল্প বিস্তর বিকৃত মনোভাব পোষণ করে। গুজব শিক্ষিত সমাজে কিভাবে ছড়ায় তা এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরস্পরের জীবন সম্পর্কে অশালীন কৌতূহল তৈরীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি দূষিত চক্র যেন কাজ করছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে নারী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুভদ্রা দেবী ও সম্পাদক নিত্যানন্দ মজুমদার এক প্রকার সন্দেহপ্রবণ, বক্র কুটিল মনোভাবের পাঁকে নিজেকে ডুবিয়ে ছিল। অধ্যাপকদের মধ্যে বেণীমাধব ও পোকেল চরিত্র দুটি পরস্পর বিপরীত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন বিষয় ও জীবন অস্থিরতার দিক দিয়ে একই ভিত্তি ভূমিতে তারা দণ্ডায়মান ছিল। অপরদিকে বন্ধন অসহিষ্ণু, মনখোলা মেজাজের মানুষ সুখেন্দু গুপ্ত। তার অসতর্ক কথাবার্তা ও বেপরোয়া আচরণের জন্য সে সকলের নিন্দা ভাজন হয়েছিল। বিভিন্ন দলের অধ্যাপকদের প্ররোচনায় ছাত্ররা তাকে প্রহৃত করেছে। তার তরুণ সুলভ প্রণয়াকর্ষণ ও মানবিক স্নেহ মমতা এই নিয়মানুতান্ত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল একমাত্র ভরসা। এরপর আমরা ডঃ মুখার্জ্জীর পরিবারকে দেখি। এই পরিবারটি অন্য সকলের হিংসা ও আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। অভিজিৎ ও মালতির নিষিদ্ধ প্রেম এই ছকে বাঁধা বিদ্যানিকেতনে এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কারণ তারা ছিল তরুণ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা। শিক্ষিত সমাজেরও যে অপরকে ভালোবাসার মনোভাব থাকতেপারে তা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা মেনে নিতে পারে নি। তাই সমগ্র উপন্যাসে প্রেম নিয়ে কুসংস্কার কাজ করে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানেই পবিত্র আদর্শের বলয়ে ঘোরা-ফেরা করা, বলয়চ্যুত হলেই সে অসভ্য- এই মানসিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ছিল। যার ফলে অনেককেই শাস্তির শিকার হতে হয়। মোটের উপর জীবনের যে রূপ এই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন তা প্রথাগত বদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার এক নূতন ঠিকানা বলা যেতে পারে। আর এই সূত্র ধরেই উপন্যাসটি তার অন্যান্য উপন্যাস থেকে ভিন্ন স্বাদ বহন করে।

৩) দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও নূতন পথের দিশারী :

"শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসটি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ঃ ডি.এম. লাইব্রেরী, কোলকাতা।উপন্যাসটির ১৩টি খণ্ড রয়েছে। প্রত্যেকটি খণ্ড আবার ক্রমিক সংখা দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই উপন্যাসের নায়ক বীরেশ্বর গুপ্ত। বীরেশ্বর প্রথম থেকেই উপন্যাসে বিধবা বধূ গৌরীর প্রতি যৌন তাগিদ অনুভব করেছে। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে গৌরী দিদার বাড়িতে থাকে। উপন্যাসে প্রফুল্লের বাবা ছিল ভণ্ড প্রকৃতির মানুষ। নিজের অর্থ সম্পদকেই সে ভালোবাসত। সে ছিল হৃদয়হীন লোভী, আত্মকেন্দ্রিক ও পাশবিক শ্রেণীর মানুষ। বীরেশ্বর নিজেকে সংযম রাখতে পারে নি। বীরেশ্বরের জীবন ছিল যন্ত্রণাময়। বীরেশ্বরকে পারিবারিক প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে দেখা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীবন যন্ত্রণা তার পরবর্তী জীবনকে দূষণীয় করে তুলেছিল। উপন্যাসের শেষ অংশে দেখি চাকুরীজীবি বন্ধুকে পেয়েছে বীরেশ্বর। এখন বন্ধু পত্নী অর্চনাকে সে পাগলের মত ভালোবাসে। সে তার দেহকে চায়। অর্চনাও তার প্রতি ঢলে পড়ে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে অর্চনার সঙ্গে দেহ বিনিময় করেছে। এদিকে বীরেশ্বর তার বদ্ধ সংসার জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। বীরেশ্বর গুপ্ত উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই সে অস্থির প্রকৃতির। সে আত্মরতি চরিতার্থ করতে কোন নীতি বা নৈতিকতার ধার ধারত না। যৌন পিপাসা তার চোখে-মুখে ও কথাবার্তায় ধরা পড়েছিল। আত্মরতির সে ছিল একনিষ্ঠ সাধক। অসভ্য চর্চা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাত্রার প্রতি বীরেশ্বর সব সময় আসক্ত থাকতো। এই প্রবণতা তার রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বীরেশ্বরের পিতার অস্বাভাবিক আচরণ তাকে এই অবস্থায় এনে ছিল। তার রক্তে বয়েছিল বিদ্রোহের আগুন। কোনো ধর্ম, কোনো নিয়ম নীতির প্রতি বীরেশ্বর আত্মসমর্পণের পাত্র ছিল না। তার বাল্য প্রেমিকা গৌরীকে দেহ কামনার পাত্রী হিসেবে দেখেছিল সে। বিধবা হয়েও গৌরীকে একই দৃষ্টিতে সে দেখেছিল। অসামাজিক, নিয়ম নীতিহীন জীবন যাত্রায় সে ছিল অভ্যস্ত। মা- ছেলের পবিত্র সম্পর্ক সে সব সময় অগ্রাহ্য করেছিল। তার স্ত্রী সন্তানের

প্রতি কোন দায়িত্ব কর্তব্য আছে বলে বীরেশ্বর মনে করত না। সে ছিল স্নেহহীন, মায়াহীন, সংযমহীন পিশাচ শ্রেণীর চরিত্র। খামখেয়ালী মেজাজে বীরেশ্বর তার জীবন ভোগ করতে চেয়েছিল। অবশ্য বীরেশ্বরের মতো চরিত্র রূপায়িত করে বুদ্ধদেব বসু অপরিসীম আত্মকেন্দ্রিকতা, নীচুতা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছোতে পারে তা এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের কাহিনীতে আরেকটি গতি পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি কলেজ জীবনের একটি ঘটনা দিয়ে। উপন্যাসে দেখা যায় বীরেশ্বরের কলেজ জীবনের বন্ধু প্রফুল্ল। প্রফুল্লের স্ত্রীর নাম অর্চনা। বীরেশ্বরের হঠাৎ প্রফুল্লের স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার, ঘটনাতে বীরেশ্বরের অস্থির গতি লক্ষ করা যায়। প্রফুল্ল হয়তো বীরেশ্বরের মধ্যে যে পশুত্ব ছিল তা অনুধাবন করেছিল। এজন্য তার পরিবারের মধ্যে বীরেশ্বরকে স্থান দিয়েছিল। প্রফুল্লের উদ্দেশ্য ছিল পরিবারগত স্নেহ, মমতায় হয়তো বীরেশ্বর তার উদ্দাম, বর্বর, হিংসাত্মক পশু প্রকৃতিকে কিছুটা শান্ত করতে পারবে। প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে প্রফুল্লের তিক্ত সাহিত্য সাধনার পথকে মসৃণ ও মধুর করে তোলার উদ্দেশ্যে বীরেশ্বরকে নিজ পরিবারভুক্ত করেছিল। বন্ধু বীরেশ্বরের মধ্যে দিয়ে প্রফুল্ল সুস্থ মানুষের ছন্দ আনতে চেয়েছিল। কিন্তু বীরেশ্বরের মনে মানুষের প্রতি অনীহা এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে বন্ধুর ভালোবাসা সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই অর্চনার প্রতি তার আকর্ষণ একটা বিধ্বংসী, নির্লজ্জ দেহ কামনার শিখায় জ্বলে উঠেছিল। বীরেশ্বর দাবানলের মতো প্রফুল্ল ও অর্চনার সংসার পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সেই দাবানলে বীরেশ্বর নিজেই পুড়ে তিলে তিলে ছাই হল। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় বীরেশ্বর মাতাল। মাতলামি করে গাড়ি চালানোর ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটলো তার পরিণতিতে প্রফুল্ল ও অর্চনার মৃত্যু, গুরুতর আহত হল বীরেশ্বর। তার মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটল। কিছুদিন উন্মাদ চিকিৎসালয়ে আশ্রয় নিয়ে বীরেশ্বর আত্মহত্যার দ্বারা তার মনোবিকারগ্রস্ত জীবনের অবসান ঘটায়। প্রফুল্ল ও অর্চনার আত্মরতির উপাদান তার ভোগ ইচ্ছার ইন্ধন মাত্র- এখানে কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা ফুটে ওঠেনি। উপন্যাসে যে তীব্র আলোটা বীরেশ্বরের মুখে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার আভা লেখক উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের উপর ফেলেছিলেন। বীরেশ্বরের অদ্ভুদ উন্মাদপ্রিয় জীবনের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তার আচরণ কোন সময়েই স্বাভাবিক ছিল না। কোন অজানা হতাশা, অতৃপ্তি তার মনকে প্রতিরোধ-পরায়ন করে তুলেছিল। প্রফুল্ল ও অর্চনা যেভাবে তাকে সৎ জীবনে, সৎ পথে, ফেরানোর জন্য প্রশ্রয় দিয়েছিল তা প্রশংসনীয়। সুতরাং উপন্যাসে সমস্ত ঘটনাটি যেন কোন এক পাগল বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষের সঙ্গে অভিনয় প্রদর্শন। বীরেশ্বর যে সাহিত্যিক ছিল, বুদ্ধদেব সে দিকটা উপন্যাসে বড় করে দেখান নি। লেখক তার বীভৎস, কদাকার চরিত্রের বিভিন্ন দিক উপন্যাসে দেখিয়েছেন। প্রফুল্ল ও অর্চনার দুইটি ছেলে মেয়ে ছিল, অথচ তৃতীয় চরিত্র হিসাবে বীরেশ্বর কিভাবে সংসারে ফাটল ধরাল তার ব্যাখ্যা উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

"শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু নিজের জীবনের জয়গান গেয়েছেন। তিনি যেন বিভিন্ন প্রকৃতির লেখকদের নিয়ে জীবনী রচনা করেছেন। বীরেশ্বর গুপ্ত ছেলেবেলা থেকেই দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যৌন আগ্রহী মানুষ। নীতিহীনতা বীরেশ্বরের রক্তে যেন সবসময় বয়ে চলেছে। তার কোন সামাজিক বাধা নিষেধের ভ্রূক্ষেপ নেই। সুস্থ জীবনবোধ তার বাল্যকাল থেকেই ছিল না। বাল্য জীবনে পিতার অনুশাসন ও আচার-আচরণ বীরেশ্বরকে আরো রাক্ষুসে মনোভাব তৈরীতে বাধ্য করেছিল। তার মাতার অসহায় আচরণ তার রক্তের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। প্রেমিকার প্রতি বীরেশ্বরের আসক্তি আরো বীরেশ্বরকে বর্বর করে তুলেছিল। পারিবারিক অশান্তি ও মর্যাদা লঙ্ঘনই তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি। বীরেশ্বরের বন্ধু প্রফুল্লের সংসারকে এই রাগে বীরেশ্বর শেষ করে দিয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মধ্যে যে স্নেহ, সংযম, কর্তব্যবোধ থাকা দরকার তা বীরেশ্বর চরিত্রে আমরা দেখতে পাই না। সাহিত্য সাধনাকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে বুদ্ধদেব অস্বাভাবিক একটি জীবন কাহিনী উপন্যাসে রচনা করেছেন। বীরেশ্বরের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যই প্রফুল্ল তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

অর্চনার কাছে প্রফুল্ল ছিল পতিপ্রাণাগত। চোখের মণির মতো প্রফুল্ল অর্চনাকে কাছে রাখত, ভালোবাসত। কিন্তু প্রফুল্লের বন্ধু বীরেশ্বর তার কোমল মনের সুযোগ নিয়ে সবসময় বিষিয়ে দিয়েছে। প্রফুল্ল ও অর্চনার সংসার জীবনে বীরেশ্বর আগুন লাগিয়ে দেয়। অর্চনা সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। নিজের স্বামীর ঘর করে ভালোবাসতে গিয়ে ঐ শিখায় দগ্ধ হতে হল অর্চনাকে।

"শেষ পণ্ডুলিপি" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু আরো দেখালেন স্বামীর প্রতি কটু দৃষ্টি রাখতে গিয়ে সংসার জীবনে বিপর্যয় । বুদ্ধদেব সংসার জীবনে অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে অবৈধ প্রেম থেকে নায়ক-নায়িকাকে কখনও সুখী হতে দেন নি বরং নিঃসঙ্গতা অনুতাপ জর্জরিত হয়ে নূতন শিক্ষা নিতে বলেছেন। বুদ্ধদেব প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশে দাম্পত্য

জীবনের সুখ কখনও আনেন নি। সুহৃদ, জ্বালাহীন প্রেম দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে তিনি তবু বাঁধতে চেয়েছেন, কিন্তু অবৈধ ভালোবাসা কিভাবে সংসার জীবনকে শেষ করে দেয় তা আমরা বুদ্ধদেবের আগের অনেক উপন্যাসে দেখেছি। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে বীরেশ্বরের মধ্যে বর্বরতা দেখালেও সেই চরিত্রে দেখিয়েছেন সাহিত্য আলোচনা ও সাহিত্য চর্চার আকর্ষণ।

প্রফুল্ল ও বীরেশ্বরের আচরণের উপাদান নিয়ে বুদ্ধদেব বসু রচনা করেছেন ভোগী জীবনের দাসত্ব। যে যৌন ভোগে অর্চনা ধরা পড়ে, বীরেশ্বর তার সেই অস্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে সচেতন নয়, অনেকটা উম্মাদের মতো, অস্থির চিত্তের মতো অনুচিত কাজকর্ম সে চালিয়ে যাচ্ছে। তার আন্তরিকতার কাছে সংসার ধর্ম, মানবিক ধর্ম সবই পরাভূত হয়েছে। অর্চনার মনে দুটি স্তর ছিল। একটি বীরেশ্বর ও অর্চনার দৈহিক মিলন ও অবৈধপনার ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। আর অপরটি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে তার নিজের সংসারকে আরো ভালোভাবে গ্রহণ করতে শেখার কোন পথ লেখক এখানে দেখান নি।

বুদ্ধদেব বসুর "শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসের নায়ক লেখক বীরেশ্বর গুপ্তের স্বীকারোক্তির মধ্যে শূন্যতাবোধের পরিচয় মেলে। পিতার প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা, বিমাতার প্রতি তার আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বন্ধু পত্নী অর্চনার প্রতি তীব্র অবৈধ প্রেমাকর্ষণ, আত্মকেন্দ্রিক বীরেশ্বর গুপ্তকে জটিল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। তাই এই উপন্যাসের নায়কের উপলব্ধি হয় যে, শুধু নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা চিরদিন মানুষের মনে থাকতে পারে না। তা থেকে একদিন সে বেরিয়ে আসবেই। এই ধারণা বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাসে থাকলেও এই উপন্যাসে দেখা যায় না।

"রাত ভ'রে বৃষ্টি" - উপন্যাসটি ষাটের দশকে লেখা লেখা তার বিখ্যাত উপন্যাসের অন্যতম। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাস থেকে "রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রকাশক ঃ সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাব্লিকেশনের পক্ষে, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৬।

"রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসটির বিরুদ্ধে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার বাসিন্দা নীলাদ্রি গুহ অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন এবং ঐ বছরই এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে

তিনি আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলা নং সি/৪৬৭ (১৯৬৯)। এছাড়া এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে ল'কলেজের এক ছাত্র আদালতে মামলা এনেছিলেন।

এই সময় বুদ্ধদেব বসুর মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না। এ বয়সেও তাঁর লেখার জন্য আদালতে যেতে হবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। যাই হোক এবারও তিনি এই মামলায় জয় লাভ করেছিলেন। এবার আমরা এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করবো।

"রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসে মালতী ও নয়নাংশু দাসের একটা দাম্পত্য জীবনের চিত্র বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছেন। লেখক এই উপন্যাসে নায়ক নায়িকাদের বয়সের যে পরিচয় দেন তা হল- মালতীর বয়স মাত্র বত্রিশ এবং নয়নাংশুর সাঁইত্রিশ। ওদের মেয়ে বুন্নির বয়স মাত্র সাত।

নয়নাংশু ও জয়ন্ত এক সময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কিন্তু কলেজ জীবনে নয়নাংশুর সঙ্গে অপর্ণা নামে মেয়ের সম্পর্কের কথা মালতীর মুখ থেকে পাই। স্বামী হিসেবে মালতি নয়নাংশুর কাছে থাকলেও, মালতী প্রেমিক হিসেবে জয়ন্তকে দেখেছিল। জয়ন্ত মা হারা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে টাকা পয়সার অভাবে বি.এ. পড়া ছেড়ে দিয়েছিল, এখন সে ডেটিন্যু করে, মাঝে ট্যাক্সিও চালায়। সুতরাং মালতীর চোখে জয়ন্ত একজন কর্মবীর। একসময় জয়ন্তর প্রশংসা করেছিল নয়নাংশু। নয়নাংশুর মাধ্যমেই মালতীর সঙ্গে জয়ন্তের পরিচয় হয়। ক্রমে পূর্ণযৌবন প্রাপ্তা মালতী জয়ন্তর দিকে ঢলে পড়ে। জয়ন্ত ও মালতীর আসক্ত নেশা নয়নাংশু সব বুঝতে পারে, এবং নিজে এ বিষয়ে দূরে থাকতে চায়। এখন মালতী পুরুষ হিসাবে জয়ন্তকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। যদিও নয়নাংশুর সঙ্গে মালতীর কলেজ জীবনে নিবিড় প্রেম শেষ পর্যন্ত বিয়েতে পরিণত হয়েছিল।

উপন্যাসের মধ্য অংশে আমরা জানতে পারি নয়নাংশুর উপর মালতীর প্রেম ছিল অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার রেশারেশির ফল। কিন্তু জয়ন্তর প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত নেই। নয়নাংশু গান ভালোবাসে না। অবশ্য এই গান ভালো না লাগার বিষয়টি মালতীর জয়ন্তর প্রতি ঢলে পড়ার অর্থ হতে পারে না বলে আমাদের মনে হয়।

উপন্যাসের মধ্যাংশে দেখি নয়নাংশু তার অসুস্থ পিসিমাকে দেখতে যায়। এই সময় জয়ন্ত তার বাড়িতে এসে মালতীর সঙ্গে দেহ বিনিময় করে। এই ঘটনা ক্রমে

মালতীকে তার স্বামীর প্রতি অনেকটা বিমুখ করে তোলে। তখন থেকে জয়ন্ত মালতীর কাছে প্রাণ ও আলো। এখন অচেতন ও সচেতন মনে জয়ন্তকে সে ভালোবাসে। জয়ন্ত মালতীর নেশায় এখন নয়নাংশুর বাড়িতে আসা যাওয়ার কোন বাধা রইল না। এখন মালতীর বাড়িই হল জয়ন্তের প্রেমের উদ্যান।

এই উপন্যাসে আরেকটি উপকাহিনী পাই, যা উপন্যাসের ঘটনাকে তেমনভাবে নাড়া দেয় নি। এখানে দেখা যায় লেখক কলেজ জীবনে কুসুমকে ভালোবেসেছিল। কুসুম বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কে মাসি। কিন্তু সুব্রত যেভাবে মনিকার সঙ্গে প্রেম করেছে কুসুম সেভাবে মিশতে চায় না কিন্তু শেষের দিকে সে লেখকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু লেখক কুসুমের কাছে আত্ম সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। কুসুমের বিয়ে হল। বিয়ের পর সুব্রতর প্রতি তার সামান্য আকর্ষণ থেকে গেছে।

এখন জয়ন্ত মালতির মনের মাঝে উজ্জ্বল নক্ষত্র, এখন নয়নাংশু মাতাল বলে জয়ন্তকে তার বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল। এই সময় জয়ন্ত মালতীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। জয়ন্ত মালতীকে ভালোবাসে না, আজ তার দেহকে ভালোবাসতে চায়। আগ্নেয়গিরির লাভার মতো সে তার শরীরকে দহন করে চলেছে। মালতির চোখে জয়ন্ত এখন পুরুষ। জয়ন্তর কাছে ভালোবাসা ছিল জৈব, ভালবাসা তার কাছে যৌন। জয়ন্তর কথায়, শরীর না থাকলে কিছুই থাকে না ভালোবাসার। বিদ্যুতের মতো শরীরের সঙ্গে যোগ না থাকলে তার কোন মূল্য নেই। তাই জয়ন্ত আজ মালতীর দেহকে হিংস্র প্রাণীর মতো শোষণ করে চলেছে। রক্তে-রক্তে, শিরায়-শিরায় মালতীর দেহ সে উপভোগ করছে। মালতী আলস্য নারীর মতো তার জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। জয়ন্তকে পেয়ে সে উপভোগ করেছে, বিয়ের পর প্রেমের মৃত্যু হয় না। বৃষ্টি ঝরে গেলে আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে পারে জয়ন্ত এই বিশ্বাসে মালতীর জীবনকে পেতে শুরু করলো -

"জয়ন্তর জন্য মালতীর প্রতিটি অঙ্গ আজ ব্যাকুল, মালতী আজ স্বাধীনভাবে দেহ বিনিময় করে জয়ন্তকে পেতে চায়। মালতীর চোখে জয়ন্ত আজ তুমি স্বাধীন, তুমি নির্ভীক - আমার জয়ন্ত! আমার প্রাণ! আমার আলো ! তোমার জন্য আমার তেষ্টা পাচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দে তেষ্টা পাচ্ছে। আমারা - চল যাই সুড়ঙ্গে, আবার যার ছাদ ফেটে স্রোত নেমে আসে - আমার তেষ্টা পাচ্ছে, কিন্তু জল আছে খাবার ঘরে আমি কেমন করে উঠে যাই, যদি নয়নাংশু নড়ে ওঠে, কিছু বলে বা কোনভাবে আমাকে বুঝতে দেয় যে সেও ঘুমায় নি

- যদি বাধ্য হই কিছু বলতে, যদি খোলাখুলি কিছু জিজ্ঞেস করে নয়নাংশু - না, এখন চাই না, কোন কথা কাটা কাটি চাইনা এখন, আমি এখন ভালোবাসছি,- আমাকে ভালোবাসতে দাও, শুয়ে-শুয়ে তোমাকে ভালোবাসছি।" - ২৫

এইভাবে উপন্যাসের শেষ অংশে পিসীর বাড়িতে নয়নাংশু আবার চলে যেতে চাইলে বুন্নি তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই বুন্নির অনুরোধেই মালতি ও নয়নাংশু সঙ্গে জয়ন্তকে নিয়ে বুন্নি বেড়াতে গিয়েছিল। বুন্নি তাদের মধ্যে খানিকটা মিলন এনে দিয়েছিল। বুন্নির দিকে তাকিয়ে মালতির মনে ভাবান্তর ঘটল। তার মা ডাকের মধ্যে দিয়ে নয়নাংশুর মুখের ছায়া ভেসে আসে। মালতী জয়ন্তের সঙ্গে অবৈধপনায় যুক্ত হলেও সে ছিল কুসংস্কার মুক্ত মনের মহিলা, জয়ন্তর বুন্নিকে নিয়ে তার যেন নয়নাংশুর স্মৃতি বহন করে। সে নিজের স্বামীর স্মৃতি বুন্নিকে দিয়ে উপলব্ধি করে। হঠাৎ মালতীর মনে ভাবান্তর ঘটে। পুরুষকে হঠাৎ বোকা বলে মনে হয়। বুন্নিকে জড়িয়ে ধরে সে যেন অন্য জগতে চলে যায়। হঠাৎ সে নূতন কিছু আবিষ্কার করে চলেছে। -

"ছিঃ কি ভাবছি! অংশুতো কোন ক্ষতি করে নি আমার। ও ভালো, কিন্তু ওর ভালোত্ব তেমন কাজে লাগেনা - এই হয়েছে মুশকিল, কাজে না লাগার অর্থই বা কি ? আমি কি ওকে ছেড়ে গিয়েছি, না কি যেতে পারি, না কি ও-ই আমাকে কখনও বলবে চলে যাও ? না-কেউ যেন কল্পনাও না করে আমি সংসার ভেঙ্গে দেবো ! তা কি করে হয় - আমিতো বুন্নির মা। আমার জামাই হবে একদিন, কুটুম্ব হবে, নাতি-নাতনি হবে। এই সংসার আমার - তিলে তিলে আমি একে গড়েছি, সাজিয়েছি, বাড়িয়েছি। আমি অংশুর স্ত্রী - থাকবো চিরকাল - সব জেনে, সব বুঝেও অংশুকে থাকতে হবে আমার স্বামী সেজে। এই ওর শাস্তি, এই আমারও শাস্তি। আর শান্তিও এতেই।

এখন সে উপলব্ধি করেছে জয়ন্ত তার দেহকে কামনা করছে। এখন সে উপলব্ধি করে আমরা স্বামী-স্ত্রী আমার সন্তান আছে।

ঐ দেখো জীবন আমাদের অপেক্ষায় - রাত ভরে অপেক্ষায়- এসো তাকে তুলে নিই আমরা, জড়িয়ে ধরি পরস্পরের মধ্যে তোমার ঠোঁট দুটি ফুলের মতো খুলে গেল এগিয়ে এলো, অন্ধকারে তোমার কান্না ভেজা নরম হাসি - না, কথা না, ক্ষমা চেয়ো না, মালতী এসো-।" - ২৬

জয়ন্তের লালায়িত দেহ কামনা. মালতীকে বিতৃষ্ণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। মালতী যেন অচেনা দেশে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। জয়ন্তর নেশায় সে সংসারে ভালো মন্দ সব ভুলে গিয়েছিল।

মালতীর এই ভাবান্তর উপন্যাসের মধ্যে একটা গতি এনেছিল। উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন গভীর পারিবারিক সংকট কিভাবে একটা সংসারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যতক্ষণ না মানসিক পরিবর্তন হয় তা থেকে বাঁচার কোন নিশ্চয়তা নেই কোন পরিবারের। লেখক এই সত্যটিকে মালতীর পরিবারের মধ্যে দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায় নয়নাংশুর ছিল ভীরু মানসিকতা। এই মনোভাব মালতীকে জয়ন্তর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এখন তার জয়ন্ত-মোহ ভঙ্গ হয়েছে। জয়ন্তর সঙ্গে পালিয়ে নয়, ভালোবাসাটা নিজের সংসারকে বাঁচিয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রী জরুরী, বেঁচে থাকাটা জরুরী। এখন মালতী অনুভব করছে, সে ভুল করেছে, অবৈধ প্রেমে সে আর দগ্ধ হতে চায় না।

উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায় মালতি এখন নয়নাংশুর কাছে ফিরে আসছে। তার জয়ন্ত আসক্তি শেষ। নয়নাংশু এত মানসিক পীড়নের পরেও বেঁচে আছে। লেখকের চোখে নয়নাংশু মহামানব। এখন নূতন জীবনকে সাদরে গ্রহণ করতে লেখক নয়নাংশুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। লেখকের দৃষ্টিতে বৃষ্টি আর নেই। তার সামনে ঝক ঝকে মুক্ত দিন। তাই লেখক মালতীকে নূতন ভাবে গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের মাঝে তৃতীয় চরিত্র জয়ন্ত যেভাবে ফাটল ধরিয়েছিল, তা নয়নাংশুর উদারচেতা মানসিকতায় লেখক গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে জয়ন্ত মালতীর প্রেমের দৈহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে অশ্লীল বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। জয়ন্ত ও মালতী তাই অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের মাঝে মূলত দেহের উগ্র বর্ণনা করে লেখক দেখিয়েছেন চোখের নেশায় জয়ন্তকে সে ভালোবেসেছিল। এরপরও সংসার জীবনের ভালোবাসার বন্ধন কিভাবে অটুট থাকে সেই ধারণা লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।। জয়ন্তের উগ্র ভোগলিপ্সা মানসিকতাকে লেখক বেশী দূর নিয়ে যায় নি। অশ্লীল সম্পর্ক বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক মালতীর দেহজ বিবরণ এ প্রসঙ্গে সমর্থন করা যায়। তবে বুদ্ধদেব বসুর মালতীর দেহ বর্ণনাই একমাত্র

উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা পরিবার কিভাবে নূতন জীবনে ফিরে আসে তারই বর্ণনাকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা।

"বিপন্ন বিস্ময়" উপন্যাসটি ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ডি.এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কোলকাতা। প্রকাশক- শ্রী গোপালদাস মজুমদার। এই সময় বুদ্ধদেব বসুর শরীর ভালো ছিল না। উপন্যাস লিখতে হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হারিয়ে যায়। যে বুদ্ধদেব বসু এক বছরে পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছিলেন, এখন সে লেখা থেকে মুক্ত থাকতে চাইছেন। এই অনাগ্রহী মনোভাব নিয়ে বুদ্ধদেব বসু "বিপন্ন বিস্ময়" উপন্যাসটি লিখলেন। এই উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড ঃ "বিপন্ন বিস্ময়" নামে শারদীয় (১৯৫৯) উল্টারথ উপলক্ষে এটি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড ঃ "শ্রীপতি ও আরতি" - নামে ১৯৬৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় প্রকশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন -

"গ্রন্থাগারে প্রকাশের আগে উপন্যাসটিতে বহু পরিবর্তন করেছি। কোন অংশ নতুন করে লিখেছি, প্রথম খণ্ডে চতুর্থ ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদও নতুন।" - ২৭

বুদ্ধদেব বসুর ঐ দুটি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত খণ্ড নিয়ে এই উপন্যাসটি বই হয়ে প্রকাশিত হলো ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

এই উপন্যাসে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করি। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসাবে শ্রীপতিকে পাই। সে দীর্ঘদিনের রোগে শয্যাশায়ী। তার বাল্যবন্ধু দুর্গাদাস। উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায় দুর্গাদাস, হিমেন্দু তালুকদার, গৌতম, চন্দনা ও আরতিকে নিয়ে শ্রীপতির বাড়িতে যায়। এদের সকলেই শ্রীপতির খ্যাতি ও সাহিত্যে অবদানের কথা শুনেছিল। প্রত্যেকটি চরিত্রই কম বেশী সাহিত্য লেখায় ব্যস্ত থাকে। তারা "সুনন্দা" নামক সাহিত্য আড্ডায় মিলিত হয়। তারা শ্রীপতিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিল। এই পটভূমিকায় উপন্যাসটি শুরু হয়। পটভূমিকাটি ছিল দীর্ঘ দিনের প্রেম ঘটিত ব্যাপার যা শ্রীপতিকে বিতৃষ্ণায় পরিণত করেছিল। উপন্যাসে প্রেম ঘটিত ব্যাপারটি এবার আমরা দেখব। আরতি ও বন্দনা এই দুটি নারী বর্তমানে গৌতমকে নিয়ে প্রেমের প্রতিযোগিতা করছে। এই নিয়ে তাদের ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে গেছে। গৌতম লোভী শ্রেণীর মানুষ। সে ঈর্ষা পরায়ণ। কিন্তু দুর্গাদাস কোন ব্যক্তি চরিত্রকে ভালোবাসে না, সে

সকলের সঙ্গেই মুক্ত মনে মেলামেশা করে। গৌতম, আরতি, বন্দনার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে অনেক সময় দুর্গাদাসকে বিচারকের আসনে বসতে হয়েছে। দুর্গাদাস এলোমেলো গোছের। যখন যা মনে আসে তাই করে। কোন বাঁধাধরা ছকে সে চলার পক্ষপাতী নয়।

শ্রীপতিকে এই উপন্যাসের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে দেখা গেলেও তার জীবন দর্শন ছিল সকলের থেকে আলাদা। সে ছিল বুদ্ধিমান ও মহৎ মনের অধিকারী। আরতি এক সময়ে তার কাছে পড়াশুনা করতো। শ্রীপতির লেখা বই আরতির আলমারীতে ছিল। সকলেই তার এই বই পড়ার জন্য আগ্রহী। আরতীর সঙ্গে শ্রীপতির একটা দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ভিত্তিতে, উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা দুর্বলতা ছিল, যা উপন্যাসের প্রথমে আমরা দেখতে পাই। বুদ্ধদেব বসু নাটকীয় ভঙ্গীতে শ্রীপতির ভাবান্তর ঘটিয়েছেন। শ্রীপতি এখন আরতির বাড়িতে। তার সেবা যত্ন আরতি করছে। অন্যদিকে গৌতম ক্রমশ আরতিকে ছিনিয়ে নেবার চক্রান্ত শুরু করে।

শ্রীপতি এখন আরতির বাড়ির একজন সদস্য। আরতিকে এবং তার বাড়ির পরিবারকে সে নানাভাবে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে গৌতম। গৌতমের এই লালায়িত আকর্ষণের জন্য আরতিই দায়ী, কারণ আরতি তাকে কাছে আসার প্রশ্রয় দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে শ্রীপতি ও আরতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। আরতির বিয়ের পর ভাবান্তর ঘটে। উপন্যাসের আরেকটি উপকাহিনীতে আমরা সুব্রত ও জয়ন্তীকে দেখি। কিন্তু তাদের মিলনের কোন দৃশ্য দেখি না। আবার আরতি শ্রীপতি বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। আরতি আইন সম্মতভাবে শ্রীপতির সঙ্গে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আরতি যেভাবে শ্রীপতিকে পেতে চেয়েছিল - শ্রীপতি সেভাবে তার কাছে ধরা দেয় না। আরতি ছিল কামপ্রিয়া স্ত্রী। সে শ্রীপতিকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চায়। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন-

"আরতির যৌন লালসা আগে বেশী প্রবল ছিল না বিয়ের পর থেকে প্রবল হয়। শ্রীপতির বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার জ্ঞান আহরণ করা তার মোটেই পছন্দ ছিল না। স্ত্রী জীবনকে আরতি দাসত্ব বলে মনে করেছিল। প্রেম আরতির কাছে এখন "ঘেন্না।" - ২৮

এই উপন্যাসের কোন চরিত্রকেই আমরা পরিপূর্ণ সুখ ভোগ করতে দেখি না। বিবাহ, হতাশা, নিঃসঙ্গতায় এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই ধুঁকছে। উপন্যাসের শেষ অংশে শ্রীপতির প্রতি আরতির দোটানা মনোভাব লক্ষ করা যায়। আরতির চেতনায় পূর্বস্মৃতি বার বার ফিরে এসেছিল। আরতি নিজেই এখন বলছে -

"কী-সব আবোলতাবোল ভাবছি! বাজে। আরতি চোখ ফেললো ঘড়িতে, আড়াইটা বাজতে দুই মিনিট মাত্র বাকি, লাঞ্চের ছুটি এখনই শেষ হবে - নিশ্চিন্ত। কাজের জন্য তৈরী হয়ে বসল সে; মনে পড়ল তিনটের সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে কনফারেন্স আছে, কিন্তু তাকে কেন যেতে হবে সেখানে, তা যেন হঠাৎ মনে করতে পারলো না। - সত্যি, এই ছিলো তার অসহায় অবস্থা। আমি চলে যাবো এখান থেকে, এ-সব অবান্তর বোঝা আমি চাই না, আমি স্বাধীন থাকতে চাই। শুনেছি তেহরানে এদের একটা আপিশ খুলছে, আমি চেষ্টা করলে কি সেখানে বদলি হতে পারি না ? চলে যাব - ফিরে এসেও, চলে যাব আবার ? আশ্চর্য ! - স্মৃতি কি শুধু সুখ আর সুখের কল্পনা দিয়ে তৈরী, আমাদের সব দুঃখকে তা কি শেষ পর্যন্ত গালিয়ে দেয় ? না কি যাকে স্মৃতি বলি সেটাও ভুল, আসলে অতীত বলে কিছু নাই; প্রতি মুহূর্তই পরের মুহূর্তের অতীত; আজকের দিনটা যা হয়ে উঠছে তারই নাম হল গতকাল - আমরা সব সময় বেঁচে থাকি শুধু বর্তমানে। কিন্তু- একটা উল্টো টানওকি আসে না এক এক সময় ? যাকে মৃত বলে জানি তা যেন প্রাণ ফিরে পায়, জুলুম করে আমাদের উপর- না কি তা কখনও মরে না, ছেড়ে যায় না আমাদের, সঙ্গে থাকে, লুকিয়ে থাকে - তারপর হঠাৎ একদিন বেরিয়ে এসে আমাদের আত্মস্থতা নষ্ট করে দেয়। ঠিক, ঠিক, কলকাতায় আর নয়, আমাকে কেটে পড়তে হবে।" - ২৯

আরতির মনে এই আঘাত, বেদনা, জাগরণের একটি বিচিত্র সমাবেশ আমরা লক্ষ করি। শ্রীপতি একই রকম রয়েছে। তার পাওয়া ও হারানোর স্মৃতি প্রতি মুহূর্তে সারা শরীরে থাকলেও তার উষ্ণতা কাউকে দিতে চায় নি। এখন তারা পরস্পর বিচ্ছেদ হলেও উভয়েই উপলব্ধি করেছে যে সেটাই ছিল তাদের জীবন। শ্রীপতি উপলব্ধি করেছে তাদের জীবন প্রাণহীন, অস্তিত্বহীন শূন্যের মতো। এখন তারা বিচ্ছেদের মধ্যেও একে অন্যকে অনুভব করছে।

এই উপন্যাসের কোন চরিত্রকেই আমরা পরিপূর্ণ সুখ ভোগ করতে দেখি না। বিবাহ, হতাশা, নিঃসঙ্গতায় এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই ধুঁকছে। উপন্যাসের শেষ অংশে শ্রীপতির প্রতি আরতির দোটানা মনোভাব লক্ষ করা যায়। আরতির চেতনায় পূর্বস্মৃতি বার বার ফিরে এসেছিল। আরতি নিজেই এখন বলছে -

"কী-সব আবোলতাবোল ভাবছি! বাজে। আরতি চোখ ফেললো ঘড়িতে, আড়াইটা বাজতে দুই মিনিট মাত্র বাকি, লাঞ্চের ছুটি এখনই শেষ হবে - নিশ্চিন্ত। কাজের জন্য তৈরী হয়ে বসল সে; মনে পড়ল তিনটের সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে কনফারেন্স আছে, কিন্তু তাকে কেন যেতে হবে সেখানে, তা যেন হঠাৎ মনে করতে পারলো না। - সত্যি, এই ছিলো তার অসহায় অবস্থা। আমি চলে যাবো এখান থেকে, এ-সব অবান্তর বোঝা আমি চাই না, আমি স্বাধীন থাকতে চাই। শুনেছি তেহরানে এদের একটা আপিশ খুলছে, আমি চেষ্টা করলে কি সেখানে বদলি হতে পারি না ? চলে যাব - ফিরে এসেও, চলে যাব আবার ? আশ্চর্য ! - স্মৃতি কি শুধু সুখ আর সুখের কল্পনা দিয়ে তৈরী, আমাদের সব দুঃখকে তা কি শেষ পর্যন্ত গালিয়ে দেয় ? না কি যাকে স্মৃতি বলি সেটাও ভুল, আসলে অতীত বলে কিছু নাই; প্রতি মুহূর্তই পরের মুহূর্তের অতীত; আজকের দিনটা যা হয়ে উঠছে তারই নাম হল গতকাল - আমরা সব সময় বেঁচে থাকি শুধু বর্তমানে। কিন্তু- একটা উল্টো টানওকি আসে না এক এক সময় ? যাকে মৃত বলে জানি তা যেন প্রাণ ফিরে পায়, জুলুম করে আমাদের উপর- না কি তা কখনও মরে না, ছেড়ে যায় না আমাদের, সঙ্গে থাকে, লুকিয়ে থাকে - তারপর হঠাৎ একদিন বেরিয়ে এসে আমাদের আত্মহুতা নষ্ট করে দেয়। ঠিক, ঠিক, কলকাতায় আর নয়, আমাকে কেটে পড়তে হবে।" - ২৯

আরতির মনে এই আঘাত, বেদনা, জাগরণের একটি বিচিত্র সমাবেশ আমরা লক্ষ করি। শ্রীপতি একই রকম রয়েছে। তার পাওয়া ও হারানোর স্মৃতি প্রতি মুহূর্তে সারা শরীরে থাকলেও তার উষ্ণতা কাউকে দিতে চায় নি। এখন তারা পরস্পর বিচ্ছেদ হলেও উভয়েই উপলব্ধি করেছে যে সেটাই ছিল তাদের জীবন। শ্রীপতি উপলব্ধি করেছে তাদের জীবন প্রাণহীন, অস্তিত্বহীন শূন্যের মতো। এখন তারা বিচ্ছেদের মধ্যেও একে অন্যকে অনুভব করছে।

"বিপন্ন বিস্ময়" - উপন্যাসের মধ্যে তাই লক্ষ করা যায় শ্রীপতি-আরতির অস্তিত্বের মধ্যে আলোছায়ার টানাপোড়েন সবসময় ক্রিয়াশীল থেকেছে। শূন্যতাবোধ ও বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়।

বুদ্ধদেব বসুর "গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসটি ১৯৬৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিকেশন, ৩১/১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯। মুদ্রাকর নিরঞ্জন বোস, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৬।

এই উপন্যাসে দাম্পত্য জীবন থাকলেও অশ্লীলতার অভিযোগ প্রবলভাবে বুদ্ধদেবকে নাড়া দেয় নি। কারণ একই বছরে "রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি নিয়ে বুদ্ধদেবকে যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল "গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসটিতে তেমন কোন সমস্যা দেখা যায় না। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসটিকে ১৬টি ক্রমিক পর্বে ভাগ করেছেন। লেখক উপন্যাসে তিনটি দাম্পত্য জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে প্রত্যেকটি পরিবার পুরুষদের নিঃসঙ্গতার মাঝে কোন নারীকে অবলম্বন করে সংকট তৈরী করেছে।

উপন্যাসের প্রথমাংশে বুদ্ধদেব বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন কি প্রভাব ফেলেছিল তার চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। রণজিৎ বসু জবানীতে বুদ্ধদেব কথা বলেছেন। এছাড়া উপন্যাসে লেখক দাম্পত্য জীবনের ফাঁকে স্বদেশী আন্দোলনের পরিচয় দিয়েছেন, উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে দেখে তা উপলব্ধি করা যায়। তিনটি পরিবারকে এই উপন্যসে লেখক দেখিয়েছেন।

১) লেখকের জবানীতে রণজিৎ এর পরিবার।

২) ফটিক ও কাজলের দাম্পত্য জীবন।

৩) অনাদিবাবুর পরিবার।

উপন্যাসের প্রথমেই দেখি রণজিৎ এর পরিবার। রণজিৎ বিবাহিত পুরুষ কিন্তু রণজিৎ এর পরিবারে মামীমা কাজলের সঙ্গে দেহ বিনিময়ের একটি অবৈধ সম্পর্ক উপন্যাসে দেখতে পাই। পরস্ত্রী লোলুপতা রণজিৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

অনাদি পরিবারে অনাদি বর্ধনের সঙ্গে মিতুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া চলাকালীন রণজিৎ, বুলবুল ও অমূল্যর সঙ্গে পরিচয় হয় । এই পরিবারের একটি উৎসব উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আর্থার জোন্স নামে এক বিদেশী। এর সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয়। মিতুর বান্ধবী বুলবুল তীব্র ইংরেজ বিরোধী। বুলবুল স্বদেশী আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্যা, সে মনেপ্রাণে ইংরেজি চর্চার বিরোধী ছিল। সুতরাং লেখকের সঙ্গে আর্থার জোন্সের সাহিত্য আলোচনা সে ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। স্বদেশী যুগে গুপ্ত সমিতির নিয়ন্ত্রক ছিল বুলবুল। বুলবুল তীব্র ইংরেজ বিরোধী হওয়ায় রণজিৎ ও জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা সে পছন্দ করত না। কিন্তু মিতাকে বুলবুল অন্তর দিয়ে ভালোবাসে।

উপন্যাসের প্রথমে রণজিৎ ও কাজলের দেহ বিনিময়ের একটি অবৈধ সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। রণজিৎ কলেজ পড়ুয়া, যৌবনের স্বতস্ফূর্ত তাড়নায় কাজলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। রণজিৎ এর সঙ্গে আর্থারের আলোচনা মূলত সাহিত্য বিষয়ে। রণজিৎ চরিত্রের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি দূর্বলতা লক্ষ করা যায়। সে ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে এই দাবী করে।

এরপর আমরা ফটিক ও কাজলের দাম্পত্য জীবনের পরিচয় পাই। ফটিক বিলাতে পড়াশুনা করে। সে পড়তে গিয়ে কোন মেয়ের জন্য নিজ স্ত্রী কাজলকে এড়িয়ে চলে। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকাকালীন কাজলের মনে অনীহা, ক্রোধ পূঞ্জীভূত হতে থাকে। ফটিক বাড়িতে ফিরলে তার মা কোন মেয়ের প্রতি সন্দেহ করে। কাজল ও ফটিকের অনুপস্থিতিতে তাদের দাম্পত্য জীবনে রণজিৎ এর আবির্ভাব ঘটে। ফটিকের মধ্যে নিজ স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা যায় না। সে যেন নূতন সাহেব সেজে বাঙ্গালী কালচারকে অবজ্ঞা করে।

উপন্যাসের শেষে অনাদিবাবুর পরিবারকে দেখি। অনাদিবাবু হোমিও ডাক্তার, স্বদেশী আন্দোলনে সে বিশ্বাসী। গোপনে তিনি স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা করেন। বিভাবতী দত্ত ও বুলবুল এই গুপ্ত সমিতির সদস্যা, বুলবুল আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় সদস্যা। উপন্যাসের শেষ অংশ নাটকীয় ভাবে মোড় নেয়। বুলবুল, রণজিৎ এর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মিতুর আলমারী থেকে পিস্তল চুরি করে। মিতু ছিল অনাদিবাবুর মেয়ে এবং

রণজিৎ এর প্রেমিকা। মিতু ও বুলবুলের প্রেমের প্রতিযোগিতায় বুলবুল পরাজিত হয়ে প্রতিহিংসার পথ নেয়। বুলবুল পিস্তল দেখিয়ে রণজিতকে সতর্ক করে দেয়।

উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা দেখতে পাই মিতার চার বছরের জেল। এই দীর্ঘ নিঃসঙ্গতার মাঝে রঞ্জিৎ কাজলের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আবার জড়িয়ে পড়ে। রণজিৎ কাজলকে যেহেতু দেহ মন সঁপেছিল তাই নূতন করে মিতুকে ভালোবাসার অভিনয় করতে সে পছন্দ করে নি। মিতুর কাছে সে আর কখনও এসে দাঁড়ায় নি। এর মধ্যেই মিতুর মা মারা যায়। স্বভাবতঃ রণজিৎ এর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে মিতু অমূল্য নামে বন্ধুকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল। উপন্যাসের শেষে বুলবুল চরিত্রের কোন অবস্থান লক্ষ করা যায় না।

এই উপন্যাসের ১৫তম খণ্ডে আমরা আরেকটি নাটকীয় মোড় লক্ষ্য করি। মিতুর মা রণজিৎ কে দেখা মাত্রই বলেছেন -

"একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে রণজিৎ। ওর পিস্তলটি চুরি গেছে। আমার গলা দিয়ে যেন বমি উঠে এলো কথাটা শুনে, অস্ফুটে বললাম, কি বললেন ? ওর শিকারের বন্দুক-টন্দুক অনেকদিন আগেই বেচে দিয়েছিলেন, শুধু একটি জার্মান পিস্তল হাতছাড়া করেন নি। ওর বাবার খুব শখের জিনিস ছিল ওটা, তাঁর স্মৃতি হিসাবে রেখেছিলেন। আমি কতবার বলেছি দিনকাল ভালো না, ও সব আপদ বিদায় করো, অন্তত ট্রেজারীতে জমা দিয়ে দাও, কিন্তু- মিতুর মার গলা ধরে এল, কথা শেষ হল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম সত্যই চুরি হয়ে গেছে ? কোথাও নেই বাড়িতে ? কোথাও নেই। থাকতো ওর শিয়রে লোহার সিন্দুকে, চাবি নিজের কাছে রাখতেন, কিন্তু উনি তো একটু ভুলো মানুষ, কখনও হয়তো অসাবধানে রেখেছিলেন - কি করে হল কে জানে। উনি শেষ কবে দেখেছিলেন পিস্তলটাকে ? শেষ কবে ... ? তা তো ঠিক জানিনা আমি - ও পড়েই থাকে সিন্দুকে মাসের পর মাস, হঠাৎ খেয়াল হল তো খুলে একদিন পরিষ্কার করলেন - ঐটুকু তো সম্পর্ক। শিগগির বের করেছিলেন কি - পরিষ্কার করতে ? হ্যাঁ দিন দশেক আগে বের করেছিলেন বাবা, জবাব দিল মিতু। আজই ধরা পড়ল যে নেই ? আজই। এই খানিক আগে - সিন্দুক থেকে অন্য একটি জিনিস বের করতে গিয়ে দেখা গেল পিস্তলটি নেই।" - ৩০

বুলবুল তাদের এই সম্পর্কের মাঝে একটা নূতন প্রশ্ন চিহ্ন তুলে ধরে। তা হল রণজিৎ কে নিয়ে। বুলবুলের একতরফা ভালোবাসা রণজিৎ এর স্থূল দেহ কামনার কাছে কখনও ধরা পড়ে নি। মিতু ও রঞ্জিৎ এর ভালোবাসায় বুলবুল সৃষ্টি করল একটা ব্যবধান। বুলবুল স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও মন থেকে রণজিৎ তাকে ভুলতে পারে নি। মিতু ও রণজিৎকে নিয়ে ভালোবাসার সোনালী দেশ গড়ার স্বপ্ন হয়তো শেষ হতে চলেছে - এই আশঙ্কা বোধ করেছিল। মিতুর মনে গড়ে ওঠা প্রেমের সংকলন ধীরে ধীরে জোৎস্না মাখা কুয়াশার মতো যেন ঝাপসা হয়ে এল। যেন কোন নামহীন অস্তিত্ব থেকে যখন হঠাৎ একটি ছন্দে বাধা সুন্দর পঙক্তি লাফিয়ে ওঠে কবির মনে; আর তখনই তিনি জানতে পারেন যে একটি ষড়যন্ত্র তার জীবনকে শেষ করে নিতে চেয়েছিল।

মিতু ও রঞ্জিৎ দুজনেই বুলবুলের হিংসা থেকে কোন অজানা দেশে যেতে চায়। তারা দুজনেই উপলব্ধি করেছিল হয়তো কোন হাঙ্গামা হবে, কোন অজানা কৌশল তাদের পেছনে কাজ করছে। উপন্যাসে একদিকে স্বদেশী আন্দোলন অন্য দিকে ত্রিভূজ প্রেমের আতঙ্ক উপন্যাসে একটি অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধকালীন মানুষের মনে যে অবিশ্বাস, অস্থিরতা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ এই উপন্যাসের নর-নারীর মধ্যে দেখতে পাই। উপন্যাসের প্রত্যেকটি নর-নারীই তাদের কাঙ্খিত ভালোবাসা পেয়ে সুখী হতে পারে নি। মিতা অমূল্যকে, রঞ্জিৎ কাজলকে পেয়ে সুখী থাকতে হয়েছিল। উপন্যাসে বুলবুলের অবস্থান শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়ায় তা লেখক দেখান নি।

৪) প্রেমের উপন্যাস ঃ

"বিশাখা" উপন্যাসটি ১৯৪৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ডি.এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শিলাদিত্য সিংহ রায়। দে'জ পব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড় ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩। উপদেষ্টা - রবি দত্ত। প্রুফ সংশোধন রঞ্জন সরকার।

উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বিশাখা। হৃদয়রঞ্জন ও অমলা দেবীর সুখের দাম্পত্য জীবনে বিশাখা নিয়ে এল আশার আলো। বাড়ির বড় মেয়ে বিশাখা। স্বভাবত পরিবারের স্নেহ মমতায় বড় হওয়া বিশাখা প্রথম থেকেই আদরে মানুষ হয়েছে।

বিশাখা!

না, না, আমাকে থামাতে পারবেন না আপনি- আমি - বিশাখা হঠাৎ থেমে গেলো।

তার মুখের উপর চোখ রাখল অসীম। থামলে কেন ? বলো। - কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, সে বলার মানে কি ? বলে তুমি চলে যাবে, তা তো হতে পারে না।

বিশাখা সম্মোহিতের মতো বললে, না আমি চলে যাব না।

অসীমের দুই চোখের ভিতরের তারা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিশ্বাসের সুরে বললে, যাবে না ? সে - সাহস তোমার আছে ? এক্ষুনি জবাব দিয়ো না - ভেবে দ্যাখো।" - ৩২

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে স্বামী স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা যে জীবনের কতটা ভয়ানক হতে পারে তা দেখিয়েছেন। মানুষ যতদিন স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নটাকে সত্য মনে হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে জেগে উঠে বাস্তব জগৎকে দেখতে পায়, সেই মুহূর্তেই স্বপ্ন ভুলে গিয়ে সেই বাস্তবটিকেই সত্য বলে গ্রহণ করে। স্মরজিৎ বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে ছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু স্নেহ ভালোবাসা সম্মানের সিংহাসনে বিশাখাকে কখনো সে বসায়নি। এখন বিশাখার মনে পড়লো অসীমই তার পৃথিবী। কারণ স্মরজিৎ জীবনে বড় ও প্রতিষ্ঠিত হয়েও সে কখনো দাম্পত্য জীবনের সাক্ষাৎ পাবে না। পরে এই ছিল বিশাখার শেষ সিদ্ধান্ত। তাই অসীম পৃথিবী, স্মরজিৎ এর কাছে অসীমই থেকে গেল। ড্রেসিং টেবিলের পড়াশুনা আর বাস্তব জীবনের তফাৎটা স্মরজিৎ এর কাছে আজ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। নিশ্চিতের মুঠি থেকে খসে যাওয়া বিশাখা স্মরজিৎকে আরো অন্ধকারে ফেলে দিল। স্ত্রীকে সংসারের কারাগারে রেখে স্মরজিৎ জীবনে বড় হতে চেয়ে ছিল, কিন্তু তার দায়িত্বজ্ঞানহীন বড়ো হওয়ার স্বপ্ন থেকে বিশাখা চেয়েছিল মুক্তি, একটু ভালোবাসা, তাই স্মরজিৎ এর ছকে ঢালা শারীরিক কুশলের চিঠি বিশাখাকে ধরে রাখতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। বিশাখা বিবাহিতা, সে পরের স্ত্রী। কিন্তু তার সংসার জীবন তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

স্বামী-স্ত্রীর সংসার জীবনের মধুরতা বিশাখা ও স্মরজিৎ এর মধ্যে দেখা যায় না। সে কর্মস্থলে স্ত্রীকে নিয়ে জীবনে বড় হতে কখনও চায় নি।

বিশাখা ও অসীমের অবৈধ যৌন আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী ছিল স্মরজিৎ নিজে। বাবা হৃদয়রঞ্জন এর অনুশাসনের মাঝেও বিশাখা ও অসীম নূতনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। অসীম নিজেকে বিশাখার কাছে যেতে আপত্তি করলেও বিশাখার দুরন্ত যৌনাবেগে তাকে আরো কাছে আনতে বাধ্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত অসীমের দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পী জীবন বিশাখাকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশাখার মা অমলা, বাবা হৃদয়রঞ্জনের সাদর আপ্যায়নে অসীম পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল। বিশাখার দৃষ্টিতে স্মরজিৎ মৃত। জীবন্ত মানুষের কোন আকর্ষণ সে অনুভব করে নি। জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে দিশেহারা হয়ে অসীমের প্রতি ঝুঁকে গিয়ে ছিল সে। স্মরজিৎ এর বিবাহিতা স্ত্রী, অন্যদিকে নিজের কন্যা হিসাবে অসীমের প্রতি বিশাখার এই অবৈধ প্রণয়াকর্ষণ হৃদয়রঞ্জন ভালো চোখে দেখে নি। কিন্তু কন্যার আর্ট শেখার সদিচ্ছা অসীমকে কাছে আসতে আরো সাহায্য করেছিল। আবার বিশাখা তার স্বামীকে কখনও নিজের কাছে টানতে পারে নি, সব সময় স্মরজিৎকে দূরে রেখেছে। যেকোন স্ত্রীরই একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত থাকে, যার দ্বারা পুরুষকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সেই গুণ বিশাখার মধ্যে দেখি না। যার ফলে সে স্মরজিৎ এর বিদেশ যাত্রা বন্ধ করতে পারে নি।

উপন্যাসের শুরুতে বুদ্ধদেব বসু প্রেমে পড়া নিয়ে হৃদয়রঞ্জনের মা বাবার মনে যে একটা সঠিক ধারণা ছিল সেই ব্যাপারটা দেখিয়েছেন। সাধারণতঃ প্রেম ব্যাপারটা বলতে আমরা বিয়ের আগেই বুঝি। বিয়ের পরেও যে প্রেমের উন্মেষ ঘটে এই বিষয়টি বিশাখা ও অসীমের প্রেম দিয়ে দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু।

"তিথিডোর" উপন্যাসটি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করেন আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। মুদ্রণ, প্রিন্ট ও গ্রাফ - ৯ সি. ভবানী দত্ত লেন, কোলকাতা - ৭৩। প্রচ্ছদ রূপায়নে এস্কয়ার। গ্রন্থ স্বত্ত্ব শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু।

উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত-

প্রথম শাড়ি ঃ প্রথম শ্রাবণ

করুণ রঙিন পথ

যবনিকা কম্পমান

এই উপন্যাসে কোলকাতার এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের পরিচয় পাই। উপন্যাসে রাজেনবাবু বা রাজেন মজুমদার গৃহ কর্তা। শিশিরকণা তাঁর স্ত্রী। রাজেনবাবু ও শিশিরকণার সংসারে পাঁচটি মেয়ে এবং একটি ছেলে। শ্বেতা, মহশ্বেতা, সরস্বতী, শাশ্বতী, স্বাতী এবং একমাত্র ছেলের নাম বিজন। শিশিরকণার মৃত্যুর আগেই শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও সরস্বতীর বিয়ে হয়ে যায়। তারা তখন শ্বশুরবাড়িতে থাকে। উপন্যাসের প্রথমে দেখি গৃহ কর্তা রাজেনবাবুর সংসার। তার পাঁচ কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে সুখের সংসার। এই সংসারে পুত্র কন্যাদের নাবালক অবস্থায় রেখে রাজেনবাবুর স্ত্রী শিশিরকণা মারা যায়। ফলে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে গৃহ কর্তা রাজেবনাবুর উপর। রাজেনবাবু উদার স্নেহশীল প্রকৃতির মানুষ। সে ত্যাগী, পরোপকারী। স্ত্রী শিশিরকণার মৃত্যুর পর রাজেনবাবু স্নেহ দিয়ে সন্তানদের বড় ও শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর বেদনা তিনি অন্তরে অনুভব করলেও মেয়েদের উপর তার প্রভাব পড়তে দেন নি। তিনি মেয়ে শাশ্বতীর সঙ্গে উগ্র কমিউনিষ্ট হারীতের বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু জামাই এর আচরণ রাজেনবাবুর কাছে কখনও ভালো লাগেনি। কারণ শাশ্বতীকে সে ভালোবাসে, কিন্তু শাশ্বতীর উপর হারীতের মানসিক অত্যাচার রাজেনবাবুকে বিরক্ত করে তুলেছিল। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু একটি কমিউনিষ্ট চরিত্র অঙ্কন করে নূতনত্ব দেখিয়েছেন। ফলে পরিবারের সঙ্গে এই চরিত্রটির পদে পদে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। কমিউনিষ্ট ভাবধারা সমাজে কিভাবে পরিবর্তন আনে হারীত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তা বুঝতে পারি। তিনি সমাজে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আনতে চেয়েছিলেন। কমিউনিষ্ট মতবাদ শাশ্বতী মেনে নিলেও অন্য মতাদর্শের মানুষ রাজেনবাবু তা মানেন নি। ফলে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মার্কসীয় মতাদর্শের বিরোধ উপন্যাসে নিঃশব্দে প্রত্যেকটি চরিত্রে প্রভাব ফেলেছিল তা বুঝতে পারা যায়। কারণ শাশ্বতী ও স্বাতীকে পাশাপাশি অঙ্কন করে বুদ্ধদেব বসু স্বাতী চরিত্রকে আরও গুরুত্ব দেবার জন্য শাশ্বতী চরিত্রটিকে হঠাৎ করে লেখক উহ্য রেখেছেন। পাঁচ বছরের মাতৃহীন শিশু স্বাতী তার জামাইবাবু অরুণকে বিবাহ করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে অবোধ মনের পরিচয় দিয়েছিল। এখানে চরিত্রটি অন্যান্য চরিত্র থেকে আলাদা। সে বাবার আদর, স্নেহ, মায়া, মমতায় দিদি ও দাদাদের স্নেহস্পর্শে বড় হয়ে উঠেছিল। উপন্যাসে এই ভাই বোনের সম্পর্কের ছত্রছায়ায় সে লালিত হলেও কখনও উচ্ছন্নে যাওয়ার উপক্রম হয় নি। সংযম তার চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। স্বাতীর কলেজ জীবন উপন্যাসে আলাদা গতি এনেছিল। কলেজ জীবনে তার প্রেম পদ্ম বিকশিত হয়েছে। স্বাতীর মনে এই প্রেম উন্মাদনার ক্রম বিকাশ খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই

ঘটতে দেখা যায়। কলেজ জীবনের বান্ধবীদের মেলামেশায় তার জীবন গতিকে প্রভাবিত করতে দেখা যায় না। স্বাতী প্রভাবিত হয়েছিল কলেজের অধ্যাপক সত্যেন মিত্রের ভাবাদর্শের কাছে। সত্যেনকেই স্বাতী জীবনের জীবনসঙ্গী করতে চেয়েছিল। সত্যেন তার শিক্ষার গাম্ভীর্যে নিজেকে সুপ্ত রাখলেও স্বাতীকে সে একমাত্র অবলম্বন হিসাবে ভেবেছিল। ফলে সত্যেন কলেজের অধ্যাপক হয়েও ছাত্রী স্বাতীকে নিঃশব্দে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে আলাদা গতি এসেছিল। তাদের এই পারস্পরিক ভালোবাসার সুপ্ত ঢেউ উভয় পরিবারকে প্লাবিত করে। পরিবারগত সম্মতি জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে বিয়ের আয়োজন থেকে শুরু করে বিয়ের সমাপ্তি পর্যন্ত একটি উত্তেজনাহীন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দিয়ে ঘটতে দেখা যায়। কোন অতিরিক্ত উত্তেজনা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উপন্যাসে দেখা যায় না। গোটা উপন্যাসটি যেন একটি পারিবারিক সম্মেলন। বুদ্ধদেব বসু এই পারিবারিক সম্মেলনে আগত অতিথিদের স্নেহের বোন স্বাতীকে নিয়ে একটা নাটকীয় পরিবেশ অঙ্কন না করে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের যেন বক্তৃতা দিয়েছেন।

গৃহকর্তা রাজেনবাবু উদার ও স্নেহশীল পিতা। স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতা, বন্ধুত্ব এই গুণগুলি রাজেন চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত ছিল। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে এই গুণগুলির খুটিনাটি তথ্য ও ভাব তুলে ধরেন। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর এখন অবিবাহিত দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলে নিয়ে সংসার দায়িত্ব পালন করেন রাজেনবাবু। "প্রথম শাড়ি ঃ প্রথম শ্রাবণ" খণ্ডে শিশিরকণার মৃত্যু, শ্বেতা-মহাশ্বেতা ও সরস্বতীর বিবাহ, স্বাতীর সঙ্গে সত্যেন আর শাশ্বতীর সঙ্গে হারীতের পরিচয় পর্ব লক্ষ করি। দ্বিতীয় পর্বে সত্যেন ও স্বাতীর প্রেমের ক্ষীণ দৃশ্য লক্ষ করা যায়। সত্যেন কলেজের অধ্যাপক ছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন অসামান্য গুণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

"যবনিকা কম্পমান" খণ্ডে স্বাতীর বিবাহের আয়োজন। বিয়ে শেষ করার পর থেকে সমস্ত বিবরণ আমরা লক্ষ করি। শাশ্বতীর বিয়ে হয় এক উগ্র কমিউনিষ্ট হারীতের সঙ্গে। দেশে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া। ব্ল্যাক মার্কেট বা কালোবাজারীদের চলাফেরায় জীবন বিপর্যস্ত। হারিত উগ্র কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী। তার এই আদর্শ রাজেনবাবু ভালো চোখে মেনে নিতে পারেন নি। কাজেই হারীতের সঙ্গে শাশ্বতীর সংসারে মতের বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

এবার রত্নেশ্বরের এই সাংসারিক পরিচয়ের পর লেখক কিভাবে উপন্যাসে আরো জটিলতা এনেছিল, সেই দিকটা এখন আমরা তুলে ধরবো। ভাগ্যদোষে রত্নেশ্বরের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এন্ডারসন কোম্পানীর চাকুরী থেকে সে বরখাস্ত হয়ে পড়ে। রত্নেশ্বরের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল এন্ডার সাহেব। চাকুরী থেকে অব্যাহতি পেয়েও রত্নেশ্বর এখনও পেনশনের আশা ছাড়ে নি। বন্ধুর কাছে তিনি বিমলের চাকুরীর আবেদন করেন। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় রত্নেশ্বর পেনশন ও বিমলের চাকুরীর আশা ছেড়ে দেয়। এখন সে বাড়িতে মস্তিষ্ক যন্ত্রণা নিয়ে উন্মাদের মত দিন কাটাতে থাকে। একদিকে পিতা অন্যদিকে সংসারের এই অসহায় মুহূর্তে পুত্র বিমল পিতাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে। বিমল মিথ্যার আশ্রয় নিল। "এন্ডার সাহেবের কোম্পানীতে চকুরী করি" এই সংবাদ বিমল এনে বাবাকে অনেকটা সুস্থ করে তোলে। এই কৌশলটা দিদি গায়িত্রীর অজানা ছিল না। গায়ত্রীই বর্তমানে সংসার পরিচালনা করে। গায়ত্রী স্থির বুদ্ধি ও আদর্শবান মহিলা, সাংসারিক অনটনের মধ্যেও দায়িত্ববান অভিভাবক হয়ে সংসার পরিচালনা করছে। এই অবস্থায় বিমল ও গায়িত্রী দুজনেই সংসার চালানোর ভার নিল। হতাশা, ব্যর্থতার সমস্ত দায়ভার মাথায় নিয়ে বিমল ও গায়ত্রী এগিয়ে যাবার নূতন পথ আবিষ্কার করে। এখান থেকেই উপন্যাসে আরেকটি গতি লক্ষ করা যায়।

এই সংকটময় মুহূর্তে সংসার থেকে মুক্তি পাবার আশায় বিমল তার কলেজের বন্ধু অমরেশের কথা মনে আসে। অমরেশ অভিজাত পরিবারের সন্তান। দুই মাতৃ হারা বোনকে নিয়ে তাদের সংসার। সেখানে উপস্থিত হয়ে বিমল তার দরিদ্রতার পূর্ণ বিবরণ বন্ধুকে শোনানোর পর উভয় পরিবারের মধ্যে শুরু হল যাওয়া আসা। বিমলের সঙ্গে অমরেশের দুইবোন নিভা ও বিভার শুরু হলো সাহিত্য আড্ডা ও তর্ক বিতর্ক। বিমলকে ভালোবাসতে শুরু করে নিভা। বিমলের দিদি গায়ত্রীদেবী তাদের এই ভালোবাসাকে স্বাগত জানায়। বিমল দারিদ্র্যের চাপে এই ভালোবাসার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করে। এদিকে অমরেশের সঙ্গে গায়ত্রী দেবীর একটা নীরব প্রেমের বাতাবরণ তৈরী হয়। বিমল ও নিভার প্রেমের ঘনিষ্টতা লক্ষ করে অমরেশ গায়ত্রীকে বিমলের সাথে নিভার বিয়ের প্রস্তাব করে। গায়ত্রী রাজী হলেও বিমল তার দারিদ্রের অজুহাতে নিজেকে সব সময় সরিয়ে রাখতে চায়। উপন্যাসের শেষে দেখি পরিবারগত সম্মতিতে বিমল ও নিভার এবং অমরেশ ও গায়ত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

উপন্যাসটিতে বুদ্ধদেব বসু বিধবা গায়ত্রীকে অমরেশের হাতে তুলে দিয়ে বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বুদ্ধদেব ধনী ও দরিদ্রের অসম প্রেমকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে যে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান নেই তা তিনি দেখিয়েছেন। ধনী মেয়ে কিভাবে দরিদ্রের সংসারকে মানিয়ে নিল, তা আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই। উপন্যাসে বিমল, গায়ত্রী দেবী ও নিভা চরিত্রে বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিমল নিভাকে ভালোবাসলেও সে ভালোবাসার মধ্যে আলাদা কোন যৌন তাগিদ লক্ষ করা যায় না। সুবোধ ছেলের মতো নীরবে নিভাকে সে ভালোবেসেছিল। বিমলের দিক থেকে এই ভালোবাসা ছিল অপ্রকাশ্য। নিভার মধ্যে বিমলকে ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

"এক বৃদ্ধের ডায়েরী" বুদ্ধদেব বসুর শেষ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৭২ সালে লেখা হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ - ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ঃ দে'জ পাব্লিশার্স, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭৩। এই উপন্যাস লেখার সময় বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ক্লান্ত। তাঁর শরীরের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। অসুস্থ শরীর নিয়ে বুদ্ধদেব বসু উপন্যাস লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসে দৈনন্দিন জীবন কাহিনী নিয়ে একটি অভিজাত পরিবারের তিনি ডায়েরী রচনা করেছিলেন। অনেকে এটাকে উপন্যাস না বলে ডায়েরী বলে থাকেন।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বীরেন্দ্রনাথ সিং এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ করে এঁকেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা বীরেন্দ্র সিং এর পরিবারকে দেখি। বীরেন্দ্র সিং-এর মেয়ের নাম মায়ালতা, স্ত্রীর নাম অমলা। বীরেন্দ্র সিং-এর বোন ঊষা তাদের বাড়িতে থাকে। এই নিয়েই বীরেন্দ্রবাবুর সংসার। উপন্যাসে মায়ালতার লেখাপড়া, অভিনয় চর্চাকে নিয়ে বাড়ির সকলেই ছিল তার প্রসংশায় পঞ্চমুখ। মায়ালতা বিদেশে পড়াশুনা করে। কিন্তু সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে "রামায়ণ" - "মহাভারত" এর উপর আলোচনা করে সে খ্যাতি লাভ করেছিল। এরপর মায়ালতাকে দেশের বাড়িতে ফিরে আসতে দেখি। ফিরে এসেই বুদ্ধদেব বসু, মায়ালতার বিদেশ যাত্রায় যে পুরুষটি (রণেন) সাহায্য করেছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। রণেনের সাঙ্গে মায়ালতার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক উভয় পরিবারের অজানা ছিল না, বিয়ে দিতেও তারা সম্মত ছিল। কিন্তু মায়ালতা বিদেশ চলে যাওয়ায় তাদের বিবাহ দূর অস্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষে

আমরা দেখি অভিনয় শিল্পীর প্রতি মায়ালতার ভালোবাসার ঝোঁক। রণেনই তাকে এই অভিনয় জগতে এনেছিল, কিন্তু তার কথা এখন মায়ালতা ভুলে গেছে।

উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রণেন ও মায়ার সঙ্গে মিলন দৃশ্য দেখা যায় না। উপন্যাসের ডায়েরী লেখার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। বিক্ষিপ্ত তারিখের ঘটনাগুলি যুক্ত করে লেখক যেন উপন্যাসের আকার দিয়েছেন। রণেন চরিত্রের আলাদা বৈশিষ্ট উপন্যাসে দেখা যায় না। মা অমলার স্নেহের আড়ালেই মায়ালতাকে দেখা গেছে। একজন বিদেশে পড়া মেয়ের যে স্বভাব বৈশিষ্ট্য আচরণ হওয়া উচিৎ তা উপন্যাসে দেখা যায় না। বীরেন্দ্র সিং ও অমলা ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেবার যে আয়োজন উপন্যাসের প্রথমে দেখি উপন্যাসের শেষে সেই ইচ্ছা পূরণ হয় নি। বুদ্ধদেব বসু যেন প্রত্যেকটি চরিত্রের চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌছোনোর আগেই ঘটনার ইতি টেনেছেন। তাই উপন্যাস হিসাবে এক বৃদ্ধের ডায়েরী ততটা সার্থক বলে মনে হয় না।

"মনের মতো মেয়ে" উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিকের উপন্যাস। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাসটি রচিত হয় এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোলকাতা - ৭৩ । মূল্য- ৫ টাকা। উপন্যাসটি চারটি খন্ড শিরোনামে বিভক্ত। প্রতিটি খন্ডকে পৃথক গল্প বলে মনে হয়।

প্রথম খন্ড ঃ মাখনলালের দুঃখের কাহিনী।
দ্বিতীয় খন্ড ঃ গগনবরণের গল্প
তৃতীয় খন্ড ঃ অবনি ডাক্তারের বিয়ে।
চতুর্থ খন্ড ঃ সাহিত্যিকের স্বগোতক্তি।

উপন্যাসে প্রথমে দিল্লীওয়ালা, কনট্রাকটর, ডাক্তার এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শুরু করেছেন। তারপর দেখি মাখনলালের পরিবার। মাখনলালের মায়ের নাম হিরন্ময়ী দেবী। মাখনলাল হিরন্ময়ী দেবীর একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও একরকম প্রতিজ্ঞাবশত ছেলেকে বি.এ. পাশ করিয়েছিল। পাশের বাড়ির সুভদ্রবাবুর বি.কম. পাশ মালতির সঙ্গে মাখনলালের বিয়ের প্রস্তাব করে হিরন্ময়ী। হিরন্ময়ী নিজের ও বাবার বাড়ির আভিজাত্য নিয়ে অহঙ্কার করে। সে প্রতিবেশি সুভদ্রবাবুর মেয়ের সঙ্গে

মাখনলালের বিয়ে দিতে চায়। সুভদ্রবাবু কলেজের প্রফেসার। আভিজাত্য বজায় রাখতে হিরন্ময়ী প্রফেসরের মেয়ে পছন্দ করে। কিন্তু সুভদ্র বাবুর মেয়ে মালতী হীরন্ময়ী দেবী ও তার পুত্র মাখনলালকে খুব কাছাকাছি দেখেছিল। সুতরাং বিয়ে তো দূরের কথা, তাদের প্রতি একটা ঘৃণা ছিল। মালতির বাড়ির সকলকে সে কাছ থেকে দেখেছে। হীরন্ময়ী দেবী বিকল্প হিসাবে পাত্রী পছন্দে ছিল রাঘববাবুর মেয়ে। রাঘববাবু সুরা দোকানের মালিক হওয়ায় তার আপত্তি। কিন্তু প্রফেসর হিরন্ময়ীর এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। হিরন্ময়ী সুভদ্রবাবুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ হয়ে নানা রকম অশালীন মন্তব্য করতে হিরন্ময়ী দ্বিধা করে নি।

কিন্তু ঘটনাচক্রে সুভদ্রবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। মাখনলাল সৌজন্যের খাতিরে মালতির বাড়িতে গেলে মাখনলালকে তাদের বাড়িতে আসতে মালতি নিষেধ করে। মাখনলাল তাতে দুঃখবোধ করে না। মাখনলাল নির্বোধ শ্রেণীর চরিত্র। সে অত অপমান, দুঃখ বোঝে না। তাছাড়া মাখনের বুদ্ধি নিতান্ত ক্ষীণ, বোঝার মতো তার বোধ ছিল না।

এই খণ্ডের পরে লেখক তুলে ধরেন অবনী ডাক্তারের বিয়ে। অবনীবাবু অবিবাহিত যুবক, মা বাবা স্বর্গতা হয়েছেন। এই বাঁধনহারা সাংসারিক পরিমণ্ডলে তার উচ্ছন্নে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অবনী নিজেকে সামলে নিয়েছিল তার সংযমী চরিত্র বলে। এই গল্পে তার স্ত্রী বীণার পরিচয় পাই। সে বীণাকে কিভাবে ভালোবাসার কৌশলে এনেছিল এবং ভালোবাসা কিভাবে বিয়েতে রূপান্তরিত হলো তার রোমান্টিক বিবরণ লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই খণ্ডে শৈলেশবাবু ও হিরণ্ময়ী দেবীর সুখের সংসারে রমেন অবনিকে নিয়ে আসে। অবনী ডাক্তারী করতে এসেছিল বীণার। সে ক্রমে বীণার প্রেমের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রমেনকে বিয়ের কথা বললেও সে অস্বীকার করে। এখানে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন অসিত, সিতাংশু আর বিকাশ তিনজনে একজন করে মেয়েকে ভালোবেসেছিল। প্রথমে অন্তরা ও পরে মোনালিসাকে তারা তিনজনে ভালোবাসত। বুদ্ধদেব প্রত্যেক পুরুষ চরিত্রকে দিয়ে কোন না কোন মনের মতো মেয়ে খুঁজতে চেয়েছেন। প্রত্যেকটি মেয়ে অভিজাত্য পূর্ণ পরিবারের মেয়ে। তাদের মেলামেশার পরিবারগত সমস্যা নেই। তারা উচ্চশিক্ষিতা সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী ও প্রত্যেকেই সাহিত্যিক। আবার উপন্যাসের এই খণ্ডে সেই কনট্রাকটার, ডাক্তার এবং দিল্লীর চাকুরীওয়ালা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ট্রেনে করে অদৃশ্য হওয়ার একটি

কাহিনী লেখক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে দিল্লীওয়ালা, ডাক্তার যেন এক একটি খণ্ডের ঘটনাকে পরবর্তী খণ্ডে নিয়ে যায়। এর পরেই আসে গগনবরণের গল্প। গগনবরণ চ্যাটার্জি দিল্লীতে থাকেন। তার কলকাতায় বাড়ি হলেও দিল্লীতে থাকেন। কালে ভদ্রে কলকাতায় কাজে আসেন। বাংলাদেশেই তার জন্ম। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরেরই ছেলে। সতের বছর বয়স পর্যন্ত সে মফঃস্বলের শহরে কাটিয়েছে। তার সঙ্গে পাখি নামে মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার বিবরণই গল্পের বিষয়বস্তু। পাখি এখন বিবাহিত। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্কের কোন ব্যবধান ঘটে নি। পাখির বাড়ির উৎসব উপলক্ষে পাওয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গগনবরণ তার বড়িতে আসে। সেখানে পারিবারিক কথাবার্তায় তাদের পূর্বের স্মৃতি বার বার ভেসে উঠেছে।

এই তিনটি খণ্ডের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন প্রত্যেকটি পুরুষ আপন মনের মানুষকে খুঁজতে বের হয়েছে। কখনও যুবক যুবতীরা এই প্রেমের অন্বেষণে দিশেহারা হতে দেখি, কখনও বা বিবাহিত পুরুষকে প্রেমের পূর্ব স্মৃতির রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে মনের মতো মেয়েকে অন্বেষণ করতে দেখা যায়। তিনটি খণ্ডের মধ্যে যেন কোন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। শুধু কনট্রাকটার ও দিল্লীওয়ালা চরিত্র দুটি উপস্থিতি দিয়ে লেখক যেন খণ্ডগুলির মিলন সেতু রচনা করেছেন।

"দুই ঢেউ এক নদী" এই উপন্যাসটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি পারিবারিক উপন্যাস নামে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। "দুই ঢেউ এক নদী" উপন্যাসটির প্রকাশক এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোলকাতা - ৭৩। মূল্য- ৫ টাকা।

একটি পরিবারের পটভূমিকায় উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। দুই ভাই ও বোনের প্রণয়ের কাহিনী এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অরুণা ও অশোক পিতা মাতার সম্মতি ছাড়া অন্য কোন পুরুষ ও নারীকে বিয়ে করে পিতার ক্রোধের শিকার হয়েছে। এতে পিতার ছেলের প্রতি ক্রোধ হলেও মাতা তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছিল। শুধু মেয়ের পরিবার ও শ্বশুর অশোকের বাবার মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়া উপন্যাসে একটি অস্থিরতার সৃষ্টি করে। অভিভাবকদের মধ্যে শুরু হয় যুক্তি-তর্কের ঘাত-প্রতিঘাত। এই ঘটনা বুদ্ধদেব বসু যে সংলাপ দিয়েছেন তার মধ্যে শব্দের পরিপাট্য ও ভাষার নৈপুণ্য

লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের ঘটনা বুদ্ধদেবের অন্যান্য উপন্যাস থেকে আলাদা নয়। শেষ পর্যন্ত অশোকের শ্বশুরমশাই মেয়ের কাছে পাঠানো অর্থ সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

উপন্যাসের মধ্যে অরেকটি উপকাহিনী হলো সুমন্ত ও মায়ার পত্র বিনিময়। এর মাধ্যমে তাদের জীবন রহস্য উন্মোচিত হয়। দুটি তরুণ প্রেমের একটি মোহময় প্রীতি ব্যাকুলতা ও মেলামেশার আকুতি ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করেছে। দুজনের চিঠিগুলি উভয় পরিবারের দিক থেকে একটি সরল নির্দোষ, প্রায় অজ্ঞাতসারে কাজ করে চলেছিল। সংসারে আর পাঁচটি ঘটনার মতো এটাকে তাঁরা দেখেছিল, কিন্তু তার পরিণতি ও কামনার উচ্ছ্বাস যখন প্রবল মাত্রায় দেখা দেয় তখন পরিবারের সকলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাদের প্রেমের পূর্ণরূপ উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি। অপরিণত বয়সের দুটি কিশোর, প্রেমের পরিমন্ডলে চলা ফেরা করলেও সুগভীর চঞ্চলতা উপন্যাসে দেখা যায় না। কিশোর প্রেমের পূর্ণ বিকশিত রূপ উপন্যাসে না দেখিয়ে বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ যেন ছেদ টেনেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৩৩০

২) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ দ্বিতীয় খন্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৬০২।

৩) সাড়া উপন্যাসের নূতন সংস্করণের ভূমিকা/বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/দ্বিতীয় খণ্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৬০২

৪) সম্পাদকীয় কলমে, আনন্দবাজার পত্রিকা/১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৩

৫) আমার ছেলেবেলা/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ মার্চ- ১৯৭৩, প্রকাশক- সুপ্রিয় সরকার, মুদ্রক- পরাণচন্দ্র রায়, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২/পৃষ্ঠা- ২৭

৬) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/৪র্থ খণ্ড/প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ১১৮

৭) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম পূনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশক- রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। /পৃষ্ঠা- ৪৫৭

৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / তৃতীয় খণ্ড /দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৮৩

৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/ষষ্ট খণ্ড /প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ , এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪/ পৃষ্ঠা-৩৭৩

১০) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ/৫ম খণ্ড/ বিশেষ সংস্করণ - ১৯৮০/দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১৫৯

১১) জীবনের জলছবি/প্রতিভা বসু/প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫/ প্রকাশক- সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠ-৩৫

১২) জীবনের জলছবি/প্রতিভা বসু, / প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫/ প্রকাশক- সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ১৬২।

১৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/চতুর্থ খণ্ড/ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৪৫৯

১৪) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / দ্বিতীয় খণ্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ /পৃষ্ঠা- ২৭৩

১৫) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / প্রথম খণ্ড/ দ্বিতীয় প্রকাশ ৯ই মে ১৯৯১/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৩৬০

১৬) ঐ / পৃষ্ঠা- ৩৬০

১৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / পঞ্চম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ১৭০

১৮) বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ,অষ্ঠম খণ্ড/বুদ্ধদেব বসু প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১/এ বঙ্কিম চট্টপাধ্যায় স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩/ পৃষ্ঠা- ৩৪৬

১৯) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম পূনমুর্দ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশক- রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। / পৃষ্ঠা- ৪৫৪

২০) সত্যেন্দ্র নাথ রায় / বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা/প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০/দে'জ পাবলিশিং/ কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২১৫

২১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / পঞ্চম খণ্ড/ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৪৭০

২২) কনিষ্ঠা কন্যাকে চিঠি / ১২/০৬/১৯৭১ "কবিতা", বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, বর্ষ-২১ সংখ্যা-১

২৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / পঞ্চম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২৩০

২৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম পূনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশক- রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩। / পৃষ্ঠা- ৫৬০

২৫) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / সপ্তম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৩১৮

২৬) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / চতুর্থ খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ / প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ৩২০

২৭) জীবনের জলছবি/প্রতিভা বসু, / প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫/ প্রকাশক- সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১১০

২৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / নবম খণ্ড / দ্বিতীয় প্রকাশ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯২/ প্রকাশক - আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক - হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ১১১

২৯) দশটি উপন্যাস /বুদ্ধদেব বসু, গোলাপ কেন কালো, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিকেশন, ১৩,বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট,কোলকাতা-৭৩,পৃষ্ঠা- ৪৮৫

৩০) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১২৪

৩১) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১২৩

৩২) তিথিডোর/ বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / সপ্তম খণ্ড / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ /গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২৭৮

৩৩) ঐ/পৃষ্টা- ২৯০

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপ

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপ

"শিল্প হল মানুষেরই করা কোন বস্তু"

- ১

সৃষ্টির অপার রহস্য মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে তার চিন্তা ও চেতনায়। এই ফুটে ওঠার মধ্যেই গঠন আঙ্গিকে সত্যতা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই বলতে পারি, মানুষের সৃষ্টিশীল জড় সত্য যখন কল্পনার দ্বারা সজীব ও বাস্তব জীবনের অনুভবে সর্বদা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তখনই মানুষের শিল্প সত্ত্বা বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষ স্বভাবশিল্পী বলেই জগৎ ও জীবন তার রূপে রসে মানব সত্ত্বার অলৌকিক প্রতীকে মুক্ত করে দেয় তার সৃষ্টি কর্ম। এই সৃষ্টি কর্মই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। তাই মানব মনের জিজ্ঞাসাই হলো সাহিত্য শিল্পের জিজ্ঞাসা। তাইতো সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্কে যথার্থভাবে বলেছেন -

"জীবনকে তাঁরাই দেখতে পান যাঁরা মনে মনে জীবন থেকে একটু সরে দাঁড়াতে পারেন। যাঁরা তা পরেন তারাই শিল্পী। তাঁরা যা পরিবেশন করেন, তা অবশ্যই বানানো। কিন্তু বানানো মিথ্যা নয়, বানানো সত্য।" - ২

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন -

"সব শিল্পেই কালের সত্য আর তথাকথিত কালাতীত সত্য, দুই সত্য এক সঙ্গে মিশে প্রায় একাকার হয়ে থাকে।" - ৩

তাই সাহিত্যের মধ্যে অন্তর বাহিরের সকল স্থান ও কালের সীমা পেরিয়ে এক অপরূপ সৃষ্টি রূপ দান করে। লেখক শুধু নিজেকেই সাহিত্যে রূপদান করে না, মনুষ্যত্বের সার্বিক ও চিরন্তন প্রকাশকে সাহিত্যে তুলে ধরে। তবে সাহিত্য শুধু মানব সত্ত্বার অভিব্যক্তি বহন করে না। মানুষের চিন্তা চেতনা ও ভাবনাকে লেখক রচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় -

"যাকে জগৎ বলি, জীবন বলি, তাও সাহিত্য। যা শিল্প বা সাহিত্য নামে পরিচিত, তা জীবনেরই বিশিষ্ট প্রকাশ। তা অনুকরণ নয়, স্বাধীন সৃষ্টি। তবে, তাকে জীবনের রূপায়ণ বলতে কোন বাধা নেই।" - ৪

এই জীবনকে ছুঁয়ে যায় সমাজ, সুতরাং এই সমাজকে সাহিত্য শিল্পে অস্বীকার করা যায় না। সমাজের শৈল্পিক প্রতিফলন না ঘটলে সাহিত্যের পরিপূর্ণতা আসে না, যা সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, বিকাশ ও বিবর্তনকে শিল্প রূপ প্রদান করে। আবার শিল্প জিজ্ঞাসা নিয়ে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন -

"শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে অনুকরণ " - ৫

কিন্তু অনুকরণ নিজে সত্যের প্রতিমূর্তি। সত্যের মধ্যে থেকেই শিল্পের জন্ম হয়। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল এই মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে কাব্য শিল্প হৃদয়বৃত্তিমূলক কল্পনার প্রধান সৃষ্টি এবং তার উপাদান হল রূপ ও ভাববস্তু।

তবে অ্যারিস্টটলের ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা একমত হয়েছেন। তিনি যে কোন ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টিকে শিল্প হিসাবে দেখার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ শিল্প মনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন সাহিত্যে অবশ্যই মানুষের কথা থাকবে। সাহিত্যিক মানুষের সুখ দুঃখের দ্বারাই হোক, আবার প্রকৃতি বর্ণনা করেই হোক - নিজেকে সে প্রকাশ করবে। সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানব ধর্ম নেই, তা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের কথা স্মরণ করতে পারি -

"সাহিত্যে মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্যকেই প্রকাশ করে থাকে তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশ শক্তির উৎসাহ মাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। কারণ প্রকাশই আনন্দ। সাহিত্যেও মানুষ কতো বিচিত্র, তবে নিয়ত আপনার আনন্দ স্বরূপকে অমৃত রূপকেই ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়" - ৬

মানুষের এই সার্বিক প্রকাশ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আলাদা ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কাব্যে যেভাবে জীবনকে দেখা যায়, উপন্যাসে ঠিক সেভাবে নয়। কবিতায়

মানুষের ইমেজ একভাবে আসে আবার উপন্যাস বা গল্পে ঠিক সেভাবে আসে না। তবে একথা বলতে পারি যে, উপন্যাস হল মানুষের জীবন আলেখ্য। জীবনকে নিয়ে উপন্যাস। জীবনের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। তবে এ কথা ঠিক যে গোটা জীবনের ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দিলেই উপন্যাস হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গ্রহণ বর্জন প্রয়োজন। গ্রহণ বর্জনের দ্বারা মানুষের জীবনের ঘটনাকে একটা পাটার্ণ বা ছকে বিন্যস্ত করে তোলাই ঔপন্যাসিকের প্রধান কাজ। এই কাজ কোন বাঁধা ছকের নিয়মে আসে না। লেখকের প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির সুগভীর পর্যবেক্ষণ থেকেই আসে। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"আর্টিষ্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর-সেগুলির মধ্যে গ্রহণ-বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মত। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে কোনোটাকে কমাতে। কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।" - ৭

এই বিষয় প্রকাশ করতে গিয়ে এসে পড়ে উপন্যাসের ফর্ম। কারণ কাহিনী বা ঘটনা শুধু উপন্যাসে থাকে না। তার সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত থাকে। সুতরাং আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সামগ্রিক বিষয় ও আঙ্গিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই বলতে পারি উপন্যাস যেন একটা শরীর। কাজেই অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে তার অঙ্গশৈলীর কথা। কাহিনী, চরিত্র, লেখকের কথনভঙ্গি, সংলাপ, জীবন দর্শন, সময় ও দৃষ্টিকোণ- এগুলি উপন্যাসের প্রধান শর্ত। তবে ঐ বৈশিষ্ট্যের সবকটি উপন্যাসে সার্থকভাবে রূপায়িত হবে এমন ভাবা ঠিক নয়। উপন্যাসে সময়ের বা কালের একটা বড় ভূমিকা আছে। সমাজের সামগ্রিক রূপ, কালের বিবর্তন আমরা উপন্যাসে দর্পণের মত দেখতে পাই। সেখানে ব্যক্তির সংঘাতময় জীবন ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপন্যাসে ফুটে ওঠে।

শুধু সমাজিক জীবনই নয়, উপন্যাসের প্লট, সংলাপ ও চরিত্র গঠনে শিল্পরূপের চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়ে। তবে সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে পারে যদি লেখকের প্রকাশগুণ থাকে। এই প্রকাশের মাত্রা যুগের প্রচলিত নিয়মকে কেন্দ্র করে সবসময় গড়ে ওঠে না। তা রাজনৈতিক, সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব, সংঘাতময় মুহূর্ত বিশেষ করে যা

মানুষের মনে রেখাপাত করে সেই ঘটনাগুলির রূপ তুলে ধরাই লেখকের কর্তব্য। লেখকের শিল্প শৈলীর কুশলতার উপরেই এই ঘটনাগুলি বাস্তব হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আর্ণষ্ট ফিসার এর মতকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে, মৌলিক শিল্প সব সময়ই তার সমকালের মতাদর্শের সীমাকে ছাড়িয়ে যায় এবং মতাদর্শ যে বাস্তবকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখে, সেই বাস্তব সত্যকে দেখার অর্ন্তদৃষ্টি আমাদের দান করে।

উপন্যাসের এই বাস্তবতা নিছক জাগতিক বাস্তবতায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। তা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রকে বর্তমানের উপযোগী করে চিহ্নিত করতে হয়। চরিত্রের বাস্তবতাই হল উপন্যাসের বাস্তবতা, যা চরিত্রের আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ঔপন্যাসিকের কুশলী সংলাপের মধ্যে দিয়ে। তখন আমাদের সামনে চরিত্রটি জীবন্ত মানুষ হয়ে ওঠে। সাহিত্যকে তাই বলতে পারি কুশলী নির্মাণ ও সামাজিক চেতনার ফসল। তার সঙ্গে লেখকের ভাষা শৈলীর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সুতরাং লেখক সে সময়ের পটভূমিকার স্বরূপটি ভাষার মধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সে সময়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার লেখার মধ্যে উঠে আসাই স্বাভাবিক। কারণ যুগের ধারায় প্রচলিত হয় উপন্যাসের নর-নারীর বিচরণের নিশানা। সময়কালের কোন ঘটনাকেন্দ্রিক উৎস কেন্দ্র থেকে লেখক কুলের যাত্রাপথ ঐ নিশানা ধরে চলতে থাকে। উপন্যাসের এই প্রকৃত যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী, প্লট, ঘটনা, চরিত্র, উপকাহিনী ও বিষয় ভাবনা কথাসাহিত্যের প্রতিমা হয়ে উঠেছিল। উপন্যাসের এই প্রতিমা গড়তে তিনি দেশী বিদেশী সাহিত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের কথনে এসেছিল নাটকীয় ভঙ্গি। বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাসের নূতন সম্ভাবনার পথ তুলে ধরেছিলেন অবশ্য তার অনেক পরে উপন্যাসের শিল্প আঙ্গিকে বৈচিত্র্য দেখা যায়। উপন্যাসের রূপ ও রীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যা ছিল ক্রমশঃ তার পরিবর্তন ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কল্লোলীয় লেখকদের আগমন ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পরে কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে একটা বড় পরিবর্তন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রথম দিকে যে আঙ্গিক ও বিষয়ভাবনা কাজ করেছিল শেষের দিকের উপন্যাসে তা দেখা যায় না। তিনি সচেতনভাবে উপন্যাসের বিষয় ভাবনার মধ্যে একটা নূতন রীতির বেশ পরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তে যা দেখা গেল "রাজর্ষী" উপন্যাসে তা দেখা যায় না। "চোখের বালি" উপন্যাস বাংলা উপন্যাস জগতে প্রকরণের নূতনত্ব এনেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের প্লট, ঘটনা ও চরিত্র অঙ্কনে তিনি

সচেতনভাবে পূর্বসূরীদের রীতি ও ভাষাকে শিল্পের অঙ্গনে আনার অভিপ্রায় দেখান নি। কথাসাহিতের লেখকের অভিজ্ঞতা সবসময় এক থাকে না। যুগের পরিবর্তনে তার বিষয়ভাবনা ও শিল্প কুশলের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন উপন্যাসের আঙ্গিকে সমানভাবে লক্ষণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কল্লোলে প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক ও কল্লোল সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের শিল্প কৌশলে নূতনত্ব এসেছিল। তবে তাঁরা সচেতনভাবে আঙ্গিক চেতনার পরিবর্তন আনতে অনাগ্রহী ছিলেন। অনেকটা যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজ ব্যাবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে তাদের শিল্প কৌশল দেখা গিয়েছিল। বঙ্কিমের অনেক পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বঙ্কিমীয় রীতি, আদর্শ ও আঙ্গিক ভাবনার কিছু নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্করের "ধাত্রিদেবতা", "গণদেবতা", "পঞ্চগ্রাম", "কালিন্দী" উপন্যাসের প্লট গঠনে ও চরিত্রের সমস্যা রূপায়নে বঙ্কিমীয় রীতি কিছুটা অনুসরণের ছাপ দেখা যায়। আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অলৌকিকতা ও রোমান্টিক রীতি লক্ষ করা যায়। বিভুতিভূষণের কল্পনাপ্রবণ মানসিকতা গল্পের ভাষাকে ও বাস্তবকে অনেকটা রোমান্টিক মোড়কে বাঁধতে চেয়েছিল। তাই তাঁর "দেবযানী" উপন্যাসে যে রীতি অবলম্বন করলেন "আদর্শ হিন্দু হোটেল" ও "আরণ্যক" উপন্যাসে বিষয় ভাবনা ও রীতি সেইভাবে উঠে আসে নি। প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসের সর্বাঙ্গে অবস্থান করেছে। ফলে চরিত্রগুলি বাস্তবতা পেলেও খানিকটা রক্ত-মাংসের মানুষের পরিপূর্ণতা থেকে দূরে ছিল। আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রে একটা দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। তিনি উপন্যাসের কাহিনী ও আঙ্গিক ভাবনায় বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তবতার নীরিখে হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম প্রকাশে সচেতন ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে জীবনের কামনা বাসনার দিকটি খুব সচেতনভাবে উপন্যাসে উঠে এসেছিল। উপন্যাসের সংলাপে যেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। যার ফলে গল্পের চরিত্রগুলি আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। তিনি তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, সহজ ও সাবলীল বাকরীতি দিয়ে উপন্যাসে গতি এনেছিলেন। যেমন "পুতুলনাচের ইতিকথা" উপন্যাসের প্রথম বাক্যেই দেখতে পাই -

"সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল- অনাহারে মৃত্যু"। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অশ্লীলতার ঝাঁঝ থেকে খানিকটা দূরে জটিল জীবনের দ্বন্দ্বে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আর এই ভাবনা তাঁর শিল্পী মনের ভিতর থেকে এসেছে। তা উপন্যাসের কাঠামোয় তিনি তুলে ধরেন। যেমন- "অনেকে বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা

চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূল ভিত্তি জীবনী শক্তির দ্রুত অপচয়- ব্যক্তিগত অথবা সঙ্গবদ্ধ জীবনের।"- ৮

কল্লোল কালের লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একটি আবেগ আনতে চেয়েছিলেন। এই আবেগ ছিল বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ঝলমলে দীপ্তিতে মেশানো। তিনি উপন্যাসে একটি তীর্যক ও ধ্বনিময় শিল্প চাতুর্য এনে কাব্য ঘেঁষা সংলাপে চরিত্রের অন্তলোক উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধকালীন মানুষের হতাশাগ্রস্ত জীবন তাঁর উপন্যাসের শৈলীতে ফুটে উঠেছিল। তাঁর "কাক জ্যোৎস্না", "প্রথম প্রেম", "আসমুদ্র", "প্রাচীর ও প্রান্তর" ইত্যাদি উপন্যাসে গদ্যরীতি রোমান্টিক ভাবনায় চরিত্রগুলি রূপায়িত হতে দেখি। এই রোমান্টিক ভাবধারার আরেক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর উপন্যাসের গদ্যরীতির ভাবধারা উচ্ছল ও প্রাণবন্ত হয়েছিল। নাগরিক সভ্যতার নর-নারীর দেহ চেতনার দিকটা তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পেল। উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সমাজে মানুষের বীভৎসতা ও কুৎসিত রূপ তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। নর-নারীর কামনা, বাসনার মধ্যে একটা জীবন্ত অথচ কৃত্রিম পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের সংলাপ ও ভাবধারা আপাত দৃষ্টিতে কৃত্রিম হলেও তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সময় প্রবোধকুমার স্যান্যাল উপন্যাসের শরীরের মধ্যে দিয়ে চরিত্রের মনোলোকের ছবি তুলে ধরেছিলেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যও খানিকটা স্বতস্ফূর্ত ও স্বপ্রতিভ বলে আমাদের মনে হয়। তিনি চিন্তাকে শিল্পের নিখুঁত স্তরে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। কল্লোলকালের এই সব তরুণ কথসাহিত্যিকদের রচনায় বিদেশী লেখকদের ভাবধারা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। শিল্প চাতুর্য, বাক্য ও শব্দ ব্যবহারে উপন্যাসে একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল। এই সব তরুণ লেখকদের উপন্যাসের গঠন রীতিতে একটা দৃঢ়তা ও সাবলীলতার ভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলিতে শিল্পশৈলী কিভাবে উঠে এসেছে তা আলোচনা করবো।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপ আলোচনা করতে গিয়ে প্রাথমিক একটা সমস্যা আমাদের কাছে হাজির হয়। বুদ্ধদেব বসু শুধু উপন্যাসই লিখতেন না, শুধু গদ্যশিল্পীই ছিলেন না, অনেকে তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় কবি বলে মনে করেন। সুতরাং কবিদের লেখা গদ্যরীতি প্রচলিত গদ্য লেখা থেকে আলাদা চেহারার হবে একথা অস্বীকার করা যায় না। একজন ঔপন্যাসিক যেমন যুক্তিতর্ক - বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার অর্থভেদী

শব্দবাণে চরিত্রকে পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলেন, তেমনি কবিরা কবিতার মোহিনীশক্তি বা বাস্তবতার লাবণ্যে পাঠকের হৃদয়কে দখল করতে চান। এই দুটি সাহিত্য শাখার সাড়া জাগানোর কাজ যে আলাদা, আমরা সাহিত্য আলোচনায় তা বুঝতে পারি। তবে আপাত দৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও কবিরা অনুভবের শৃঙ্খলে লিখতে থাকেন। তাই বুদ্ধদেবের লেখায় এল কোমলতা মেশানো শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রের পায়ে কোন বেড়ি পরায় না। তারা প্রাণের লাবণ্যে উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

তবে এ কথা ঠিক যে, কোন কবি যখন উপন্যাস লেখেন তখন তার চরিত্রগুলি গদ্যের যে পোষাক পরে থাকে, একজন খাঁটি ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে তা না হতেও পারে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে তাই চরিত্রের সংলাপ যেন প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে কোন অজানা জগতে পৌঁছোতে চেয়েছিল। বুদ্ধদেবের গদ্য সংলাপ যেন পাঠকের মনে এক সংবেদী আবেগ সৃষ্টি করে। তাই প্রচলিত উপন্যাসে বুদ্ধদেব যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা সচরাচর অন্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দেখা যায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কবির লেখা গদ্য সংলাপ এবং ঔপন্যাসিকের লেখার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব একই বন্ধনীতে আলোচনা হতে পারেন। বাকীদের গোত্র আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব দুজনেই গদ্যে স্বচ্ছতা, সাবলীলতাকে নিজের করে এঁকেছেন। অনেক সময় এদের উপন্যাসের মধ্যেও কাব্যিকতার ইমেজ চলে এসেছিল। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের উপন্যাসে সব সময় আমরা একটা অনুভবী দৃষ্টি দেখি। তিনি চরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে কিছু আবিষ্কার করার যেন চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে কবিত্ব যেন চরিত্রের অন্তঃলোকে প্রবেশ করার অন্যতম হাতিয়ার। কারণ তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অধিকাংশই কবি ও সাহিত্যিক। যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে খুব কম লেখকের রচনায় এই রকম সাহিত্যিক নায়ক নায়িকাদের দেখা যায়। যেটা বুদ্ধদেবের উপন্যাসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসে এই সাহিত্যিক চরিত্রগুলি এসেছিল। সুতরাং বুদ্ধদেব উপন্যাসের ভাষায় শব্দ, বর্ণ ও অর্থের মধ্যে ভারসাম্য ও মতামতের দৃঢ়তা এবং বাক্য-অনুচ্ছেদ পরম্পরার ব্যাখ্যা যথার্থ বলে মনে হয়। কবিতা সুলভ ভাবনা ও নায়ক নায়িকাদের কল্লোলীয় চেতনার আন্দোলন তাঁর উপন্যাসে দেখা যায়। কল্লোলকালের লেখকদের উপন্যাসে সমাজ জীবনের বাঁধাধরা ছক থেকে অনেক দূরে একটা নূতনত্বের আঙ্গিক ভাবনা এসেছিল। তাই কল্লোলের যে আন্দোলন শুধু

উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে ছিল না, ছিল শিল্পরূপে। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন-

"কল্লোলের বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রেও। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়।"- ৯

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী লেখকদের উপন্যাসে ভাষার যে অজস্র উপমার উপস্থিতি দেখি, বুদ্ধদেবের উপন্যাসে তা দেখি না। বুদ্ধদেব যেন চলমান সাহিত্য জগতের যে আন্দোলন চলছিল সেই আন্দোলনে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদেরও সামিল করেছিলেন। দেশীয় কালচার অপেক্ষা বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের সংলাপে ইংরাজী শব্দ, বিদেশী কবিদের ইংরেজী কবিতার পঙক্তি ব্যবহার করতে দেখি। উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজে যে প্রতিমা গড়ার কাজে বুদ্ধদেব ব্যস্ত ছিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে উপমা রূপক, চিত্রকল্প অলঙ্কার একান্ত সাধারণ পরিবেশ থেকে আনেন নি, তা এসেছিল লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতার আলো থেকে। যার ফলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম পরিবেশে মানানসই হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে সামাজিক রূপ বিন্যাসের ছাড়পত্র সবসময় পেয়েছিল, যার ফলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা উচ্চশিক্ষিত। একেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসের শিল্পরীতির বিশিষ্ট্য লক্ষণ বলা যেতে পারে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি এসেছিল সমকালীন কল্লোলীয় চেতনা থেকে। তাঁর উপন্যাসে সাম্যবাদী আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মানুষের জীবনের জৈব ধর্ম যে একটা প্রবল সত্য তা উপন্যাসে দেখা যায়। এই জৈবিক চাহিদাগুলি সুপ্ত মনের চাওয়া পাওয়ার বিশেষ দিকগুলি উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে মানুষের চিরন্তন যৌন চেতনার সাক্ষ্য নর-নারীর জীবনের মধ্যে দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে কলকাতা নগরী বুদ্ধদেবের উপন্যাসে চলাফেরায় প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। তিনি প্রচলিত যে ধারাকে সে সময় ফেলে এসেছিলেন,- তা আরোহন করেন নি। বুদ্ধদেব বসু কোন মান বা মডেলকে অনুসরণ করে উপন্যাস রচনা করেন নি। কিন্তু দেশি বিদেশি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রূপরীতির ক্ষেত্রে বিদেশী লেখকদের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর উপন্যাসে ক্রুস্ত, ভার্জিনিয়া, উলফ, ম্যাসমান প্রভৃতির লেখকদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর ভঙ্গি সর্বদা গল্প করার। বিভিন্ন চরিত্রের সমবেশ ঘটিয়ে তিনি যেন আপন মনে গল্প বলেছেন। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের সহজেই তিনি বিচরণ করাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।

বুদ্ধদেব উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সংখ্যার ও ক্ষমতার দিক দিয়ে বেড়ে ওঠা, তাদের মানসিক যে পরিবর্তন দেখা যায় সেই দিকটা তুলে ধরেছেন। যার ফলে বুদ্ধদেব উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে সবসময় একটা হতাশা ও নিঃসঙ্গতার ছাপ রেখেছেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে দেহ গঠনের রীতি একান্ত নিজস্ব। তিনি স্বল্পসংখ্যক চরিত্র নিয়ে উপন্যাসের প্লট গঠন করেছিলেন। অবশ্য বুদ্ধদেব শেষের দিকের উপন্যাসে শিল্পভাবনার নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের "সাড়া" উপন্যাসে কল্পনার যে বিস্তার ও যৌনতা, দেহ মিলনের পূর্বাভাস দেখি, শেষের দিকের উপন্যাসে তা ছিল না। ফ্রয়েডীয় চেতনা তাঁর "সাড়া" উপন্যাসে কাজ করেছিল। যার ফলে তাঁর উপন্যাসে বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে একটি কল্পনার শৃঙ্গে নায়ক নায়িকাদের বিচরণ করতে দেখা যায়।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে এক বা একাধিক উপকাহিনী নেই। তিনি উপকাহিনী যোগে প্লটকে জটিল করে তুলেছেন বলে মনে হয় না। চরিত্রগুলির কথাবার্তায় বুদ্ধদেব খেলার সঙ্গী ও বাল্য স্মৃতির কথা বার বার বলেছেন। সংলাপে ছোটগল্পের পরিমিতি বোধ কাজ করেছে। ঘটনার বিস্তৃত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পক্ষপাতী ছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে রোমান্স, প্রেম ও কামনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। বুদ্ধদেব দেহ কামনার চূড়ান্ত মুহূর্ত দেখানোর আগেই উপন্যাসের পরিণতি দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব কোলকাতা কেন্দ্রিক জীবন, কোলকাতার বিভিন্ন মহলকে উপন্যাসের প্লটে এনেছেন। ঘটনা বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সতর্ক। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের কায়িক অবয়ব তাই ছোট।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে বর্ণনা অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রে কখনও রোমান্টিক আবেগ বিস্তৃত ও গভীরতর কোন উদ্দেশ্যেই এসেছে। অকারণ কবিত্বও উপন্যাসে অনেক সময় এসেছিল। সরল উপাদানকে তিনি উপন্যাসে গ্রহণ করে চরিত্রের স্বভাব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে তা যেন জটিল হয়ে উঠেছিল। তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসাবে সাহিত্য প্রেমিক মানুষদের কথা দেখা যায়। তাদের দেহজ কামনা বাসনার মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্গতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যার ফলে তাঁর

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতার দিকটি ফুটে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে যে বিষয়গুলি একাধিক বার এসেছে তা হল -

(১) চিঠি ও ডায়েরী লেখা, (২) স্বপ্ন, (৩) বৃষ্টি, (৪) সাহিত্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, (৫) সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা, (৭) ইংরেজ কবি ও লেখকদের আলোচনা, (৮) বারবণিতা চরিত্র, (৯) বখাটে চরিত্র, (১০) হতাশা (১১) পত্র বিনিময় (১২) রূপ বর্ণনা (১৩) ভ্রমণ, (১৪) অতি লৌকিক উপাদান।

বুদ্ধদেবের দৃষ্টিকোণে শিল্পরূপের বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তিনি শুধু দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনে একই বিষয়বস্তুর স্বাদ আস্বাদনের জন্য উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে তিনি ততটা সতর্ক ছিলেন না। তিনি উপন্যাসের কোন বিষয়ে সোজাসুজি আলো ফেলতে চান নি। কোন মৌলিক ভঙ্গিতে বিশেষ দিক দিয়ে আলো ফেলতে চেয়েছেন। তিনি প্রচলিত কোন বিশেষ যৌনতা লাভের ফ্রেমে মানুষকে বার বার পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু কোলকাতার নাগরিক জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। দেখার এই রীতিটি কবির দৃষ্টিতে উদার যৌবনের আবেগ মিশ্রিত চোখ দিয়ে। তিনি মনের ভিতরে আলো ফেলে জীবনের আকাশকে আলোকিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। যৌন জীবনকে আসক্তিতে লিপ্ত করা তাঁর যেন অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আসক্তির মাঝেও তাঁর আদর্শ কোথাও লঙ্ঘিত হয় নি।

বুদ্ধদেব বসু যে আঙ্গিক উপন্যাসে এনেছেন তার বেশির ভাগই প্রেম বিষয়ে। প্রেমের পরিণতি বেশিরভাগ উপন্যাসে দেখা যায় না। বিধবা বিবাহ প্রসারে তার অন্তরের অপরিসীম স্বীকৃতি ছিল। তার এই ভাবনা বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। তাঁর উপন্যাসে আত্ম-ভাবনা ও আত্মজিজ্ঞাসার কোন আকস্মিক ঘটনার তাড়না দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

১) গীতি কাব্যিকতা ও নারী মনের উপলব্ধি উপন্যাসের প্রারম্ভিক কয়েকটি অধ্যায়ে রয়েছে কিন্তু চরিত্রগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হতাশায় ধুঁকছে।

২) উত্তেজনাময় ঘটনা ও পরিবেশ তৈরীতে লেখকের কল্পনার জগৎ কৃত্রিম ভাবে এসেছে। বুদ্ধদেব বসু পরিবেশগত কোন বাহ্যিক ঘটনা বা প্রকৃতি যেন কোন উপাদান এনে যোগ করেন নি।

৩) উপন্যাসে নর-নারীর প্রেম নিবেদনের স্থান হিসাবে বুদ্ধদেব বসু কোলকাতা শহরকে বেছে নিয়েছিলেন। কোলকাতার মানুষের জীবন যাত্রা, কামনা, বাসনা, মনের আবেদন ও অবচেতন মনোভাব বুদ্ধদেব বসুর শিল্পে নৈপুণ্যের সঙ্গে এসেছিল।

৪) ভালোবাসার অন্তসারশূন্যতার কথা বুদ্ধদেব তাঁর প্রেমের উপন্যাসে দেখিয়েছেন। প্রেম থেকে বিরহের কোন আকর্ষণ তাঁর উপন্যাসে তেমনভাবে দেখা যায় না। শুধু "বিশাখা" ও "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে এই বিরহের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

৫) বুদ্ধদেব বসু প্রেমের উপন্যাসে বলার ভঙ্গি, কথোপকথন ও বিষয়বস্তুতে সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য লিখনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সাহিত্য আলোচনার বিষয় হিসাবে দেশি, বিদেশি লেখকদের স্থান দিয়েছেন।

৬) নাট্যরসের কিছু উপাদান বুদ্ধদেবের এই প্রেমের উপন্যাসে দেখা যায়। "মন দেয়া-নেয়া"উপন্যাসে নায়ক তার বন্ধুদের দ্বারা নিজ প্রেমিকার সঙ্গে দেহ বিনিময়ের দৃশ্য দেখা যায়। এছাড়া বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নির্লজ্জভাবে নায়ক-নায়িকারা প্রিয়জনকে জীবনসঙ্গিনী না করে যৌন খেলায় মেতে উঠতে দেখা যায়।

৭) প্রেমকে বুদ্ধদেব বসু অবিবাহিত যুবক যুবতীর ক্ষেত্রে সম্মোহন মূলক ভঙ্গি নিয়ে এবং দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রে অবৈধ প্রণয় দেখিয়েছেন কিন্তু তার পরিণতি সম্পর্কে কোন আভাস উপন্যাসে দেখা যায় না।

৮) বুদ্ধদেব বিশ্লেষণ রীতিকে কয়েকটি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। মুখ্য চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমকে দেখিয়েছেন। অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ক্ষেত্রে অনেক চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করি।

৯) বুদ্ধদেব প্রেমের উপন্যাসে চরিত্রগুলি আত্মভাবনাশ্রয়ী। প্রাত্যহিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি বড় হয়ে ওঠে নি। এছাড়া চরিত্রের সমন্বয়ের কোন কার্যকর ভুমিকা উপন্যাসে দেখা যায় না। স্বাধীন ভঙ্গি নিয়ে চরিত্রগুলি রচিত।

১০) বুদ্ধদেব বসু প্রেমের উপন্যাসে চরিত্রগুলির মনের সুপ্ত আকাশে একটি নূতন রীতি দেখিয়েছেন তবে এই নূতন রীতি চরিত্রের আকাশে অনেক সময় অধরা থেকে গেছে। চরিত্রগুলি ভাবুক প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। চরিত্রগুলি প্রেমের ব্যাপারে ছিল অভিনব। বুদ্ধদেব দৃষ্টিভঙ্গির জটিল চিন্তার জালে, সাময়িক অনুশাসনে উপন্যাসের চরিত্রদের মরতে দেন নি।

এবার বুদ্ধদেবের সমগ্র উপন্যাসকে বিভিন্ন রীতিতে ভাগ করে আলোচনা করবো।

১) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস

যবনিকা পতন, রডোডেনড্রন গুচ্ছ, অদর্শনা, হে বিজয়ী বীর, মন দেয়া-নেয়া, নির্জন স্বাক্ষর, হাওয়া বদল।

২) প্রথম পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস

যেদিন ফুটলো কমল, পরিক্রমা, পরস্পর।

ক) নাট্যরীতি সংমিশ্রণ

বিশাখা, দুই ঢেউ এক নদী

খ) পত্র বিনিময় ও ডায়েরী রীতি

অকর্মণ্য, এক বৃদ্ধের ডায়েরী

গ) আত্ম কথন রীতি

সাড়া, সানন্দা, একদা তুমি প্রিয়ে, লাল মেঘ, পরস্পর, ধূসর গোধূলী, বাড়ি বদল, অনেক রকম, অসূর্যাম্পর্শা, সূর্যমুখী, চৌরঙ্গী, পাতাল থেকে আলাপ

৩) বর্ণনা ও বিবৃতি প্রধান রীতি

ক) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে

আয়নার মধ্যে একা, প্রভাত ও সন্ধ্যা।

খ) লেখকের জবানীতে

মৌলিনাথ, নীলাঞ্জনের খাতা, আমার বন্ধু, শেষ পাণ্ডুলিপি।

গ) প্রথম পুরুষের সরাসরি উক্তি

ধূসর গোধুলী, বিপন্ন বিস্ময়

৪) চেতনা প্রবাহ রীতি

ক) কালো হাওয়া, শোনপাংশু, রুকমী।

খ) চলিত বাক্ রীতি

বাসর ঘর

৫) বহু কথন রীতি ঃ

মনের মতো মেয়ে, তিথিডোর।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপেকে বিভিন্ন রীতিতে ভাগ করার পর এবার আমরা বিভিন্ন রীতির উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে দেখবো।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকা এবং কোলকাতা; বিশেষ করে কোলকাতার সমকালীন নাগরিক জীবন তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছিল - একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা সাহিত্য সাধনায় ব্যস্ত ছিল। এই সব বিষয় তাঁর উপন্যাসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের পটভূমিতে মানুষেরা এসেছিল মধ্যবিত্ত জীবন থেকে। তারা সকলেই শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়। কেউবা ইংরাজী কালচারে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাসে কোলকাতার মধ্যবিত্ত নগর জীবনের মানুষের চলার দুরন্ত গতিকে স্থান দিয়েছিলেন।

১) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস

এই পর্বে "যবনিকা পতন", "রডোডেনড্রন গুচ্ছ", "অদর্শনা" উপন্যাসগুলি আলোচিত হচ্ছে। এই পর্বের উপন্যাসে জীবনের যে রূপ প্রকাশিত তা লেখকের ভাবুকী ঘটনাবলী দিয়ে সাজানো। "যবনিকা পতন" উপন্যাসে তৃতীয় পুরুষের জবানীতে লেখক গোটা ঘটনাটির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। অমিয়, মৃগাঙ্ক ও ইন্দ্রজিৎ এই তিনটি পুরুষ চরিত্র এঁকে উপন্যাসে যেন একটা জটিল প্যাটার্ণ তৈরী করেছেন। এখন আমরা এই উপন্যাসের গঠন শৈলী নিয়ে আলোচনা করবো।-

বুদ্ধদেবের "যবনিকা-পতন" (১৯৩১ খ্রীঃ) উপন্যাসে শিল্প নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে যে কাহিনীকে বুদ্ধদেব নির্বাচিত করেছেন তা খুব প্রশংসার বিষয় নয়। যৌন লালসা তাড়িত বখাটে চরিত্র অমিয়কে উপন্যাসের কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন। এই চরিত্রের মধ্যে জীবনের ঘটনা একই ভাবে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে দেখি মানুষ কখনও জীবনে স্বাধীন ভাবে চলতে পারে না। লেখক বিভিন্ন সাহিত্যিক বন্ধুদের সমস্যা ভিন্নধর্মী চরিত্রের মনে একটি পৃথক রূপ অঙ্কন করেছেন। এই সত্যকেই বুদ্ধদেব বসু "যবনিকা পতন" উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। দেহ চেতনা ও কাব্য চেতনার আকর্ষণের তীব্রতা তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব "যবনিকা পতন" উপন্যাসের দেহ চেতনার ঘটনাকে তিনটি খণ্ডের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

প্রথম খণ্ড ঃ দুই বন্ধু - তিনটি পরিচ্ছেদ।
দ্বিতীয় খণ্ড ঃ অঞ্জলি বসুর প্রেমোপাখ্যান - তিনটি পরিচ্ছেদ।
তৃতীয় খণ্ড ঃ অতি পুরাতন বিরহ-মিলন কথা - চারটি পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় ঘটনাতে এনেছেন অমিয়কে। অমিয় পৌরসভা অফিসের কর্মী। অমিয় ও মৃগাঙ্ক দুজনের গোপন চরিত্রালাপ উপন্যাসে প্রধান ঘটনা। অমিয় ধনী সন্তান হলেও বুদ্ধদেব বসু তাকে এই উপন্যাসে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। কারণ বুদ্ধদেব ভালো-মন্দের ছবি অঙ্কন করেন নি, তাই ভালো-মন্দের বিচার এই চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না।

এই উপন্যাসে নাটকীয় রীতিতে সংলাপ রচিত হয়েছে। অমিয়ের মধ্যে বাসনা, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা দেখিয়েছেন। অমিয়ের হিংসার অনল এতই প্রখর ছিল যে বন্ধু মৃগাঙ্ককে হত্যা করতে সে দ্বিধাবোধ করে নি। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যসে দেহ চেতনা ও যৌন চেতনায় নারী-পুরুষেরা কেমনভাবে বিচরণ করে তার ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মোটকথা বুদ্ধদেব বসু নারীদেহ ভোগ এবং দেহ বিনিময়ের চূড়ান্ত রূপ এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

বুদ্ধদেব উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছদে সুরার দোকানে অমিয় চরিত্রের বীভৎসতা তুলে ধরেছেন। প্রথম থেকেই অমিয় বখাটে উদ্ভট মাতাল চরিত্র, অন্যদিকে মৃগাঙ্ক নীরব, নীরেট প্রেমিক পুরুষ। সবসময় সাহিত্যকে মূলধন করে তিন-তিনটি মেয়েকে সে প্রেম নিবেদন করেছিল।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে ও চরিত্রগুলির কথোপকথন নিয়ে সমান্তরাল ও কৌণিক বিন্যাসের যে জটিল প্যাটার্ণ তৈরী হয়েছে, তা অমিয়, মৃগাঙ্ক ও ইন্দ্রজিতের জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই ঘটনাবলী বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নীচে দেওয়া হলো।

চরিত্রগুলির নাম	উপন্যাসের প্রথম খণ্ড	উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড	উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড
ছায়াময়ী	দাম্পত্য জীবন	অঞ্জলী বোস , মৃগাঙ্ক ও ছায়াময়ীর পরিচয়	মৃগাঙ্ককে ভৎর্সনা
অঞ্জলী বোস	সাহিত্যিক, স্কুল শিক্ষিকা	মৃগাঙ্কের মাধ্যমে অমিয়ের সঙ্গে পরিচয়	অমিয়ের সঙ্গে দেহ বিনিময়
অমিয়	কর্পোরেশন অফিসের কেরানী ও মৃগাঙ্কের বাল্য বন্ধু	ছায়াময়ীর সংসারে প্রবেশ করে অঞ্জলীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা।	মৃগাঙ্ককে খুন ও হতাশা
মৃগাঙ্ক	সাহিত্যিক	অঞ্জলী বোস প্রেমের সাড়াতে নিস্পৃহ	অমিয়ের বাড়িতে প্রতিবাদ, ও পরিণামে খুন

এই উপন্যাসে চরিত্রগুলির কোন ব্যক্তিত্ব নেই। এই উপন্যাসের পটভূমি কোলকাতা ও ঢাকা শহর। এছাড়া উপন্যাসে কলেজ, হোস্টেল, চিড়িয়াখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, রেস্টুরেন্ট, ধর্মতলা, শিয়ালদহ, পার্কস্ট্রীট, চৌরঙ্গী প্রভৃতি স্থানের পরিচয় বার বার এসেছে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এই উপন্যাসে অমিয় প্রথম থেকে জীবনের অর্থ করেছিল -

"লোকে পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করে অবসরের আশায়, উপভোগের উদ্দেশ্যে- আমোদ আনন্দ, হাস্যমুখর, স্ববান্ধব সন্ধ্যা; সুন্দর মেয়ের, বুদ্ধিমান পুরুষের সাহচার্য, শৈল শিখর, সমুদ্রতীর; ভালো বই পড়া, ভালো গান শোনা- এক কথায় যাকে বলি জীবন।" - ১০

আবার বন্ধু ইন্দ্রজিৎকে হত্যার পর এই চরিত্রের কোন মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সে বলেছে -

"এমন বোকা, এমন বোকা ! কেন মাথাটা কি একটু সরিয়ে নিতে পারে নি?" - ১১

বুদ্ধদেব "অদর্শনা" (১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের কাহিনীতে সরোজ পালিত নামে এক সাহিত্যিকের মধ্যে দিয়ে প্রেমের ভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন-

"ঐ মধুর স্বর যার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলো সে যে কে তা কি বলে দিতে হবে ? আপানারা নিশ্চই অনুমান করতে পেরেছেন সে-ই কালীতারা চৌধুরী।" - ১২

নাদেখা গানের প্রেয়সীকে ভালোবাসতে গিয়ে লেখক কালীতারার সঙ্গে মালবিকা নামে আরেকটি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রেমের দ্বন্দ্ব ও রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। সরোজ পলিত রূপে নয়, সত্যকার গানকে ভালোবাসতে গিয়ে গানের প্রেয়সী তার কাছে অন্য মূর্তি নিয়ে ধরা পড়ে। উপন্যাসের এই অংশে লেখক দুটি গোপন রহস্য তুলে ধরেছেন। যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অভিনব।

"আমার একটা কথা জানবার বাকি আছে। তুমি ছদ্মনামে গান গাইতে কেন, বলো তো? মুখ থেকে হাত সড়িয়ে কালী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কেন বোঝো না ? না। আমার গান শুনে যাদের ভালো লাগবে, আমাকে দেখে তারা মর্মাহত হোক সেটা আমি চাইনি। সেইজন্য মালবিকার আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়েছিলাম।" - ১৩

কালীতারা ও মালবিকার গানের এই গোপন চুক্তি লেখক উপন্যাসের শেষ অংশে দেখিয়েছেন। কালীতারার কুৎসিত রূপের মধ্যে দিয়ে এক অভিনব গায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটলো। উপন্যাসের শেষে মালবিকা চরিত্রটির কোন পরিপূর্ণতা লেখক দেখান নি। যেহেতু সরোজ পালিত গানকে ভালোবাসে তাই গানের প্রেয়সীর সঙ্গে মিলন দৃশ্য দেখিয়ে লেখক উপন্যাসটি শেষ করেছেন। কৌতুহলপূর্ণ সংলাপ উপন্যাসে আলাদা বৈচিত্র্য এনেছে। যেমন একটি সংলাপে দেখতে পাই

"প্রথম যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখন তোমার চেহারা চোখে পড়েছিল, কিন্তু এখন আমি তোমাকেই দেখি, তোমার চেহারাতো আর দেখতে পাইনে।" - ১৪

এই উপন্যাসে যথার্থ গানকে ভালোবাসতে গিয়ে গায়িকার আদর্শ ও মানবিকতার বিভিন্ন দিক বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

২) প্রথম পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস ঃ

এই পর্বে রচিত উপন্যাসগুলি হলো "যেদিন ফুটলো কমল", "পরিক্রমা" ও "পরস্পর" এই উপন্যাসগুলির শিল্পরীতি নীচে আলোচনা করা হলো। এই উপন্যাসগুলিতে প্রথম পুরুষের জবানীতে লেখক যেন গল্প বলেছেন। এই রীতিতে লেখা তিনটি উপন্যাসে বুদ্ধদেব পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নগর জীবনকে। নায়ক ও নায়িকাকে গোটা উপন্যাসে বুদ্ধদেব যেন নিয়ন্ত্রিত করেন নি, চরিত্রগুলি স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করেছে।। পাশ্ব চরিত্রের কোন ভূমিকা এখানে দেখা যায় না। লেখক নায়ক ও নায়িকার প্রেমের আলোকে তাদের ভাবজগতে প্রবেশ করাতে উৎসাহী ছিলেন। এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রের ভূমিকা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

"পরিক্রমা" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাসটি প্রথম পুরুষের জবানীতে লেখা উপন্যাস। বুদ্ধদেব দাম্পত্য পরিবারের ঘটনাকে এই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। তিনি এই উপন্যাসের ঘটনাগুলিকে আটটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। অরুণা ও প্রশান্ত, সুমিতা ও বিজন, কঙ্কন ও মল্লিকা - এই তিনটি পুরুষ ও নারী চরিত্রের প্রেম উপন্যাসের প্লটে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেবের এই উপন্যাসের নরনারীদের তেমন কোন ব্যক্তিত্ব দেখান নি। উপন্যাসে দুটি উপকাহিনী রয়েছে। চরিত্রগুলির কথাবার্তায় কোন প্রখর চাতুর্য লক্ষ করা যায় না, তবে সংলাপে নূতনত্ব দেখা যায়। উপমাকে জড়িয়ে লেখক সংলাপগুলি রচনা করেছেন -

"শুধু যদি পৃথিবীতে এত মানুষ না থাকতো! ভাবলে বরুণা। একটি অদ্ভুত নীতি আমাদের যে আমরা সাপ মারতে পারি, মশা মারতে পারি, স্বার্থের যুদ্ধ বাধিয়ে বহু মানুষও মারতে পারি। শুধু যে লোকটাকে দেখলেই আমার সমস্ত শরীর রী-রি করে ওঠে, যে আমার জীবনে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিয়েছে, বিদ্বেষের সংক্রোমণে, যে আমাকে অনেক সময় তার মতোই নীচ করে তোলে - তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে আমি বলতে পারব নাঃ যাও তুমি, তুমার মুখ দেখতে চাইনে!" - ১৭

সোমনাথ চরিত্রের কোন পরিপূর্ণতা উপন্যাসে দেখা যায়না। বরুণা নিজেকে শেষের দিকে সঙ্কীর্ণমনা রূপে ধরা দিয়েছিল। বিজন ঘোষ চরিত্রটি নারী বিদ্বেষী রূপেই লেখক অঙ্কন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে
"বাস্তবিক! মেয়ে জাতটাই শয়তানের প্রতিমূর্তি" - ১৮
এ সংলাপে "পরিক্রমা" উপন্যাসে বুদ্ধদেবের একটি নূতন রীতি ধরা পড়েছে।

"পরস্পর" (১৯৩৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের নায়ক ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। বুদ্ধদেব এই চরিত্রে কল্পনাকে বেশী মাত্রায় স্থান দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের নায়ক অশান্ত। উপন্যাসের পটভূমিতে এসেছে তার দাম্পত্য জীবনের ছবি। বুদ্ধদেব অশান্ত চরিত্রে বাস্তবের সঙ্গে যেন কোন মিল রাখেন নি। অশান্ত যেন সবসময় কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ায়। উপন্যাসের শেষের দিকে নায়কের মিলন দৃশ্য থাকলেও তা কাব্যিকতার মোড়কে ঢাকা পড়ে গেছে-
"তাকিয়ে একটু দ্যাখো, কি সুন্দর দিন।
অশান্ত রাণীর মুখের দিক তাকিয়ে রইলো।

এই দিন এখনই কেন এসে ঢুকলো ? এই দিনতো তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। না, না, ওকথা বোলো না। তাকে আসতে দাও, তাকাও তার দিকে। খুসি হয়ে তার দিকে তাকাও - আমাদের নতুন জীবনের এই প্রথম দিন।" - ১৯
দাম্পত্য জীবনের কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে দেখা যায় না।

ক) নাট্যরীতি সংমিশ্রণ ঃ

এই পর্বের "বিশাখা" (১৯৪৫ খ্রীঃ), "দুই ঢেউ এক নদী" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাস দুটির শিল্পশৈলী নীচে আলোচনা করা হলো।

বুদ্ধদেব বসুর "বিশাখা" উপন্যাসটি দ্বিতীয় পর্বে লেখা। লেখক উপন্যাসের কাহিনীতে একটা প্রেমের ঘটনাকে রেখে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। তিনি ঘটনার বিস্তৃতি না দেখিয়ে একটা বিষয়কে পল্লবিত করেছেন। আমাদের সামাজিক জীবনে এই উপন্যাসের ঘটনা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসের বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক থাকলেও লেখক এই ভাবনা কে এখানে দেখাননি। প্রেমের নূতন তাৎপর্য এখানে এনেছেন -
"ছেলেমেয়েরা নিজেরা যখন বিয়ে করে তাকে আমরা বলি প্রেমে পড়া বিয়ে। এই প্রেমে পড়া ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনেক মা-বাবার মনে একটা নিদারুণ ত্রাস আছে - এখনো আছে। কেন, কে জানে। তাঁরাও তো প্রেমে পরেছেন, যদিও বিয়ের আগে নয়, পরে। বিয়ের আগে প্রেমে পড়ার সুযোগই তাঁরা পেতেন না, এত অল্প বয়সে তাঁদের বিয়ে হতো। অবশ্য বিয়ের পরে, বেশ কিছুদিন পরে, অন্য কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি তাঁরা যে মনে মনে কখনোই মধুর হননি, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে ?" - ২০

যদিও উপন্যাসের নায়ক স্মরজিৎ ও নায়িকা বিশাখার দাম্পত্য জীবন দিয়ে লেখক উপন্যাসের প্লতি অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই লেখক নায়িকার পিতা হৃদয়রঞ্জনের প্রেম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণার কথা আমরা উপন্যাসে পেয়ে থাকি। তা নিয়ে সে গর্ববোধও করতো। উপন্যাসের প্রথমেই লেখক উল্লেখ করেছেন - "গুপ্ত সাহেব (সকলে তাঁকে তা-ই বলে জানে) জীবনে কখনও প্রেমে পরেন নি। না

বাল্যে, না কৈশোরে, না যৌবনে, না পৌঢ়ত্বে। না কোন মেয়ের সঙ্গে, না কোন পুরুষের সঙ্গে, না কোন বই বা ছবি বা সুর বা ভাবের সঙ্গে।" - ২১

এর পরেই শুরু হয় উপন্যাসের নাটকীয় মোড়। বুদ্ধদেব এখানে অঙ্কন করেন স্মরজিতের বিদেশ যাওয়ার ঘটনা। লেখক দাম্পত্য জীবনে স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি এনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরান। লেখক স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে তার স্থানে গানের শিক্ষক অসীম মুখোপাধ্যায়কে আনেন। হঠাৎ অসীমবাবুকে এনে লেখক উপন্যাসে নাটকীয় চমক এনেছেন। এখান থেকেই উপন্যাসের মূল প্রণয়ঘটিত সমস্যা দেখা যায় বিশাখাকে নিয়ে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে বিশাখা যে বিবাহিত নারী এই ধারণা তার মধ্যে কোথাও দেখান নি। সে প্রেমের উচ্ছল যৌবনাবেগে অসীমকে কাছে এনেছিল। স্মরজিতকে বিশাখা ভুলে গিয়েছিল। বিবাহের পরেও মেয়েদের যে উত্তাল প্রেমাকর্ষণ থাকে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের শেষে স্মরজিতকে বিশাখা ও অসীমের যৌনালিঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে উপন্যাসে জটিলতা এনেছেন।

এই সময় দুজনের সংলাপে নাটকীয় তীব্র গতি ও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ করা যায়। এই সংলাপে স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব অনেক বেশি সত্য বলে মনে হয়। এক সময় স্মরজিৎ যখন ফিরে আসে তখন সে বলে -

"কেমন ছিলে শখা ?
কেমন আবার থাকবো ?
তোমার বুঝি খুব ভয় হয়েছিল আমার জন্য ?
মা-বাবা খুব ব্যাকুল হয়েছিল - আমার মোটেও ভয় হয় নি।
কি করলে এই এক বছর ?
কি আর করলাম ! খেলাম, ঘুমোলাম, মোটা হলাম।" - ২২

আবার বিশাখার সঙ্গে অসীমের একান্তভাবে নির্জন ঘরে তাদের প্রেমালাপ স্মরজিত নিজে লক্ষ করে। এখানেই উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এখান থেকেই শুরু হয়। স্মরজিৎ তার শ্বশুর মশাইকে জানিয়ে দেয় - "আপনাদের কন্যার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব নেই। ছেলেবেলা থেকে যে সম্পর্কের

বাল্যে, না কৈশোরে, না যৌবন্নে, না পৌঢ়ত্বে। না কোন মেয়ের সঙ্গে, না কোন পুরুষের সঙ্গে, না কোন বই বা ছবি বা সুর বা ভাবের সঙ্গে।" - ২১

এর পরেই শুরু হয় উপন্যাসের নাটকীয় মোড়। বুদ্ধদেব এখানে অঙ্কন করেন স্মরজিতের বিদেশ যাওয়ার ঘটনা। লেখক দাম্পত্য জীবনে স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি এনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরান। লেখক স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে তার স্থানে গানের শিক্ষক অসীম মুখোপাধ্যায়কে আনেন। হঠাৎ অসীমবাবুকে এনে লেখক উপন্যাসে নাটকীয় চমক এনেছেন। এখান থেকেই উপন্যাসের মূল প্রণয়ঘটিত সমস্যা দেখা যায় বিশাখাকে নিয়ে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে বিশাখা যে বিবাহিত নারী এই ধারণা তার মধ্যে কোথাও দেখান নি। সে প্রেমের উচ্ছল যৌবনাবেগে অসীমকে কাছে এনেছিল। স্মরজিতকে বিশাখা ভুলে গিয়েছিল। বিবাহের পরেও মেয়েদের যে উত্তাল প্রেমাকর্ষণ থাকে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের শেষে স্মরজিতকে বিশাখা ও অসীমের যৌনালিঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে উপন্যাসে জটিলতা এনেছেন।

এই সময় দুজনের সংলাপে নাটকীয় তীব্র গতি ও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ করা যায়। এই সংলাপে স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব অনেক বেশি সত্য বলে মনে হয়। এক সময় স্মরজিৎ যখন ফিরে আসে তখন সে বলে -

"কেমন ছিলে শখা ?
কেমন আবার থাকবো ?
তোমার বুঝি খুব ভয় হয়েছিল আমার জন্য ?
মা-বাবা খুব ব্যাকুল হয়েছিল - আমার মোটেও ভয় হয় নি।
কি করলে এই এক বছর ?
কি আর করলাম ! খেলাম, ঘুমোলাম, মোটা হলাম।" - ২২

আবার বিশাখার সঙ্গে অসীমের একান্তভাবে নির্জন ঘরে তাদের প্রেমালাপ স্মরজিত নিজে লক্ষ করে। এখানেই উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এখান থেকেই শুরু হয়। স্মরজিৎ তার শ্বশুর মশাইকে জানিয়ে দেয় - "আপনাদের কন্যার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব নেই। ছেলেবেলা থেকে যে সম্পর্কের

দাবীতে আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধন, আজ থেকে তা ছিন্ন মনে করবেন। আমার আর খোজ খবর নেবেন না আপনারা - আমি চললাম।" - ২৩
এর পরও স্মরজিৎ এর বিশাখাকে নেওয়ার আরকটি পত্র উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই।

উপন্যাসের প্লটে প্রেমের বিভিন্ন সমস্যা যে জটিল আকার ধারণ করেছিল সে দিকটা তুলে ধরা প্রয়োজন। এখানেও নাটকীয় ভঙ্গিতে চরিত্রগুলির ভাবান্তর ঘটেছে। স্মরজিত নিজের ভূল বুঝতে পারে। স্মরজিত হয়তো ভেবেছিল এতদিনে বিশাখা অসীমকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে পথ চেয়ে বসে আছে। স্মরজিত এক পত্রে বিশাখাকে তার কর্মস্থলে নিয়ে যাবার কথা জানিয়েছে। বিশাখা সেই পত্র পড়ে অসীমকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

একটি ছকের সাহায্যে বিশাখাকে উপন্যাসে লেখক কিভাবে দেখিয়েছেন তা দেখানো হলো।

প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	তৃতীয় পর্ব
চৌদ্দ বছর বয়সে বিশাখা ও স্মরজিতের বিবাহ।	এক মাসের দাম্পত্য জীবন।	স্মরজিতের বিদেশে পড়াশুনা।
স্মরজিতের অনুপস্থিতিতে আর্টের শিক্ষকের সঙ্গে বিশাখার আলাপ।	অসীম হৃদয়রঞ্জনের পরিবারের সঙ্গে মিশে যায়।	বিশাখা ও অসীমের প্রেমালাপ
বিশাখা ও অসীমের চূড়ান্ত প্রেমালিঙ্গনের মুহূর্তে স্মরজিত প্রত্যক্ষদর্শী।	স্মরজিতের কর্মস্থলে বিশাখাকে নিয়ে যাবার চিঠি।	বিশাখা ও অসীমের পালিয়ে যাওয়া।

"দুই ঢেউ এক নদী" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে নাট্যরীতি অবলম্বনে বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে সংলাপ রচনা করেছেন। অরুণা ও অশোক পিতা মাতার বাধা অতিক্রম করে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রচলিত ছক থেকে একটু ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নায়ক নায়িকাকে তীব্র ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ঘাত প্রতিঘাত ও তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে লেখককে সবসময় সংলাপে যুক্তি ও তর্কের বাক্যবাণ তৈরী

করতে হয়েছিল। লেখক নাটকের সংলাপে গোটা উপন্যাসে একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম পুরুষের জবানীতে বুদ্ধদেব বসু গোটা পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন। উপন্যাসে ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্য লক্ষ করা যায়। স্বাধীনচেতা ও উদার চরিত্র বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে এঁকেছেন। কিন্তু স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠায় চরিত্রগুলির পারদর্শিতা দেখা যায় না। এই উপন্যাসে দুই ভাই ও বোনকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু পারিবারিক সংকটের একটা মুহূর্ত তৈরী করেছিলেন -

"রাগ বুঝি ? এগুলো ভালো হয়নি তা তো বলিনি, বলছিলুম যে -
থাক, থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমার খাতা দিন।
দিচ্ছি। এক-এক করে ছবি কটি ছিঁড়ে নিয়ে খাতাটা ফিরিয়ে দিলেন।
আমার ছবি আপনি রাখলেন যে ?
আবার এত অভদ্রতা" - ২৪

এই ধরনের সংলাপ উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে লেখক দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছে পরিবারের সকলকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

খ) পত্র বিনিময় ও ডায়েরী রীতি ঃ

এই রীতির অন্তর্গত উপন্যাসগুলি হলো "অকর্মণ্য" (১৯২৯-৩১ খ্রীঃ), "এক বৃদ্ধের ডায়েরী" (১৯৭২ খ্রীঃ)। প্রথমেই "অকর্মণ্য" উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

"অকর্মণ্য" (১৯২৯-৩১ খ্রীঃ) উপন্যাসটির প্লটে কয়েকটি স্বতন্ত্র কাহিনী ধারা মিশ্রিত হয়েছে।ডায়েরী বা চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসে ডায়েরী লেখার রীতি কাজ করেছে। বুদ্ধদেব বসু এই ডায়েরী রীতি অবলম্বন করে উপন্যাসগুলিতে একটি নূতনত্বের সৃষ্টি করেছিলেন। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু ডায়েরী লেখায় ব্যস্ত। তিনি উপন্যাসের মধ্যাংশ থেকে এই ডায়েরীলেখা শুরু করেছিলেন। এই রীতিতে রচিত উপন্যাসগুলি অবশ্য সার্থক হয় নি। অনেকাংশে ডায়েরী লিখতে গিয়ে উপন্যাস ভারাক্রান্ত হয়েছে। অভিনব তথ্য ডায়েরীর মধ্যে দেখিয়ে উপন্যাস জগতে তিনি নূতনত্ব আনতে চেয়েছিলেন। যদিও শিল্প মূল্যের দিক দিয়ে লেখকের এই সব উপন্যাসগুলি ব্যর্থ হয়েছিল।

"অকমর্ণ্য" উপন্যাসে বুদ্ধদেব প্রেমের এক স্বাচ্ছন্দ্য রূপ তুলে ধরেছেন। পারিবারিক জীবনের জটিলতায় বুদ্ধদেব শিল্পরীতিতে এক নূতন ঘটনাকে সংযোজন করার চেষ্টা করেছেন। লেখক এই উপন্যাসে খেলার ছলে ডায়েরী লিখতে গিয়ে উপন্যাসের মূল ফর্ম যেন ধরে রাখতে পারেন নি। এই উপন্যাসে বিষয়গুলি হল ঃ

১) পারিবারিক সম্পর্ক।

২) উপন্যাসে সাতটি ক্রমিক সংখ্যার পর জ্যোতির্ময়, সরোজ, অনুসূয়া, শশাঙ্ক, রিণি শিরোনাম লেখার পরে আটটি ক্রমিক সংখ্যায় ডায়েরী লেখার ঘটনা।

বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের প্লটে জ্যোতির্ময়বাবুর পরিবার অঙ্কন করেন। জ্যোতির্ময়বাবুর দুই কন্যা অনুসূয়া, রিণি ও বাড়ির পরিচয় দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শুরু করেন। রচনা রীতির দিক থেকে নূতন রীতি বুদ্ধদেব আবিষ্কার করলেন। উপন্যাসের ফ্রেমটি এইরকম - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, জ্যোতির্ময়বাবু, অনুসূয়া, শশাঙ্ক, রিণি, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, তারপর ৫ই চৈত্র থেকে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত রিণির ডায়েরী লেখা।

উপন্যাসের মধ্যাংশে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে জটিলতা শুরু হয়। কিন্তু চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও জীবন দর্শনের সাবলীলতা "অকর্মণ্য" উপন্যাসে দেখা যায় না। রিণির দীর্ঘ ডায়েরী লেখায় তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসের শশাঙ্ক চরিত্রে নির্বোধ, ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের উপাদানগুলি সংযোজন করেছেন। লেখকের ভাষাতে -

"শশাঙ্ক একটা ইডিয়টের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল" - ২৫

রিণি চরিত্রে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ থাকলেও অনুসূয়ার অসুখে ঔপন্যাসিকের মতামত অধরা থেকে যায়। শশাঙ্ক রিণিকে চায় প্রেমের উচ্ছলতায়, মনের গভীরতায় নয়। তাই শশাঙ্ক, রিণি ও অনুসূয়াকে কেন্দ্র করে একটি জটিলতা উপন্যাসে দেখা যায়। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু প্রেম বিরহকে হালকাভাবে চরিত্রগুলির মনোলোকে আনতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে সংলাপ রচনায় নাটকীয় ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। এছাড়া বর্ণনার চেয়ে স্বগতোকথনে পাত্র-পাত্রীকে আগ্রহী করেছে। লেখক খেলার ছলে সংলাপগুলি মাঝে-মধ্যে অপরিণত হলেও চরিত্র বিকাশে সার্থক হয়েছে।

"আমার মন তীরের গতির মত সোজা, তীক্ষ্ণ ও নিশ্চিত। কোন অকারণ সন্দেহ বা স্বকল্পিত সমস্যা আমাকে পীড়া দেয় না। আমার মনকে আমি নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী হতে শিখিয়েছি। সে যা চায়, তা পাঞ্জল ভাষায় জোর করে বলে, এবং তার সে আকাঙ্খা পূরণ করতে আমি সাধ্যমতো চেষ্ঠা করি।" - ২৬

শশাঙ্ক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক যেন নিজের আত্মকথন রীতিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। "শশাঙ্ক বাবু কেন আমাকে কোন সাহায্য করছেন না ?" -২৭
খন্ড সাহিত্য ও কবিমনের বিকাশ উন্মুখ সংলাপগুলি কতকটা কৌতুকের লঘু সুরে বাঁধা। কৌতুকের ঘনঘটা এই উপন্যাসে সংলাপে আমরা দেখতে পাই-

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখছিলাম, চোখ মেলে যখন দেখি, সে বিছানার পাশে বসে আছে। শশাঙ্কবাবু বলতো সে কে ?" - ২৮

অভিজাত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর বর্ণাঢ্য আয়োজনকে কেন্দ্র করে সংলাপগুলির মধ্যে আলাদা কোন গুরুত্ব বোঝা যায় না।

এই ধরনের আরেকটি উপন্যাস হল "এক বৃদ্ধের ডায়েরী"। বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসের মধ্যে কোন সমন্বয় ও সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায় না। অনেক সমালোচক মনে করেন বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে সাজিয়ে একটি রূপ দেওয়ার ব্যর্থ পরিকল্পনা মাত্র। লেখক "এক বৃদ্ধের ডায়েরী" উপন্যাসে বীরেন্দ্র সিংহের পারিবারকে এনেছেন। তাদের একমাত্র মেয়ে মায়ালতা। মায়ালতাকে উপন্যাসের গৃহ শিক্ষক রণেনের সঙ্গে বিয়ের একটি পারিবারিক সম্মতি উপন্যাসে দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেব বসু মায়ালতার বিদেশে পড়াশুনার ঘটনাটি এনেছেন। এই ঘটনায় নায়ক রণেন ও নায়িকা মায়ালতার বিচ্ছেদ এসেছিল। বিশেষ করে মায়ালতা রণেনকে ভুলে গিয়েছিল। তৃতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নায়ক রণেনকে হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে দেখা যায়। উপন্যাসের শেষে তাদের কোন মিলনদৃশ্য দেখা যায় না। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে নায়ক নায়িকাকে শুধু ডায়েরী লিখিয়ে তাদের মনের বেদনা প্রকাশ করিয়েছেন। যার ফলে উপন্যাসের ঘটনায় কোন গতি ছিল না। আবার মায়ালতার মধ্যেও নারীসুলভ আচরণের অভাব লক্ষ করা যায়।

গ) আত্ম কথন রীতি

বুদ্ধদেব বসু কল্লোল পর্বের একজন খ্যাতনামা লেখক। এছাড়া কল্লোল পর্বের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রত্যেকের মনেই বরীন্দ্রযুগের বিরুদ্ধাচরণ ছিল তাঁদের সাহিত্য রচনায়। এই বিরুদ্ধাচরণের অর্থ অবশ্য নেতিবাচক নয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বজায় রেখে বুদ্ধদেব উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে নূতনত্ব আনতে চাইলেন। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে এই নূতনত্ব আনতে গিয়ে আত্মমুখীনতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। লেখক ভাবুকী মেজাজে গল্প বলার ঢং-এ একটি নূতন রীতি উপন্যাসে তুলে ধরলেন। বুদ্ধদেব "সাড়া" উপন্যাসে বাল্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় রূপে ও রসে নুতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাইরের ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত নয়, প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের উর্দ্ধে মানুষের যে সাধারণ জীবন থাকে তাকেই লেখক উপন্যাসে তুলে ধরলেন। লেখক যেন কল্পনা ও ভাবনার নকশায় চরিত্রগুলিকে স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনেরই কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব সেকালের তরুণ লেখক ও কিশোরী নারীসমাজের চিন্তা চেতনার ও উপভোগের বাসনায় যেন এই কথাগুলি বলেছেন। এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনে বাধাহীন জীবনযাত্রায় প্রত্যেক নারী-পুরুষ পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধদেবের এই আত্মকথনমূলক উপন্যাস হলো "সাড়া" (১৯২৮ খ্রীঃ), "সানন্দা" (১৯৩৩ খ্রীঃ), "রডোডেনড্রনগুচ্ছ" (১৯৩১ খ্রীঃ), "শেষ পাণ্ডুলিপি" (১৯৫৬ খ্রীঃ), "ধূসর গোধূলি" (১৯৩২ খ্রীঃ), "বাড়ি বদল" (১৯৩৪ খ্রীঃ), "লালমেঘ" (১৯৩৪ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

"সাড়া" (১৯২৮-৩০ খ্রীঃ) উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর এই আত্মকথনরীতি উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে অবক্ষয়িত সময়ের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবক্ষয় ও মাত্রাধিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত ভাঙ্গনের পটভূমিকায় চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছেন। আঘাত ও বেদনাময় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যিক ও রোমান্টিক কল্পনার শিল্প শৈলীতে প্রেমের স্থূল ও প্রেমজনিত বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ফুটে ওঠা একটা বিশেষ ভাবনা উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। "সাড়া" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু নায়ক সাগরের বাল্য জীবন থেকে শুরু করে যৌবনের দেহকামনার জীবন পর্যন্ত কাহিনী উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের বিষয়কে বুদ্ধদেব পাঁচটি শিরোনামে ভাগ করেছেন। তিনি "সাড়া" উপন্যাসে উপমা হিসাবে

স্বপ্নের দৃশ্য তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রথমে নায়কের মা মলিনা এবং উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে নায়ক সাগরের স্বপ্নের দৃশ্য রয়েছে। এই দুটি দৃশ্যে বুদ্ধদেব যৌন চেতনার মধ্যে ফ্রয়েডীয় চিন্তা চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমে সাগরের মা -

"পাহাড়ের খাড়া গায়ের উপর বুক রাখিয়া দুটি হাতের উপর শরীরের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া একটু একটু করিয়া সে কাৎরাইতে-কাৎরাইতে উপরে উঠিতে লাগিল। ঠান্ডায় তাহার পেট কাটিয়া যাইতেছে, কঠিন বরফের উপর হাতের নখ বসে না - কোন রকমে একটু ফসকাইতে পারিলেই হাড়-গোড় সুদ্ধ চুরমার হইয়া যাইবে। নিজের বুক দিয়া পাহাড়ের বুক ঘষিতে-ঘষিতে সে অত্যেন্ত সর্ন্তপণে নিজেকে ঊর্ধ্বাভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।" - ২৯

তৃতীয় খণ্ডে সাগরের স্বপ্ন দর্শন-

"একটা অস্ফুট রুদ্ধ আর্তনাদ করিয়া সে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল, ঘামে সমস্ত শরীর ভিজিয়া গেছে, একটি হাত ঘুমন্ত মণিমালার স্তনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমাইলে মণিমালার নাকের ভিতর দিয়া অদ্ভুত এক প্রকার মৃদু শব্দ হয়। দুঃস্বপ্ন পীড়িত সাগরকে আজ কেহ বুকে জড়াইয়া ধরিল না, ছাতে ঠান্ডা হাওয়ায় লইয়া গিয়া অপর্যপ্ত চুম্বনে মুখ ভরিয়া দিল না। গান গাইয়া ঘুম পাড়াইল না।" - ৩০

বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। সংলাপে সাধু ভাষার ব্যবহার দেখি। জটিল বাক্য রচনায় বুদ্ধদেবের আগ্রহ দেখা যায়।

"তথাপি মণিমালাকে নির্বাক দেখিয়া সাগর আবার বলিল, আমি তাকে এক রকম কথাই দিয়েছি যে কাল রওনা হইতে হইবে" - ৩১

বর্ণনাভঙ্গি ছিল সংক্ষিপ্ত ও বস্তুকেন্দ্রিক। অকারণে কবিত্ব উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। দেহ প্রেমের উচ্ছ্বাসকে বুদ্ধদেব সংযত করতে পারেন নি। উপন্যাসের প্রথমে বাৎসল্য রসের দৃশ্যের ক্ষেত্রে মানব স্বভাবের স্থূল যৌন চেতনা উপন্যাসে দেখা যায়।

"-মলিনা বাহিরে যাওয়া মাত্র সাগর লক্ষ্মীর মুখটা জোর করিয়া বালিশের উপর ফেলিয়া তাহার কানে দ্রুত স্বরে বলিতে লাগিল" - ৩২

আরেকটি দৃশ্যে দেখা যায়

"আপাদমস্তক শিহরিত হইয়া সাগর এক হাতে লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে চেয়ারের হাতলটাকে শক্ত মুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল" - ৩৩
আবার থিয়েটার দেখার পর বাড়িতে এসে দেখা যায় সাগর ও লক্ষ্মীর বৃষ্টি ভেজা দিনের পরিচয় লেখক দিয়েছেন এভাবে -

"একটা চাদর টানিয়া দুইজনকেই তাহার মধ্যে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ভিজা পায়রার মতো কাঁপিতে লাগিল সে। লক্ষ্মী তাহাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া নিঃশ্বাসপাতের মতো নিঃশব্দে বলিল, সাগর রে!" - ৩৪

লেখক এই উপন্যাসে চিঠির সাহায্যে সচেতন মনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তীর্যক ভঙ্গিতে মনের চেতন ও অচেতন দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এই মনোভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে সাগরকে ভাবুকী মনের এবং সত্যবানকে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের আদলে বুদ্ধদেব বসু আঁকতে গিয়ে যেন ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। ঘটনার উত্তেজনায় কিম্বা আবেগ তাড়িত সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায় না। সাগরকে বাল্যসঙ্গী লক্ষ্মীর সঙ্গে অন্ধকার ঘরে যে যৌনালিঙ্গনের দৃশ্য দেখা যায়, তাতে সাগর চরিত্রের স্বতন্ত্রতা বলতে পারি।

আত্মকথন ভঙ্গী উপন্যাসের বিভিন্ন খণ্ডে নায়ক সাগরকে কতটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে তার একটি ছক নীচে দেওয়া হলো।

	ঘুমপাড়ানির গান খণ্ড	কাকস্নান খণ্ড	সোনার শিকল খণ্ড	অবগাহন খণ্ড	সাড়া খণ্ড
সাগর ও লক্ষ্মী	সাগর ও লক্ষ্মীর বাল্যকাল	কোলকাতায় সাগরের কলেজ জীবনে পত্রলেখা ও সত্যবান	সাগরের সঙ্গে মণিমালার স্বল্পদিনের বিবাহিত জীবন	সাগরের আবার কোলকাতা গমন	সাগরের বাল্যকালের সাথী লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা ও তাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

উপন্যাসে সাগরের এই পরিবর্তনে যেসব বিষয় উপাদান ও চরিত্রগুলি কাজ করেছিল সেগুলি হল - স্বপ্ন, দর্শন, কবিতা লেখার আগ্রহ ও সাহিত্যিক রূপে কলেজ জীবন, চিঠি বিনিময়, সত্যবানের সঙ্গে হোস্টেল জীবন, পরিবেশগত প্রভাব, পত্রলেখা ও নির্মলা। এছাড়া উপন্যাসে দীর্ঘ বাক্যের রচনাভঙ্গী আলাদা বৈচিত্র্য এনেছিল- "সাগরের রক্তের মধ্যে তখন তুমুল তোলপাড় চলিতেছে, পত্রলেখার মুখের প্রত্যেকটি কথা সহস্রগুণ হইয়া তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া দিয়া গুঞ্জিত হইতেছে, কন্দর্পের কথা প্রায় শুনিতেই পাইলেন না।" - ৩৫

এই "সাড়া" উপন্যাসে শৈশব স্মৃতি অনেকটা আছে। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন- "সাড়া" উপন্যাসের প্রথম অংশে "আমার বন্ধু" উপন্যাসে পুরানো পল্টন, নোয়াখালি, "চার্লস চ্যাপলিন" ও "রামায়ণ" প্রবন্ধে কোন কোন ছোট গল্প ও কবিতায়, এছাড়া কয়েকটি উপন্যাসমূলক ক্ষুদ্র রচনাতেও শৈশব স্মৃতির ইতিবৃত্ত টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। এছাড়া "সাড়া" উপন্যাসে "শর" ও "থিয়েটার" দেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবের শৈশব স্মৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।
"ভাদ্রের প্রখর রৌদ্রে ভাদ্রের প্রবল জোয়ার কেমন ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিবে, সকালে চায়ের টেবিলে সাগর মা-বাবার মুখে এই আলোচনা শুনিল" - ৩৬
এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের নোয়াখালির ভাঙ্গনের স্মৃতি ভেসে উঠতে দেখা যায়।

"সাড়া" উপন্যাসে ঘটনার গতি থামিয়ে বুদ্ধদেব বসু যৌন ও যৌবনের চূড়ান্ত মুহূর্তটি তৃতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন। এই খণ্ডে নির্মলা নামে পতিতা পল্লীর মেয়েকে দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে সাগরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। কলেজ স্ট্রীট, ধর্মতলার আলোকিত পথের বর্ণনায় তিনি প্রত্যক্ষ দৃশ্যকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। এই উপন্যাসে চরিত্রগুলি ভাবুকী, কেউ বা বড় সাহিত্যিক।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে ঘটনার বিবরণকে মিশিয়ে পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় যন্ত্রণাকে সামনে এনেছেন। তিনি যৌবন সৌন্দর্য্যে মোহিত। লক্ষ্মীর শরীরের মধ্যে যৌন আবেগ ছিল, সে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক স্বামীকে নিয়ে সে সুখী হতে পারে নি।

"একদা তুমি প্রিয়ে" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসে বুদ্ধদেব পলাশ ও রেবার মধ্যে পূর্ব স্মৃতি প্রেমের এক জটিল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। রেবা ও পলাশের মনে একটা অশুভ,

অস্পষ্ট আবেগ ও মোহ তাদের মধ্যে সহানুভূতি লাভের একটা ব্যাকুল আকাঙ্খা দিয়ে উপন্যাসের শেষ প্রান্তে লেখক প্রবেশ করেন। কখনও ভিন্নমুখী জীবন যন্ত্রণার সংঘাত লেখক দেখিয়েছেন-

"কি অন্যায় রেবাদি যদি আপনাকে দেন ? প্রতিমা সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে পেলো। পাগল না কি! এ আমি কিছুতেই দেবো না পলাশ কে!" - ৩৭

এই জীবন সংগ্রামকে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম বলা যায়। কোথাও চকিত অবচেতনের দ্বারা উদঘাটিত হয়েছে আবার কোথাও সুপ্ত ভাবনার সক্রিয়তা অনুভব করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ডে পলাশ প্রতিমার প্রেমের নূতন দিক দেখা যায়। অন্যদিকে রেবার পূর্বস্মৃতি প্রেমের জড়তা কাটিয়ে ওঠার মধ্য দিয়েও বুদ্ধদেবের জীবনকে স্পর্শ করেছিল বলে মনে হয়। এই উপন্যাসে শেষপর্যন্ত রেবার সেই প্রেমের স্মৃতি কখনও পলাশ ভুলতে পারে নি। তাই তার হৃদয়ে সে প্রেয়সীর ভূমিকায় রয়ে গেল। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে পলাশকে মূল কাহিনীতে রাখলেও সব সময় রেবার মনে সচেতনতা আনেন নি।

চরিত্রগঠনে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে কয়েকটি বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব রেবা ও পলাশকে ব্যক্তিত্ব দিয়ে উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের প্রয়োজনে বুদ্ধদেব অত্যন্ত সংযমভাবে প্রীতি ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

এছাড়া বিশেষ তাৎপর্য ও বর্ণনার পরিবেশ উপন্যাসে যেন গীতিকাব্যের সুর শোনা যায়। উপন্যাসের সংলাপে কাব্যিকতা, ভাবমুক্ত, স্বচ্ছন্দ সংলাপে মধুরতা লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে চরিত্রের যে বিশেষত্ব, সংলাপের কারুকার্যে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্ঠা করলেও প্রেমের সম্মোহন ইন্দ্রজালে সংলাপ যেন ঢাকা পড়ে গেছে। এই উপন্যাসের সংলাপগুলি কবিত্বের মোড়কে ঢাকা।

"পলাশ কিছু ভাবেনি, কোন সংকল্পও করেনি - তবু সে দাঁড়িয়ে রইলো, অপেক্ষা করতে লাগলো, যেন কোন সম্মোহনে স্তব্ধ। আর রাত্রির স্রোত তার উপর ঝরে পড়লো অজস্রভাবে, তারার আলোয় ক্ষীণ পাংশুতার মূর্তি।" - ৩৮

লেখক কবিত্বময় সংলাপে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও নায়ক নায়িকার মানসিকতার আত্মপ্রকাশ দেখিয়েছেন।

বুদ্ধদেব "শেষ পাণ্ডুলিপি" (১৯৫৬ খ্রীঃ) উপন্যাসের প্লটে একটি দাম্পত্য পরিবারকে স্থান দিয়েছেন। এই পরিবারের জীবনের সমস্যা ও চরিত্রগুলি সমতালে আবর্তিত হয়। ঘটনা থেকে অনেক চরিত্রের অধঃপতন ও যৌন আকর্ষণ উপন্যাসে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এখানেও বুদ্ধদেব নায়ক প্রফুল্লের মধ্যে সাহিত্য লেখার একটা অভ্যাস উপন্যাসের প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন -

"লেখাটা যতক্ষণ আমাকে মাতাল করে রাখতে পারে ততক্ষণই লিখতে পারি আমি।"

-৩৯

তিনি এই উপন্যাসের শেষের দিকে দুটি পরিবারকে এনেছেন। লেখক উপন্যাসের ঘটনাকে দুইটি অংশে ভাগ করেছেন।

প্রথম অংশে প্রফুল্লের পরিবার, দ্বিতীয় অংশে বন্ধু পত্নী অর্চনার সংসার।

লেখকের উদ্দেশ্য প্রফুল্লকে সৎ পথে ফেরাতে বন্ধুর প্রয়াস। কিন্তু পশু মনোভাবের যে কোন অবস্থায় পরিবর্তন হয় না - এই ধারণা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক বীরেশ্বর নিজের জীবন ও বন্ধুপত্নী অর্চনার জীবনকেও ধ্বংস করেছিল। বীরেশ্বরের হিংসাশ্রয়ী মনোভাব এই উপন্যাসে তিনটি কারণে এসেছিল বলে লেখক জানিয়েছেন। ক) উত্তরাধিকার সূত্র থেকে তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার। খ) অবিবাহিত জীবনে অস্থিরতা। গ) যৌন কামনার আকর্ষণ। ঘ) বীরেশ্বর পিশাচ শ্রেণীর চরিত্র। কোন ধর্মাধর্ম, বিবেকবোধ, লেখক এই চরিত্রে দেখান নি। লেখক উপন্যাসে গাড়ি দুর্ঘটনা, বন্ধুপত্নীর মৃত্যু, হাসপাতলে বীরেশ্বরের বিকৃত মস্তিষ্ক, এই সব ঘটনা এনে উপন্যাসে একটা মাত্রা আনার চেষ্টা করেছিলেন।

"পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছে অর্চনার চোখ, মৃতের দৃষ্টির মতোই স্থির ও চিরন্তন - সেই চোখ, যা আমি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনা।

আমাকে দেখে প্রফুল্ল বিকট আওয়াজে বলে উঠলো, 'বীরেশ্বর, তুমি এই করলে!' আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার আগেই আমার সারা আকাশ অন্ধকার হয়ে গেলো। পরে শুনেছি একটি মিলিটারি লরি আমাদের দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছিল।" -৪০

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর ভাষা কোথাও চঞ্চল, দ্রুতগতি আবার কোথাও মন্থর হতে দেখি। ধীর লয়ে ঘটনা এনেছেন লেখক। ছোট বড় নানা আকারের বাক্যের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায় -

"প্রফুল্ল আপনাকে ভালোবাসে।"

আবার "তার পর আমি দেখলাম মস্ত কালো গাড়ি এসে সামনে দাড়িয়ে সম্মোহিতের মতো আমিও উঠে তার পাশে বসলাম" -৪১

অন্যান্য উপন্যাসের মতো সংলাপে ব্যঞ্জনধর্মিতা নেই। উপমা চিত্রকল্পগুলি বুদ্ধদেব নিজের জবানীতে রচনা করেছেন। তবে তিনি উপন্যাসে কিছুটা নাটকীয় সংলাপ এনেছেন। আবার লেখক কখনও উপন্যাসে পারিবারিক কোন্দলের তীব্র জটিল কাহিনী তুলে ধরেছেন।

"সানন্দা" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাস থেকে বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের নূতনত্বের আরেকটা মাত্রা সংযোজিত হল। বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য উপন্যাসে জীবনের যে রূপ এঁকেছেন, তা কেবল সাধারণ মত দিয়ে ভাবা বলে মনে হয় না। উচ্ছ্বাস, হতাশা, চার্তুয্যের দ্বারা সংপৃক্ত একটা সমগ্রতা পাত্র-পাত্রীর মনোভাবে ফুটে উঠেছে।

লেখক "সানন্দা" উপন্যাসের প্লটে একটি খামখেয়ালিপনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সানন্দার পরিকল্পনায় চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও যে প্রকৃতি ধরা পড়ছে, তাতে বাস্তব জীবনের ছবি লক্ষ করা যায়। লেখক এই উপন্যাসে কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু শিল্পগত দুর্বলতা কাহিনীতে লক্ষ করা যায়। ঘটনাগত বৈচিত্র্য যদিও তেমন অসামঞ্জস্য হয়নি। শুধু সানন্দা চরিত্রের কিছু নূতনত্ব দেখা যায়।

উপন্যাসের চরিত্র কল্পনায় বুদ্ধদেব কাব্যিক চেতনার কল্পিত ছবি এঁকেছেন। যা নিঃসন্দেহে ছড়িয়ে গিয়েছিল মালতীর জীবনে। সাহিত্য রচনায় নায়ক-নায়িকাদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। "সানন্দা" উপন্যাসের সংলাপ সমাজ ও সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংলাপগুলি দুর্বল বলে মনে হয়। চরিত্রের সংলাপে কোন গতি দেখা যায় না। তবে প্রেমের যে বৈচিত্র্যের সুর স্বরতন্ত্রীর তারে বেজে ওঠে, তা বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন- যেমন "এক রুদ্ধ আবেগে তারা গুলো থর থর করে কাঁপছে। তোমার তাই মনে হয় না। সানন্দা মুখ ফেরাতেই আমার গালের সঙ্গে ওর মাথার ঘষা লেগে গেল।" এই সংলাপের মধ্যে মানব হৃদয়ের শূন্যতার মাঝেও যেন গভীর প্রেমের উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করা যায়।

"লালমেঘ" (১৯৩৪ খ্রীঃ) উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর পারিবারিক উপন্যাস। মানব অন্তরের যে গাঢ় যন্ত্রণাময় দিক থাকে, তাকে বুদ্ধদেব সহজ সরল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। লেখক উপন্যাসের প্রথমে অভিজাত পরিবারের ঘটনাকে কাহিনীতে এনেছেন। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসের প্লটে চারটি ঘটনার মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনকে স্থাপন করেছেন। ক) অবিনাশ ও শোভনা রায়ের পারিবারিক জীবন। শোভনা রায় অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। খ) অবিনাশ ও শোভনা রায়ের সংসারে তৃতীয় চরিত্র সন্ধ্যামণির প্রবেশ। গ) অবিনাশ ও সন্ধ্যামণির সংসার।

দীর্ঘদিনের অসুখে শোভনা রায় অবিনাশের কাছে থেকেও দূরে ছিল। শোভনা ও অবিনাশের শূন্যতার মাঝে সন্ধামণীর অবস্থানকে লেখক স্থান দিয়েছে। মনোস্তাত্ত্বিক ভঙ্গি নিয়ে সন্ধ্যামণিকে বার বার পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। শোভনা রায়ের অসুস্থতা এই উপন্যাসের গল্পের বাঁক ফেরার জন্য মূলত দায়ী। এই উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের অবৈধ রীতি কাজ করেছে। পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সন্ধ্যামণি মিশে গিয়ে তার চরিত্রের বিবর্তন ঘটিয়েছে। এই বিবর্তনে অবিনাশ বাবুর যৌন তাগিদে সন্ধ্যামণি তার কাছে এসেছিল। যার ফলে অবিনাশ ও সন্ধ্যামণির দেহ মিলন তাদের সংসার জীবনকে বাঁধতে সাহায্য করেছিল।

"সমস্ত পৃথিবি যাতে মুগ্ধ, এক জনের পক্ষে তা যথেষ্ট হয়। সে তৃপ্ত হবে শুধু তাকে নিয়ে, তার সত্তার নগ্ন আর পবিত্র শুভ্রতা নিয়ে। সমস্ত সামাজিক পরিচয়ের আচ্ছাদন থেকে মুক্ত সেই নিগূঢ় মিলন। আমি তোমার জন্য উৎসুক, আমার সমস্ত রক্ত তোমার দিকে ঠেলে উঠছে। তুমি এসো আমার কাছে রাত্রির অন্ধকারে, রাত্রিকে আলোড়িত করে, রাত্রিতে ঝড় তুলে দিয়ে। ঝড় উঠুক সমুদ্রে, রক্তের বিশাল, অন্ধকার সমুদ্রেঃ অন্য সব, অন্য সবকিছু লুপ্ত হয়ে যাক সেই রক্তের উত্তপ্ত অন্ধকারে।
- কাল, কালই ওকে যেতে হবে, আরো একবার পাশ ফিরে অবিনাশ ভাবলে।" - ৪২

শোভনা রায় চরিত্রের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু নীরবতার ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। যেমন উপন্যাসের শেষে শোভনা রায় মারা গেল, না বেঁচে রইল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। একটা আকস্মিক ট্রাজেডির সুর শোভনা চরিত্রে লেখক তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব বসু শোভনা ও সন্ধ্যামণির মনের গভীরে লুকোনো সত্যকে মনোস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে

নিয়ে গিয়েছেন। দাম্পত্য প্রেম যে যৌন চাহিদার কাছে সংযম ধরে রাখতে পারে না তা লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের শেষের দিকে সন্ধ্যামণি কাজের মেয়ে আর নয়, সে এখন অবিনাশের স্ত্রী। শোভনা রায় এখন ভাড়াটে নার্সের সেবা শুশ্রুষায় বেঁচে আছে। এই উপন্যাসের সংলাপ বুননে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতময় একমুখীনতা রয়েছে। বুদ্ধদেব পারিবারিক জীবনের ঘটনাকে এই উপন্যাসে আলাদা মাত্রা দিয়েছেন। এই উপন্যাসে তেমন বড় উপকাহিনী নেই। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য উপন্যাসের মত কবি মনের আলো এই উপন্যাসে তেমন প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। পারিবারিক জীবনে নায়ক স্বগতোমুখী। এই মনোভাব বুদ্ধদেবের নিজেরই মনোভাব। আর এই মনোভাবকে বুদ্ধদেব অবিনাশের জীবনে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের শোভনা চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে বুদ্ধদেব এঁকেছেন। অবিনাশ উপন্যাসের প্রথমে শোভনাকে ভালোবাসে, কিন্তু শোভনার দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি ও সন্ধ্যামণির আপ্যায়ন দাম্পত্য জীবন থেকে শোভনাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

৩) বর্ণনামূলক ও বিবৃতি প্রধান রীতি

ক) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে

"আয়নার মধ্যে একা" (১৯৬৮ খ্রীঃ) উপন্যাসে লেখক তিনটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কাহিনী তুলে ধরেছেন। কমলা, শ্যামলী ও অবনী এই তিনটি চরিত্রে লেখক একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখিয়েছেন। কমলাকে একটি অত্যাচারী পরিবারের মধ্যে প্রথমে দেখা যায়। কমলার পিসির গোপন ষড়যন্ত্রে সে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল। ক্রমে শ্যামলীকে কমলার কাছে স্থাপন করে লেখক উপন্যাসে জটিলতা এনেছেন। এই কাহিনীর মাঝে কমলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল অবনী। লেখক উপন্যাসের শেষে কমলা ও অবনীর মিলন দৃশ্য এনেছেন। এই উপন্যাসে কমলা চরিত্রে নূতন আদর্শের রূপরেখা বুদ্ধদেব বসু অঙ্কন করেছেন। মানুষের জীবন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের শেষে জানিয়েছেন - "সত্যিকার জীবন, সত্যিকার বিয়ে। গাঁটছড়া বেঁধে বাসরঘরে তারাঃ সে আর অবনী।"৫৪৯পৃ/১০টি উপন্যাস। সংলাপগুলি সংক্ষিপ্ত নয়, কোন কিছু বর্ণনা করতেগিয়ে

বাক্য গুলি ইঙ্গিতময়তা হারিয়েছে। "মেঘলা দিন, টিপ টিপ বৃষ্টি, ম্যুজিয়মের বাস থেকে নামলো, হাঁটছে, বাড়ির গায়ে নম্বর দেখে দেখে।" - ৪৩
চরিত্রগুলির মধ্যে কমলা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক লেখক উপন্যাসে দেখিয়েছেন। শ্যামলী চরিত্রটি উপন্যাসে তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি।

খ) লেখকের জবানীতে

"মৌলিনাথ" (১৯৫২ খ্রীঃ), উপন্যাসের ঘটনাকে লেখক তিনটি খণ্ড ও একটি উপসংহারের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই তিনটি খণ্ডকে যেন আলাদা গল্প বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র মৌলিনাথ সাহিত্যিক ও উদার মনের মানুষ। লেখক মৌলির জীবনের আদর্শকেই উপন্যাসে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে দেখিয়েছেন। উদাসীন ভাবুক প্রকৃতির মানুষের জীবনে একদিকে সাহিত্য চর্চা ও অন্যদিকে জীবনের সমস্যা কিভাবে রূপায়িত হয় তা এই উপন্যাসে দেখা যায়। মৌলির জীবনে জটিল দ্বন্দ্ব আনতে লেখক গীতা ও চিত্রা নামে দুটি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই দুজনের প্রেমের মাঝে অনেক সময় মৌলিকে অসহায় বলে মনে হয়।
"হয়েছে তোমার ? শেষ করেছ ? মৌলি চমকে উঠলো আওয়াজ শুনে - ঐ রকম ন্যাকড়া ছেঁড়ার মতো চাপা অথচ কর্কশ আওয়াজ গীতার গলা থেকে বেরোতে পারে সে ভাবেনি কখনো - আর এ কী আগুন রং কখনো তার মুখে জ্বলে উঠলো! গীতা! - তার দিকে হাত বাড়ালো মৌলি - কি হয়েছে তোমার ? কিন্তু গীতা মাথা নেড়ে উড়িয়ে দিলো ঐ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, তার সামনে শূন্যটাকেই ঠেলে দিল হাত দিয়ে। শেষ করেছ তুমি?" -৪৪
লেখক সাহিত্যকে অবলম্বন করে গীতাকে ভালোবাসার যেন কাহিনী রচনা করেছেন। মৌলিনাথকে লেখক সবসময় একটা আদর্শের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। মৌলিনাথ চরিত্রই বুদ্ধদেব বসুর জীবনের আদর্শ। সে গীতাকে ভালোবাসলেও তার বহিঃপ্রকাশ উপন্যাসে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

"জীবনের তত্ত্ব বোঝালে, মেয়েদের বিষয়ে মন্তব্য শোনালে; আমার বিষয়ে ভবিষ্যৎবানী করলে দু একটা। পন্ডিত তুমি - চিন্তাশীল সুধীজন - কথা বলার অধিকার আছে তোমার।" -৪৫

যৌবনের উচ্ছ্বাস এই উপন্যাসে প্রবলভাবে দেখা যায় না, তবে গীতা চরিত্রের মধ্যে এই মানসিকতা লেখক এনেছিলেন। মৌলিনাথ চরিত্রকে বুদ্ধদেব বসু বাস্তব সংসার জীবন থেকে দূরে একটা কল্পনার জগতে রেখে দিয়েছিলেন। যার ফলে চরিত্রটির মধ্যে রোমান্স খুব বেশিমাত্রায় কাজ করেছিল।

"আমার বন্ধু" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসে লেখকের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ইচ্ছাকে বুদ্ধদেব বসু কৌতূহলী মানসিকতায় তুলে ধরেছিলেন। এক জন লেখক তার সৃষ্ট সাহিত্য প্রকাশে কতটা আনন্দ পায় সেই ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ভবভূতি একটি উপন্যাস লিখে বন্ধুকে দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এই হরভজন চরিত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তিসত্তা বা লেখক হবার কোন যোগ্যতাই বুদ্ধদেব বসু দেখান নি।

"ভবভূতির বিচার বোধ ছিলনা, মাত্রা জ্ঞান ছিলনা। ভবভূতির উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে অনেকে ক্লান্তি বোধ করতো।" -৪৬

এই উপন্যাসের সংলাপ বিবরণ ধর্মী। সংলাপে কোন গতিময়তা নেই। যেমন -

"ভবভূতি উঠে এসে আমার পাশে বসলো। যখন দাড়ালো লক্ষ করলাম, লম্বায় ও অদ্ভুতরকম, অসংগত রকম বেড়েছে।" - ৪৭

উপন্যাসের প্লটে কোন জটিলতা নেই। ভবভূতি পরিবারের কথা থাকলেও তারা সে ভাবে উপন্যাসে প্রাধান্য পায় নি।

গ) <u>প্রথম পুরুষের সরাসরি উক্তি</u>

"ধূসর গোধূলী" (১৯৩২ খ্রীঃ) উপন্যাসে বুদ্ধদেবের বন্ধু স্বয়ং গল্প কথক নীলকণ্ঠ। অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের বৈচিত্র্য তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। কল্পনা জগৎ ও কর্ম জগতের প্রভেদ তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। অপর্ণা চরিত্র

উপন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছে। কল্যাণকুমার অপর্ণাকে দিদি বললেও তার প্রতি আলাদা প্রেম উপন্যাসের শেষের দিকে বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছিলেন -

"তোমার কষ্ট ? অপর্ণার কথা ভাবো কখনো মনে মনে ? ও মেয়েটাকে নিয়ে খুবতো সুখ হলো আমার - এলে তুমি বুঝি এলে মায়ের জীবন নষ্ট করতে" -৪৮

আবার উপন্যাসের শেষ অংশে লেখক এই সংলাপ দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন -

"আমার নির্জনতা আজ তোমাকে দিলাম - নাও, হাত বাড়িয়ে নাও, একবার বলো যে ভুলে যাওনি" -৪৯

তার প্রেম উপন্যাসে এক আলাদা মাত্রা এনেছে। দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক ও পরিণাম এই উপন্যাসের কল্পনা জগতে স্বপ্নজাল রচনা করেছে।

উপন্যাসের সংলাপে কাব্যিকতার ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। প্রেমের কোন বিশেষত্ব উপন্যাসে দেখানো হয় নি। অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের ভালোবাসা উপন্যাসে অপূর্ণ থেকে গেছে। উপন্যাসের কোন চরিত্রের সক্রিয় সাড়া দেখা যায় না। অপার্থিব মোহের মধ্যে চরিত্রগুলিকে নিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

৪) চেতনা প্রবাহ রীতি

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হল -"কালোহাওয়া" (১৯৩৯-৪০ খ্রীঃ) ও "তিথিডোর" (১৯৪৭-৪৯ খ্রীঃ)। এই উপন্যাস দুটি নীচে আলোচনা করা হল-

"কালো হাওয়া" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বাস্তব বিষয় থেকে পরিবারের চেতনার প্রসার ঘটিয়েছেন। উপন্যাসটি চেতনা প্রবাহ রীতিতে লেখা আমরা বলতে পারি। পরিবারের পতন কিভাবে গৃহকর্তার চোখের সামনে ঘটেছিল তার পরিচয় এই উপন্যাসে পাই। অরিন্দম শান্ত ও খোশ মেজাজী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তায় সংসারে সংকট উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন। হৈমন্তীর অন্ধ গুরু ভক্তি সংসারে পতন ডেকে এনেছিল। হৈমন্তী গুরু সেবায় নিজের স্বামী, মেয়ে সবই পরিত্যাগ করেছেন। উদভ্রান্ত চিত্তের ছায়াবাজি কিভাবে সংসার জীবনে পতন ডেকে এনেছিল তার পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

"মহামায়া ব্যথিতস্বরে বললেন, সত্যি কি হৈমন্তী পাগল হয়ে গেলো ?
তাছাড়া আর কি বলবে ?
তাঁর ধারণা বাবাকে ষড়যন্ত্র করে আমি মেরেছি - বাড়িতে যে যায় তাকেই বলে ও কথা।"
- ৫০

পরিবারের কর্তা স্নেহ ও ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিলে তিলে সংসার জীবনকে ধ্বংস করেছে। এক নিবিড় শূন্যতা ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের ঈঙ্গিত বহন করে সমস্ত বাড়িতে পাখা বিস্তার করেছে মহামায়া নামে এক ভণ্ড সাধু। জীবনের শূন্যতা নিয়ে হৈমন্তী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এর ফলে হৈমন্তীর গুরু অন্ধতা সংসারকে শেষ করে দিয়েছিল। বুদ্ধদেব উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে বাস্তববোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অঙ্কন করেছিলেন। হৈমন্তীর চিত্তবিকার ও পিস্তলের গুলিতে অরিন্দমের মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। অরুণ হত্যাকারী হিসাবে মহামায়ার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। তার জীবনকে ধ্বংসের মূলে মহামায়া উপন্যাসের শেষে লেখক তা দেখিয়েছেন। তাই অরুণ ব্যকুল সুরে বলেছে -
"মহামায়া হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন, এসব পাগলামি তোর মাথায় কে ঢোকালো বলতো ? অরুণ ব্যকুল সুরে বললে, কেন আমাকে দূরে ঠেলে রেখে আমাকে কষ্ট দাও ? অরুণের গলা প্রায় ধরে এলো।" - ৫১

"কালো হাওয়া" উপন্যাসে শিল্পরীতির নূতন মুখ খুলে দেবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। রচনা ভঙ্গী একেবারে নূতন। একটি পরিবারে দুইটি চরিত্র মা-ছেলে, মহামায়া দেবীর ভক্ত। বুদ্ধদেব বসু গল্পের এই রীতিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে একের পর এক ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। উপন্যাসের প্লটে রয়েছে মহামায়া নামে একটি ভণ্ড চরিত্র। হৈমন্তী ও অরুণের সংসার ভণ্ড মহামায়ার নির্দেশে যেন পরিচালিত হচ্ছে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে অন্ধ বিশ্বাস কিভাবে সংসারের পতন ডেকে আনে তার পরিণাম তুলে ধরেছেন।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসের আরম্ভটি ধীর, সোজাসুজি ঘটনার মধ্যে পড়ে নি। উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘটনা নিয়ন্ত্রিত। নাট্য রসের উপস্থিতি এই উপন্যাসে রয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক চরিত্রের স্বাধীনতা বর্জন করেন নি। "কালো হাওয়া" উপন্যাসটি বারোটি পর্বে বুদ্ধদেব বসু ঘটনা সাজিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছদে অরিন্দম

বোসের পরিবারকে দেখানো হয়েছে। সংযমহীন উদার মনের মানুষ ছিল অরিন্দম। দুই মেয়ে বুলি ও মিনিকে নিয়ে অরিন্দমের পরিবার। পরিবারের সকলের প্রতি ছিল অরিন্দমের দয়া ও সহানুভূতি। অরিন্দমের স্ত্রী হৈমন্তী মহামায়া দেবীর প্রতি বিশ্বস্ত। এই বিশ্বাস থেকেই সংসার জীবনের পতন বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

তৃতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঘটনা নেই। মহামায়ার আদেশেই অরুণের বিয়ে হয়। অরুণের স্ত্রী উজ্জ্বলা। তাদের ছেলের দীর্ঘ রোগভোগের ঘটনা উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেখা যায়। অরুণ চুরি করে বাড়ি থেকে উধাও হয়। এর কিছু দিনের মধ্যে অরুণের ছেলে মারা যায়। উজ্জ্বলা কোলকাতায় বাপের বাড়িতে চলে আসার ঘটনা দিয়ে লেখক নবম পরিচ্ছেদের ইতি টেনেছেন। দশম পরিচ্ছেদে অরুণের বন্ধু নিরঞ্জনের প্রবেশ। বুলির সঙ্গে প্রেম, পরিণতিতে বাড়ি থেকে তারা দুজন পালিয়ে গিয়ে এলাহাবাদে বিয়ের ঘটনা লেখক এনেছেন।

এই উপন্যাসে ঘটনা নাটকীয়। বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাস থেকে এই উপন্যাসটির ঘটনা আলাদা। লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রে অরিন্দমের পরিবারকে সামনে রেখে বিভিন্ন চরিত্রের বিবরণ দিয়েছেন। হৈমন্তীর জীবনে কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। যখন সে চেতনা পায় তখন তার স্বামী মারা গিয়েছে। ভন্ড সাধুর প্রতি তার মোহ ভঙ্গ হয়। হৈমন্তীর পুত্র অরুণও নিজের ভুল বুঝতে পারে।

চরিত্র বিশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও একান্ত বিশ্বাসের কাহিনীকে উপন্যাসের প্রথমে লেখক প্রাধান্য দিলেও তার বিপর্যয় যে কিভাবে সংসার জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে এই নাট্যরস উপন্যাসে সর্বত্র রয়েছে। লেখক এই ঘটনাকে উপন্যাসে সহজ ও সরল ভাবে সাজিয়েছেন। চরিত্রগুলি বিশেষতঃ অরুণ উচ্ছৃঙ্খল, সংযমহীন খেয়ালী মনের চরিত্র। হৈমন্তীর অন্ধবিশ্বাসে তার দাম্পত্য জীবনের পতন ডেকে আনে।

খ) চলিত বাক্‌রীতি

"বাসর ঘর" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসটির শিল্পরীতিতে চলিত বাক ও মনস্তত্ত্ব মূলক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। আদর্শ শিল্পরীতির সন্ধান বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র ও লেখকের জীবন দর্শন এই উপন্যাসে সাবলীল

ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপমা দিয়ে চরিত্রের মনোলোকে লেখক প্রবেশ করতে চেয়েছেন-

"তার গম্ভীর ধ্বনি পরাশরের বুকের মধ্যে স্পন্দিত। আকাশের অন্ধকার যেন কোন দুর মন্দিরের ঘন্টার শব্দে ভরে গেলো" - ৫২

উপন্যাসের কাহিনীতে আবার কুন্তলা ও পলাশের প্রেমের বিবরণ পাই। তাদের প্রেম যেন ক্ষণিকের বৃষ্টিধারা। পলাশ ও প্রতিমার নূতন প্রেমের সূচনা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়। তাদের প্রেমের মধ্যে কোন গভীরতা লেখক দেখান নি।

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে চরিত্র বিশেষে আত্মকথনের ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। কাহিনী বিন্যাসে, ঘটনা নির্মাণে, চরিত্রাঙ্কন রীতিতে ও ভাষায় - এক কথায় উপন্যাস শিল্পের সবকটি আঙ্গিকে কবিত্বময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।

"যে মেয়ে তার এত দিনের রচনা, এ কি সেই মেয়ে ? দুজনের মধ্যে জন্মনিল বিশাল রহস্যময় নদী, স্বপ্নের মতো কানে এসে লাগছে আতঙ্কের কালো জলের কলরোল। এ নদী কোথায় গেছে কত ঘুর্ণিতে কত আবর্তে, কত প্রচন্ড ডেউ তুলে, অন্ধকার বিসর্পিল স্রোতে কোন পরিপূর্ণতার সময় হীন দীগন্ত হীন সমুদ্রে।" - ৫৩

প্রেমের আবেগ উপন্যাসে চরিত্রের মধ্যে সবসময় লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের শেষে বুদ্ধদেব একটি প্রেমের ঝংকার তুলে যেন তৃপ্তি পেয়েছেন। এই রীতি তাঁর অনুসৃত ও চিরাচরিত লিখনভঙ্গীর বিরুদ্ধে অনন্ত প্রেমের জয়গান রচনা করেছে।

৫) বহুকথন রীতি ও স্বদেশ ভাবনা

"মন-দেয়া-নেয়া" (১৯৩২ খ্রীঃ) উপন্যাসটি নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। উপন্যাসে তিনটি পুরুষ চরিত্র- দ্বিজেন, ঈশান, সিতাংশু এবং তিনটি নারী চরিত্র- সুলতা, মীরা ও মালিনীর পরিচয় পাই। তিনটি করে নারী ও পুরুষ চরিত্রে সাহিত্যচর্চা ও লেখার ঝোঁক কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে দিয়েই একাধিক কথন ভঙ্গি বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন। বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্য ও প্রেম নিয়ে। কোন চরিত্রের

মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা আলাদাভাবে ফুটে ওঠেনি। উপন্যাসের পটভূমিকায় চৌরঙ্গী ও ধর্মতলাকে কেন্দ্র করে নায়ক-নায়িকাদের বিচরণ লক্ষ করি। উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইন্দ্রজিতের পরিচয় পাই। বুদ্ধদেব বসু ইন্দ্রজিতের সূত্র ধরেই দুটি চরিত্র সুলতা ও ঈশানকে এনেছেন। ইন্দ্রজিৎ একনিষ্ঠ সাহিত্য প্রেমী, উদার, সৎ মনের অধিকারী কিন্তু অন্য দুটি বন্ধুর মধ্যে দ্বিজেন একেবারেই পিশাচ, ভণ্ড শ্রেণীর চরিত্র। উপন্যাসে যৌন তাড়নার উদ্দাম বহিঃপ্রকাশ মূলতঃ দ্বিজেন চরিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। দ্বিজেনের থেকে ইন্দ্রজিৎকে বেশী আত্মসচেতন করার প্রবণতা লেখক দেখিয়েছেন। একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে বুদ্ধদেব উপন্যাসে দ্বিজেন ও সিতাংশুকে দেখিয়েছেন। দ্বিজেন চরিত্রটিকে বুদ্ধদেব অসামাজিক রূপে উপন্যাসে এঁকেছেন। কারণ সে ইন্দ্রজিতের হাত ধরে সুলতার বাড়িতে গিয়েছিল। সুলতার সঙ্গে দ্বিজেনের যৌন মিলন উপন্যাসে আলাদা মাত্রা এনেছে।

এই উপন্যাসে একটি উপকাহিনী আছে, তা হলো সিতাংশু - মালিনীর প্রেমের কাহিনী। কিন্তু কবি তাদের প্রেমের বিস্তার ও স্বতন্ত্রতাকে দেখান নি। প্রত্যেকটি চরিত্রের কবিতা লেখার অভ্যাস এই উপন্যাসে দেখা গেলেও কাব্যধর্মিতার আড়ালে বুদ্ধদেব উপন্যাসের চরিত্রে প্রেমের প্রয়োগ কৌশল শিল্প হিসাবে কবিতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"আপনার চেয়ে
যে - প্রেম মহানতরো
জোনাকীর মত
জ্বলে সে ধরণী-'পর
যতই গোপন করো
জোনাকীর মত ? দ্বিজেন বললে, জাপানিদের প্রেম কি জোনাকির মত ঠাণ্ডা ?" - ৫৪

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে মীরার পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে উপন্যাসের প্রথম অংশে জানতে পারি। কিন্তু দ্বিজেন, সিতাংশু তাদের বিবাহ বন্ধনে বাধা সৃষ্টি করেছে, বুদ্ধদেব ইন্দ্রজিতের বন্ধুদের বখাটে চরিত্র হিসাবেই উপন্যাসে এঁকেছেন।

মীরার বিয়েতে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গটি রূপকের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে।

"দুজনের পায়ের ধাক্কায় নৌকা গেল জলের মধ্যে অনেকখানি সরে- বাকি দুজন পড়ে রইল"।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে সংলাপ রচনায় বিদেশী লেখকদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ এনে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা এই উপন্যাসে এনেছেন। সিতাংশুও বলেছে -

"ইজাডোরা ডানকনে একবার বার্নাড শ কে লেখা পাঠালাম ঃ তোমার Intellect আর আমার Beauty দিয়ে যদি একটা মানুষ তৈরী হয়, তাহলে তার জন্য পৃথিবী আমাদেরকে ধন্যবাদ দেবে"। বার্নাড শ জবাব দেন ঃ "কিন্তু যদি সে ব্যক্তি আমার Intellect আর তোমার Beauty নিয়ে আসে ?"

পাশ্চাত্য কবিদের ও নাট্যকারদের নিয়ে ইন্দ্রজিৎ ও সিতাংশুর মধ্যে এই ভাবে বার বার তর্ক-বিতর্ক করতে দেখা গেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রকে লেখক যেন নিজেই কারো সঙ্গে গল্প করে বলেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপে অবচেতন মনের অন্তঃমুখী জগতের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি এঁকেছেন। জীবন চেতনার কোন গভীরতা কোন চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলো অনেক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

"গোলাপ কেন কালো" (১৯৬৭-৬৮ খ্রীঃ) উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দেশে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপট উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেব মূলত এই পটভূমিকায় দেশ ও মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। পরিবারের কাহিনীগুলিতে হৃদয়ের কামনা-বাসনার স্রোত বৃহত্তর জাতীয় জীবনে একটি তাৎপর্য এনেছিল।

"ভারতবর্ষ কি টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে আবার ? তার পর আবার কেউ বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে ? আর সেই ইংরেজ, যাদের আমরা ঘটা পটা করে দেশ থেকে তাড়ালুম, তারা সমুদ্রের ওপারে বসে কেমন হাসছে বলুন তো ? তাদের বিরুদ্ধে যে সব অস্ত্র আমরা চালিয়ে ছিলুম সেগুলি দিয়ে পরস্পরকে আমরা জখম করছি এখন -

পরস্পরকে, মানে নিজেদেরই। তামাসা - তাই না ? জানেন, আমিও একবার ভেবেছিলুম ইংরেজকে তাড়াতে পারলে ভারতবর্ষ ভূস্বর্গ হবে" - ৫৫

বুদ্ধদেব আঙ্গিকের নূতন সম্ভাবনা এই উপন্যাসে দেখান নি। উপন্যাসের প্লটে পাঁচটি কাহিনীর পৃথক চেহারা ধরা পড়েছে। যদিও সবটা মিলে বেশ জট পাকিয়ে গিয়েছে।

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে রণজিৎ এর জবানীতে কথা বলেছেন। বহুকথন রীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে সাহিত্য লেখক রণজিৎ এর পরিবারের সুন্দর ছবি দেখা যায়। উপন্যাসের অষ্টম খণ্ডে কাজলের সঙ্গে রণজিৎ এর অবৈধ সম্পর্ক। কাজলের স্বামী ফটিক উচ্চশিক্ষা লাভে বিদেশ গিয়ে স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হন। এই সময় কাজল ও রনজিৎ-এর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফটিক ছিলেন রণজিৎ এর মামা। দীর্ঘদিন কাজল ও ফটিকের মধ্যে অবৈধ প্রণয় লেখক দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজের কথনে ঘটনাকে অগ্রসর করেছে। লেখক উপন্যাসের ঘটনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ফটিক ও কাজলের ভূমিকা জীবন্ত বলে মনে হয়েছে।

অনাদি এই উপন্যাসে স্বদেশী ভাবনার মূর্ত প্রতীক। বুলবুল ও অমূল্য সকলেরই অনাদিবাবু ছিলেন স্বদেশী ভাবনার মূল প্রেরণা দাতা। অনাদিবাবুর মেয়ে মিতার সঙ্গে রণজিৎ এর প্রেম, অন্যদিকে রণজিৎকে একইভাবে ভালোবাসে বুলবুল। এই ত্রিভুজ প্রেমের প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব উপন্যাসের শেষে এনেছেন। কারণ মিতার বাড়িতে পিস্তল চুরি করে বুলবুল। বুলবুলের এই চুরিতে মিতার চার বছর জেল হয়। এই ঘটনা দিয়ে লেখক উপন্যাসে জটিল পরিস্থিতি তৈরী করেছেন।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বিচিত্র ভঙ্গিতে স্বদেশ ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছেন। লেখক যখন আর্থার জোন্সের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করেন তখন বুলবুলের মধ্যে দেখা গিয়েছে তীব্র স্বদেশ ভাবনা। ঔপন্যাসিক এখানে নিজস্ব স্বদেশ ভাবনা ও ঘটনার বিবরণে বুলবুল চরিত্রকে তীব্র স্বদেশী চেতনার মূর্ত প্রতীক করে গড়ে তুলেছিল।

বুদ্ধদেব তার প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে কাজল ও রণজিৎ এর অবৈধ প্রণয় আকর্ষণ দেখিয়েছেন। অনুশোচনা, পাপবোধ এবং নিজেকে ফাঁকি না দেওয়ার আত্ম-অনুশোচনায় বুলবুল ও মিতাকে রেখে কাজলকেই জীবন সঙ্গিনী করেছে। স্বামী-স্ত্রীর

দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরানো বুদ্ধদেবের উপন্যাসে একটি চেনা সুর। এই দাম্পত্য জীবনে অবৈধ প্রেমের স্বীকৃতি দেবারও চেষ্টা বুদ্ধদেব অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানেও দেখিয়েছেন। অসংযতভাবে ঘটনাকে সোজাসুজি উপন্যাসে এনেছেন। উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল তারই প্রতিফলন বুলবুল, অমূল্য, রণজিৎ চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। এখানে লেখকের স্বদেশ ভাবনা কেবলমাত্র বুলবুল চরিত্রের মধ্যেই জীবন্ত করে তুলেছিলেন। আর অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে ততটা সজীবতা লক্ষ করা যায় না। গোটা উপন্যাসে মৃত, অস্থির, গতিহীন ভঙ্গি নিয়ে চরিত্রগুলি বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে এঁকেছেন। চরিত্রগুলির আত্মমর্যাদা আছে। বুদ্ধদেব বসু প্রণয়ের ব্যাপারে আধুনিক নাট্যধর্মী সংলাপ ব্যবহার করেছেন।

"গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসের সংলাপ গুলি ধীর স্থির, মার্জিত ও বিনয়ী। প্রেমাকর্ষণ থাকলেও তা তীব্র হৃদয়বিদারী নয়। লেখক স্বদেশী ভাবনার মেঘলা আবহাওয়ায় গোটা উপন্যাসে একটা গোপন পরিবেশ তৈরী করেছিল। লেখক ইংরেজদের প্রতি রণজিৎ এর সংলাপ, ছড়াকাটা প্রভৃতির কৌতুক রসের স্বাদে আকর্ষণ আনার চেষ্টা করেছেন।

"বুলবুলের সঙ্গে মিতুর বন্ধুতার ভিত্তিটা কী তা জানার জন্য কৌতূহল হলো আমার, জিজ্ঞাস করলাম, বুলবুলকে আপনিকি অনেক দিন ধরে চেনেন ?" -৫৬
সংলাপের মধ্যে একটা অজানা কারণে প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখে প্রশ্ন করতে দেখা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর স্বদেশ ভাবনা - "গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসে দেখা যায়। উপন্যাসের প্রচলিত প্রথা থেকে বুদ্ধদেব বসু বেরিয়ে এসে স্বদেশীয়ানার ধর্ম উপন্যাসে এনেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তার শিল্প চেতনা অপ্রযুক্ত হয় নি।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের বিভিন্ন শিল্পরীতি আলোচনা করার পর আমরা দেখতে পাই "সাড়া", "যবনিকা পতন", "রাত ভ'রে, বৃষ্টি", "মন-দেয়া-নেয়া", "বাসর ঘর", "ধুসর গোধূলী" উপন্যাসে যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ বার বার দেখা যায়। "সাড়া" ও "মন-দেয়া-নেয়া" ছাড়া এই পর্বের অন্যান্য উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে জটিল আবর্তে প্রেম নিস্পৃহ হয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের উপন্যাসের রচনাভঙ্গিতে দাম্পত্য প্রেমের বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসে বলার ভঙ্গি একটু ঢিলেঢালা, "মন দেয়া-নেয়া"

তে প্রেম বিষয়টি বলার ভঙ্গি ও গল্প করার ইচ্ছা নূতন তাৎপর্য লাভ করেছে। এই ধরনের উপন্যাসে শিল্পরীতি সার্থকতায় পৌঁছেছে।

বুদ্ধদেবের প্রেম বিষয়ক উপন্যাসে চরিত্রগুলি অভিজাত পরিবারের। নায়ক ও নায়িকা অবশ্যই কলকাতা বা ঢাকা শহরের। লেখক চরিত্রের অবাধ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় খর্ব করেন নি। অধিকাংশ উপন্যাসে লেখক চরিত্রের প্রেমকেই বড় করে তুলেছেন, সমাজকে নয়। উপন্যাসে এই কাঠামো বজায় রাখতেগিয়ে আঙ্গিক চেতনার কোথাও বিচ্যুতি ঘটে নি। উপন্যাসে নিজস্ব ভঙ্গি তিনি আবিষ্কার করেছেন। একটি নূতন রীতিতে কথা বলার এই কৌশল উপন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছে। "সাড়া" উপন্যাসে জীবন বিষয়ে গভীর ভাবনা দেখা যায় না। সাগরের কাম তৃষ্ণার যেন শেষ নেই। দাম্পত্য জীবন পেয়েও সাগর যেন দায়িত্বহীনভাবে কোন অজানা দেশে পাড়ি দিতে চেয়েছে বার বার।। "রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসের প্রথম দিকে এই রূপজ কামনা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্ত নিজের দাম্পত্য জীবনে মালতী সুখ না পেয়ে জয়ন্তর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। পরে মালতী ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর সংসারকেই আসল মনে করে। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখানোর পর মিলন ছিল না বললেই চলে। প্রথম পর্বের উপন্যাসে আমরা চরিত্রের ভোগী মানসিকতা, দেহজ কামনা-বাসনা ও যৌন উদ্দীপন মূলক ক্রিয়াকলাপের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায়। প্রথম পর্বের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবন ধ্বংসের পর চরিত্রগুলির চেতনা ফিরে নি। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বাস্তবমুখী জীবন চেতনায় চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছিলেন। লেখক উপন্যাসে নায়ক, নায়িকাদের ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার আবর্তে নূতন ভাবে তুলে ধরেছেন।

উল্লেখ পঞ্জী

১) সাহিত্য প্রকরণ / হীরেণ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক দেবাসিষ ভট্টাচার্য্য, তৃতীয় সংস্করণ পৌষ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, ১১, এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ /পৃষ্ঠা-.৮

২) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা / সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ২০০০, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩ /পৃঃ ৪০

৩) ঐ পৃষ্ঠা-২২

৪) সাহিত্য তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ/ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩ / পৃষ্ঠা - ১৯৪।

৫) ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৪

৬) "দেশ" (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ-শ্রাবণ যুগ্ম সংকলন সাহিত্য সংখ্যা)/পৃষ্ঠা-২০

৭) সাহিত্যের পথে ["সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধ] রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সংখা, ১৪ খণ্ড, পৃষ্টা-৩৭২

৮) মানিক গ্রন্থাবলী/চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ/ পৃষ্ঠা-২০১

৯) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/প্রকাশক- শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/পৃষ্ঠা- ৮২

১০) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৮৩

১১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-২২৬

১২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (ষষ্ঠ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা-৩৮৮

১৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (ষষ্ঠ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা-৪৭৮

১৪) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (ষষ্ঠ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৪৭৮

১৫) বুদ্ধদেব বসু / যেদিন ফুটলো কমল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫২। / পৃষ্ঠা- ৫৩

১৬) বুদ্ধদেব বসু / যেদিন ফুটলো কমল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫২। পৃষ্ঠা- ১১২

১৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (অষ্টম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ পৃষ্ঠা-৩৪৬

১৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (অষ্টম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৩১৫

১৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (অষ্টম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৩৭৪

২০) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৯১

২১) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৯১

২২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (সপ্তম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৭৪, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১২৩

২৩) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১২৪

২৪) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১২৪

২৫) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১২৪

২৬) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-২২৭

২৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-২২৮

২৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-২০২

২৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ

আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৫৫

৩০) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ১২৯

৩১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ১৩৭

৩২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ১৩৭

৩৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ৭২

৩৪) ঐ /পৃষ্ঠা- ৭৩

৩৫) ঐ / পৃষ্ঠা- ৭৫

৩৬) ঐ / পৃষ্ঠা- ৮২

৩৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (সপ্তম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৭৪, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১৫৭

৩৮) ঐ / পৃষ্ঠা-১৭২

৩৯) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-২৮৭

৪০) ঐ / পৃষ্ঠা-৩৫০

৪১) ঐ / পৃষ্ঠা-৩৪৮

৪২) লাল মেঘ / ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৩। পৃষ্ঠা - ১৩৯

৪৩) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৫৩০

৪৪) ঐ / পৃষ্ঠা-২৪২

৪৫) ঐ / পৃষ্ঠা-২৪২

৪৬) ঐ / পৃষ্ঠা-১৯

৪৭) ঐ / পৃষ্ঠা-২৪

৪৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৭ম খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-১১৬

৪৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৭ম খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-১১৮

৫০) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৬ষ্ঠ খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-২০৬

৫১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৬ষ্ঠ খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-২১০

৫২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৬ষ্ঠ খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-১৪৭

৫৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৭ম খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-২৭২

৫৪) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/২য় খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-৬৬

৫৫) ৫৫) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৪০৮

৫৬) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৪৫৫

উপসংহার

প্রতিটি মানুষ জীবনের সঙ্গে তার সৃষ্টিকে স্মরণীয় করে তোলে। কবি জীবনানন্দ দাস বলেছিলেন -

"কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবু নিবিড় অর্ন্তভেদী
দৃষ্টিশক্তি রয়ে গেছে মানুষকে মানুষের কাছে ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করার"।

এই দৃষ্টিশক্তির মধ্যে দিয়েই জীবন হয়ে ওঠে যেন এক শিল্পাকৃতি। আর সেই শিল্পের মানুষ হয়ে ওঠে যুগের প্রতিবিম্ব। তাই আমরা বলতে পারি জীবন শিল্পীর কল্পনায় মুক্ত হয়ে ওঠে। এই মুক্ততা এক সূত্রে গ্রথিত করে মুক্তি দেয় মানুষের অন্তরের সুপ্ত কামনা বাসনার নূতন ভাব চেতনাকে। চেতনার আকাশ মানুষেরই মনের রূপময় আত্ম প্রকাশ। তাই সাহিত্যকে বলতে পারি জীবনের আয়না। এক কথায় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হলো মানব জীবনের সামগ্রিক ছবি। তাছাড়া মানব সত্তা প্রতি মুহূর্তে নূতনের মোহে পুরাতনের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দিতে চায়। তবে তা কখনও পুরোপুরি অনন্ত জীবনের ধারাকে বয়ে আনে না। সমকালীন বিষয়কে অবলম্বন করেই সাহিত্যিকেরা গতিশীল চিন্তা ও শিল্প প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার শিল্প সত্তার মূল উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেন।

এই গতিশীল চিন্তার প্রবাদপ্রতীম পুরুষ ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর উপন্যাস যেন নগর ও বিশ্বমানবের প্রেক্ষাপটে নর-নারীর জীবনের গতি প্রতিটি কামনার বিন্দু দিয়ে সাজানো এক শিল্পমূর্তি। আর এই সজ্জিত শিল্পে জীবনের চেতনার আকাশ ছোঁয়া অনুরাগ, যৌন কামনা, দাম্পত্য ভাবনাগুলি সমকালের অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাস সাহিত্যে স্বতন্ত্র শিল্প ভাবনা হিসাবে মান্যতা পেয়ে যায়। অভিনব শিল্প কর্মের আঙ্গিকে উপন্যাসগুলি প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করেছে বলেই নূতন রূপ, ভিন্ন স্বাদে ও গন্ধে ভরা নর-নারীর অর্ন্তমুখী ভাবনা বুদ্ধদেবের সাহিত্যে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। উপন্যাসে

তার জীবন আদর্শের নূতন রূপ ও ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কালজয়ী হয়েছে। যেমন মৌলিনাথ (মৌলিনাথ উপন্যাসে) শ্রীপতি (নীলাঞ্জনের খাতা), বীরেশ্বর (শেষ পাণ্ডুলিপি) প্রভৃতি চরিত্রগুলি উপন্যাসে জীবন ও যৌবনের উদার স্বাধীনতায় ব্যক্তি মানুষের ভিন্ন সত্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি।

মানুষ তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সত্তাকে তুলে ধরে। সাহিত্যিকরা ঐ নব সত্তার আলোয় জগৎ ও জীবনকে দেখতে চায়। জীবনের পরিধি সাহিত্যিকের শিল্পের ক্যানভাসে হয়ে ওঠে কালজয়ী। সব মানুষের আবেদন উপন্যাসে থাকে বলেই জীবন ও কালের প্রেক্ষাপটে ঐ- ভাবনারই প্রতিবিম্ব বুদ্ধদেবের উপন্যাসে এক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুতরাং নাগরিক জীবন উপন্যাসে পেল মুক্তি। ঢাকা ও কলকাতা নগর উপন্যাসের প্লটে স্থান পেয়েছিল। নর-নারীর বিচরণের গণ্ডী ঐ দুটি শহরের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। বুদ্ধদেব মানুষের সুখ দুঃখের মধ্যে জীবনের দেহজ কামনার আকর্ষণ চরিত্রের শিরায় শিরায় নীরব অনুভবে তুলে ধরেছিলেন। একদিকে এই নগর জীবনের আভাস অন্যদিকে দাম্পত্য জীবন আলাদা মাত্রা পেল তাঁর উপন্যাসে। দাম্পত্য জীবনের এই নব মূল্যায়ন সমগ্র কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেব আলাদা স্বাদ এনেছিলেন।

পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে আতঙ্কিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে মেয়েদের মেলামেশায় যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল তা বুদ্ধদেব উপন্যাসে দেখালেন। সমকালীন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে নর-নারীর জীবন যন্ত্রণা যে অন্তরের মধ্যে লুকায়িত ছিল তা বেদনার কালো ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল। এই পরিবেশ থেকেই নিঃসঙ্গ জীবনের অস্থিরতা তাঁর উপন্যাসে স্বতন্ত্র এক জগৎ তৈরী করল। এই স্বতন্ত্রতা অবশ্যই তাঁর জীবন থেকে উঠে আসা ঘটনায় কিছু প্রতিফলন আয়নার মতো তাঁর উপন্যাসে দেখি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি দেহ কামনার উচ্ছ্বাসে

ভরা শতদলের মতো। উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষায় তারা যেন অপেক্ষমান। গল্প বলার পরিবেশ দিয়েই তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পাপড়িগুলি বিকশিত হয়েছিল। জীবন জিজ্ঞাসাকে বাদ দিয়ে যে উপন্যাস হতে পারে না, যৌন জীবনকে অস্বীকার করার অর্থই জীবনের কোন এক দিককে ব্যাহত করা- এই দিকগুলি বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন। এই সত্যতার দিকটি তিনি শিক্ষিত মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ করেই তুলে ধরেছিলেন। যা সেকালে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র এ পথে পথপরিক্রমা করলেও বুদ্ধদেবের কল্পজগতের ধারে কাছে তাঁরা আসতে পারেন নি। এই মানসিকতা সেকালে অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে কতটা আলাদা ছিল তা আলোচনা করা দরকার।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনাতে আধুনিকতা প্রবলভাবে সাড়া তুলেছিল। তাঁর গোড়ার দিকের রচনায় যৌন বিষয়ে একটা বে-আব্রু মনোভাবও দেখা যায়। জীবনের বহিঃভাগের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উপেক্ষা করে বুদ্ধদেবের মতো অচিন্ত্যকুমারও নৈর্ব্যক্তিক আত্মার অবগুণ্ঠন উন্মোচনে ব্যস্ত। সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা শতধাখণ্ডিত, ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছদ্মবেশাবৃত আত্মার, জ্যোতির্ময় ও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ তার উপন্যাসের দর্পণে ধরা পড়ে। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের মধ্যে আকস্মিক (১৯৩০ খ্রীঃ), কাক জ্যোৎস্না (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) ইন্দ্রাণী (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), উর্ণনাভ (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), নবণীতা (১৯৪৩ খ্রীঃ), আসমুদ্র প্রভৃতি উপন্যাসে ঐ চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করি। এই প্রতিফলন প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসেও একটি অভিনব ভঙ্গিতে উঠে আসে। কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্র, কল্লোল গোষ্ঠীর একজন জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার-এর সহগোষ্ঠীভুক্ত লেখক হয়েও ভাব-ভঙ্গিতে উপন্যাস ক্ষেত্রে অনেকটা বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস অনেকটা বাস্তবধর্মী । অহেতুক কাব্যধর্মী উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে কাহিনীতে নূতন ভাবের অভাব তিনি ঘটাতে চান নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস "পাঁক"-এ দরিদ্র গৃহস্থ ও বস্তিবাসীর কুৎসিত জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "মিছিল" - এ দেখা যায় নারী নির্যাতনের একটি নিষ্ঠুর ও বাস্তব কাহিনী। তিনি "কুয়াশা" উপন্যাসে আরো অনেকখানি পরিণত বিষয়ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া আলোচ্য উপন্যাসে তাঁর পরিকল্পনা শক্তির নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। পরবর্তী জীবনে তিনি বিচিত্র রসের নানা উদ্দীপক কাহিনি লেখেন। কল্লোল কালের লেখক দের পথেই হাঁটলেন প্রবোধকুমার সান্যাল। তিনি উপন্যাসের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নূতনতর ভাব ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ থাকলেও তাতে ছিল না

কোন দেহগত আকর্ষণ। তাঁর উপন্যাসে বন্ধুত্বপূর্ণ মিলনের মধ্যে মান-অভিমান বা আবেগ-অনুরাগের সর্বপ্রকার উত্তেজনা পরিহার করে নর-নারীরা বাস করে। প্রবোধকুমারের বিখ্যাত "প্রিয় বান্ধবী" উপন্যাসে এরূপ একটি পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা পরিলক্ষিত। তাঁর "অগ্রগামী" উপন্যাসেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এরূপ একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। উপন্যাস রচনায় এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সেকালের উপন্যাস সাহিত্যে আলাদা তাৎপর্য এনেছিল। কিন্তু প্রবোধকুমারের উপন্যাসে নায়কদের নারী স্পৃহাহীনতা সেকালের লেখকদের থেকে পৃথক ছিল বলা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্বভাবতই উঠে আসে। তাঁর রচনাতে প্রথম থেকেই সেক্স ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়। বাল্যকাল থেকেই তিনি নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সঙ্গে সহজাতভাবে মেলামেশা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের দরিদ্র মানুষদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রার ছবিও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। এই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যৌন বিকারের যে চিত্র তিনি দেখিয়েছেন, তার বর্ণনা পাওয়া যায় "পুতুলনাচের ইতিকথা" উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস "পদ্মানদীর মাঝি" (১৯৩৬ খ্রীঃ)। এই উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিকতার ফ্রেমে নর-নারীর সম্পর্কের দিকটি উপন্যাসে বার বার তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া "জননী" (১৯৩৫ খ্রীঃ) "দিবা রাত্রির কাব্য" (১৯৩৫ খ্রীঃ), "শহরতলী"(দুই পর্ব) "সোনার চেয়ে দামী", "শহর বাসের ইতিকথা" (১৯৪৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের জৈবিক কামনা-বাসনার দিকগুলি তুলে ধরেছিলেন। সমকালীন যুগের বলয়ে ঘূর্ণিয়মান লেখকদের থেকে বুদ্ধদেব বসু একটু যেন ভিন্ন পথে পাড়ি দিলেন। যে পথ তাঁর কর্মমুখর বাস্তব জীবন বহির্ভূত এক কল্পনার রঙ্গীন দেশ। সে দেশের নর-নারীরা ছিল লেখকেরই অকৃত্রিম সৃষ্টির ফসল।

আবার বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বিষয় ভাবনা ও শিল্পরীতিতে জগৎ ও জীবন যেভাবে ধরা পড়ে, তাতে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অন্তর্জগতে বার বার যেন কিছু জিজ্ঞাসা করে। তিনি উপন্যাস জগতে একটি বিশেষ পরিস্থিতির মাঝে আমাদের মানবিক যাত্রাপথকে কিছুটা তুলে ধরেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁর এই আদর্শ রচনার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত ছিলেন। শেষ গ্রন্থেও তাঁর এই প্রস্তুতি ধরা পড়ে। তাঁর সৃষ্ট "সানন্দা" ও "আমার বন্ধু" উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই "হঠাৎ আলোর ঝলকানি", "অদৃশ্য শত্রু" ও "কঙ্কাবতী"র কিছু কিছু কবিতাও ঐ সময় লেখা হয়েছিল। এই সব গল্প, উপন্যাস ও কবিতা পরবর্তী লেখকদের রচনার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া উপন্যাসের

সংলাপ, গদ্য, বাক্যগঠন, শব্দ চয়ন - এইগুলিই হল লেখকের মূল আত্মপ্রকাশের পথ। নাটক আর কবিতাতে তিনি যে মনের পরিচয় দিয়েছিলেন, উপন্যাস সাহিত্যে তিনি নূতন রীতি প্রয়োগে ততটা সচেতন ছিলেন না।

এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের কথাসাহিত্যিকদের আঙ্গিক রীতিতে বিষয় ভাবনাগুলি কিভাবে উঠে এসেছিল তা দেখা যেতে পারে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে সামাজিক ও পারিবারিক সংগ্রামের ছবিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সামাজিকতা ইতিহাসের মোড়কে আবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে উপন্যাসের বিষয় ভাবনা ও শিল্পরীতিরও পরিবর্তন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের প্রকরণে যে নূতনত্ব পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তা থেকে আলাদা। আবার কল্লোলকালের কথাসাহিত্যিকরা উপন্যাসের নর-নারীর আচার আচরণের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন, তা অন্য ধরনের। এই কালের লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সমাজের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামের পরিচয় উপন্যাসে তেমনভাবে দেখালেন না। তিনি ভূমিহারা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি উপন্যাসে তুলে ধরলেন। তিনি উপন্যাসের বিষয়ভাবনায় ও আঙ্গিকে জৈবিক দেহ কামনাকে গুরুত্ব দিলেন। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, ব্যক্তি মনের জিজ্ঞাসা ও যৌন জীবনের চাহিদা তাঁর উপন্যাসে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব পেল। নর-নারীর ব্যক্তি সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজ নিরপেক্ষ আত্মশক্তির নূতন রূপকার তাকে বলা যেতে পারে। যুব চিত্তের মধ্যে তখন যে অস্থিরতা ছিল তা প্রকাশ করতে গিয়ে যৌনতাকে উপন্যাসে তিনি অস্বীকার করেন নি। আর এটাই ছিল সেদিনের হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে নর-নারীর মুক্তির পথ।

বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে চরিত্রের মনের ভেতরে ডুব দিতে চেয়েছিলেন। এটা অবশ্য বুদ্ধদেবের কবিতা, নাটক, ছোটগল্প যেকোন রচনারই মূল বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। কারণ তিনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। তবে একথা ঠিক যে, মনের ভিতরে ডুব দিয়ে দেখাটাই বুদ্ধদেবের স্বভাব। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের নর-নারীরা তাই ব্যক্তির নৈঃসঙ্গের জগতে একা একা ঘুরে বেড়ায়। তাদের কথাবার্তায় শূন্যতাবোধের পরিচয় মেলে। তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভালোবাসা ও ব্যর্থতার মধ্যে আধুনিক সমাজের শূন্যতা ও হৃদয়ের রিক্ততার ছবি ফুটে উঠেছে। জীবনের এই শূন্যতার ছবি তুলে ধরতে গিয়ে বুদ্ধদেব সেকালের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কাছে প্রেমের স্বরূপ কি ছিল তা দেখিয়েছেন। এই শ্রেণীর মানুষের জীবনে প্রেমের ছবিটি গতানুগতিক ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি।

সেকালের পটভূমিতে বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নর-নারীরা যেভাবে চলাফেরা করেছিল তা কখনই বাস্তব বর্জিত বলে মনে হয় না। তাই কালের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় চরিত্রগুলি প্রেম-বিরহ বাস্তবতার সংস্পর্শে এলেও মাঝে মাঝে বাধা পেয়েছিল লেখকের কবি স্বভাবের জন্য। কবিত্ব ও নায়ক-নায়িকাদের কবিতা লেখার ঝোঁক তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা যায়। যার ফলে বাঁধাধরা যান্ত্রিক জীবনের ছকে নির্দিষ্ট শহর ও নগরের এলাকায় বুদ্ধদেবের উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। তাই প্লট বা কাহিনির জটিলতায় তাঁর উপন্যাসের নর-নারীরা মাঝে মধ্যেই দিশেহারা বোধ করেছিল। এখানেও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তৎকালীন সমাজ জীবনের ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্যতার দিকগুলি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই মানসিকতায় চরিত্রগুলি দেহ কামনাকে বর্বরের মতো উপভোগ করতে দেখা যায়। তিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে এই দিকগুলি বিশেষ করে দেখিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর উপন্যাসে অশ্লীলতার বিষয়গুলি মাঝেমধ্যেই উঠে এসেছিল।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নিয়ে অনেক সমালোচক যাই বলে থাকুক না কেন একটি বিষয়ে সবাই একমত ছিলেন যে, তাঁর মানসিকতাই ছিল আত্মকেন্দ্রিক ও অর্ন্তমুখী। এছাড়া মনোময়তা ও বিষাদই ছিল বুদ্ধদেবের অধিকাংশ উপন্যাসের মূল সুর। "যবনিকা পতন" উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডর প্রথম পরিচ্ছদে ইলার দুঃখবিলাস সম্পর্কিত মন্তব্যে আমরা দেখি -

"যদি খানিক্ষণের জন্য দুঃখের লাগাম একেবারে ছেড়ে দেওয়া যায়, যদি নিজেকে নির্যাতন করে মনের দুঃখানুভূতির ক্ষমতাকে শেষ পর্যন্ত খরচা করা যায়, তাহলে সেই ক্লান্তি থেকেই উদ্ভুত হয় নতুন উপভোগস্পৃহা। জীবনের রুচি ফিরে আসে"। সেই বয়সেই বুদ্ধদেব তাঁর এই নায়িকাকে দিয়ে ভাবিয়েছিলেন - "উভলিঙ্গ পতঙ্গের মতো জীবন বার বার নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করে ; পরম ক্ষয়ের মুহূর্তেই প্রাণ পুনরুজ্জীবিত হয়।" - ১

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে সে কালের কিশোরী নায়িকারাও কতো যে চিন্তাশীল ও উপভোগপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায়। সেকালের সমাজ ব্যবস্থাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। প্রেম নিবেদনের বিষয়কে উপন্যাসে স্থান দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। কিন্তু আজকের সভ্যতায় তা

বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে সেই আধুনিকতার অনেক লক্ষণ পরিস্ফুট। কিন্তু কল্লোলীয় চেতনা বুদ্ধদেবকে এই আধুনিকতা আনতে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। কেবল কল্লোলের লেখাই নয়, সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এই নূতন চেতনা আনতে সাহায্য করেছিল। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালি কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়, কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটু উঁচু তটভূমি মাত্র" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/পৃ ঃ৪৫১)। আবার ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন "বুদ্ধদেবের তাবৎ গল্প উপন্যাসে তাঁহার নিজেরই যেন আত্মবিস্তার" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাঁস/ চতুর্থ খণ্ড/পৃঃ ১২০)।কিন্তু তাঁর সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু যে ভিন্ন খেয়ালী কল্পনার স্বতন্ত্র ছিলেন সে সম্পর্কে কোন বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা পূর্বে পাই না। সমালোচকদের বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস সম্পর্কে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের মধ্যে সমালোচকরা কাব্যময়তার দিকেই বারবার ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা ভাবলে দেখা যায় এই জটিল সময় প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত আধুনিক মন নিয়েই তিনি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তিনি যে অশ্লীল ও যৌনতাকে উপন্যাসে নর-নারীর মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সে মানসিকতা এসেছিল শুধু সাহিত্যের দিক দিয়ে নয়, তিনি মনে প্রাণে এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তা না হলে একই অভিযোগে সমরেশ বসুর "প্রজাপতি" (১৯৬১ খ্রীঃ) উপন্যাসের জন্য তাঁকে যখন আদালতে যেতে হয়েছিল সেই দুঃসময়ে সমরেশ বসুর হয়ে বুদ্ধদেব বসুও আদালতে সশরীরে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় বুদ্ধদেব বসুর মন ও মানসিকতা ঐ ভাবনা আনার কতটা পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং এই সময়কাল ও বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলি রচিত হয়। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলাদেশের পরিবেশ হয়েছিল ভঙ্গুর ও বিধ্বস্ত। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলি এই সময়েই লেখা হয়েছে। শুধুমাত্র কাব্যিকতাকে অবলম্বন করে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি আবর্তিত হয় নি, বরং ব্যক্তির নিঃসঙ্গতার আলাদা বৈশিষ্ট্য এই ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্র কিভাবে উঠে এসেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সমালোচক তাঁর উপন্যাসে সমাজ ও ব্যক্তি উপন্যাসের সীমানার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে আছে বলে যে অভিযোগ করেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তির দূরত্ব তাঁর উপন্যাসে অন্যভাবে এসেছিল। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে চরিত্রগুলি তাদের সামাজিক গণ্ডী

ও মানুষের কাছাকাছি থেকে মুক্ত ও স্বাধীন বিশ্বাসের উপযুক্ত পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। চরিত্রগুলির নিজস্ব সত্ত্বা নিজের মনোজগতের মধ্যেই বারবার ডুব দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপন্যাসে ধনী জীবনের যে পরিচয় তুলে ধরলেন তাতে ধনী জীবন যাত্রার উদ্ভট খেয়াল ও বুঁর্জোয়া মানসিকতাকে কষাঘাত করেছে। মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব সমাজকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের উপন্যাসেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল। কারণ উপন্যাসের বিষয় ভাবনা সমকালীন কল্লোলীয় সাহিত্য আন্দোলন থেকে এসেছিল। এই থেকে সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে নূতন ভাবধারা। এই সময়কালে বাংলাদেশে রোমান্টিসিজমের যে ভরা জোয়ার এসেছিল, তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব খানিকটা কক্ষচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথে আবর্তিত হতে থাকেন। এই ভাবধারা প্রকাশ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক স্বপ্নভাবাতুরতায় সূক্ষ্মতর কাব্য সৌন্দর্য্যে উপন্যাসকে যেন সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে সমাজ থাকলেও, সমাজের অনুশাসন সেখানে ছিল না। বুদ্ধদেবের বিষয় ভাবনা কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে। চরিত্রগুলি যেন দেহ কামনায় চির পিপাসিত কোন অজানা দেশের নারী পুরুষ। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই নারী-পুরুষ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নাগরিক জীবনে নরনারীরা বিচরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষিত। কেউ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, আবার কেউবা তরুণ অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশান্তিতে ভরা দূষিত সমাজের মধ্যে দিয়ে নর-নারীর অন্তঃসারশূন্য ভালোবাসার দিকগুলি বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এইভাবে সমগ্র উপন্যাস জগতের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ছিলেন। এছাড়া তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকে যে নূতন ধারা এসেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বুদ্ধদেবের মন অবশ্য সেই আদি পর্বের ঘটনা ও অনুভূতির ভেদরেখা বর্জিত মেঘলোকে গিয়ে পড়েছে মাঝে মাঝে। ঐ পথের প্রবাহতেই সজীব ও সচেষ্ট ছিল তার গদ্যের কলম। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের ঘটনা দিয়ে কালের জলকে অনেকদূর গড়িয়ে দিয়েছিলেন। জীবনের জল বয়ে যায় কিন্তু সাহিত্যের জল অমর হয়ে থাকে। মনে হয় বুদ্ধদেব বসু এই ভাবেই জীবন ও সাহিত্যে দাগ কেটেছিলেন। বাংলায় রবীন্দ্রযুগের মধ্যেই রবীন্দ্র অনুভূতি বর্জন করে তিনি আলাদা জগৎ তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য পিপাসা শুধু বঙ্গসাহিত্যই নয়, আর্ন্তজাতিক আধুনিক সাহিত্যের দিকেও পা

বাড়িয়েছিল। তার এই সাহিত্য অভিযান বহু পরিমাণে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই স্বপ্ন ও সংকল্প যে কল্লোল-প্রগতিত-কালিকলমেই নিহিত ছিল তা নয়, উত্তরবর্তী বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সদৃশ্য ও বিসদৃশ্যের তরঙ্গে সেই স্বপ্ন বিস্তার লাভ করেছিল। এই নূতনত্ব বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে মনের জগৎকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল। মননকে তিনি উপন্যাসের নর-নারীর মধ্যে তুলে ধরেছেন। সুপ্ত জীবনের পরিক্রমায় বাংলা উপন্যাসে তাঁর কল্পনার পাখা অধিকক্ষণ স্থায়ী না হলেও নবযুগ রচনায় এই কল্পনা ছিল নূতন ধারার বার্তাবহ। তাঁর লেখায় মানব জীবনের চকিত আভাস কিভাবে জীবনকে বিশ্বমানবের সঙ্গে এক করে দেয় তার প্রয়াস উপন্যাসে দেখতে পাই। এই প্রয়াস নবজীবনকে আনার, নূতনত্বের আঘ্রাণ জানানোর ইঙ্গিত মাত্র। বুদ্ধদেবের সাহিত্যে তাই স্বদেশ থেকে মুক্ত হয়ে যুগান্তরের পথ বেয়ে বিশ্ব সাহিত্যের মেল বন্ধনে অমরত্বের দাবীদার। এই প্রবাহের নব আলোকে আমরা বুঝতে পেরেছি বুদ্ধদেব বসুর জীবন ও উপন্যাসের বিষয় ভাবনা ও শিল্পরীতি ছিল বহুতল যুক্ত। এছাড়া তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রেমের কামনা-বাসনার শূন্যতা থেকেই উপন্যাসের বিষয় ভাবনায় এক নূতনত্বের কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় , যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল।

উল্লেখ পঞ্জী

১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১ লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ২৩০

২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা -৪৬-৪৭

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১ লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৪) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা আশ্বিন, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৫) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (পঞ্চম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৬) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (ষষ্ঠ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (সপ্তম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৭৪, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (অষ্টম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (নবম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

১০)বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দশম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

১১)বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (একাদশ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ১ লা অগ্রহায়ণ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

১২)বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বাদশ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

১৩)বুদ্ধদেব বসু / দশটি উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৪, প্রকাশক- দেঁজ পাবলিশার্স, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।

১৪)বুদ্ধদেব বসু / যেদিন ফুটলো কমল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫২।

১৫)লাল মেঘ / ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৩।

সহায়ক গ্রন্থ

১) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত / কল্লোল যুগ/ প্রকাশক- শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯।

২) অমিতাভ চৌধুরী / ছাত্র জীবনের স্মৃতি থেকে, ৩০ শে নভেম্বর, কবিতা ভবন বার্ষিকী, ১৯৮৬, সম্পাদনা- প্রতিভা বসু।

৩) অমিয় বসু (সম্পাদনা) / নূতন পাতা ঃ বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, বিকল্প প্রকাশনী, কোলকাতা।

৪) অম্বুজ বসু / বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ ও চিন্তা, সম্পাদনা- দীপক কর, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, অভী প্রকাশনী, ১০ কিরণ শংকর রায় রোড, কোলকাতা-১।

৫) অরুণ কুমার সরকার / কবি বুদ্ধদেব বসু / প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

৬) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় / রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ / প্রথম প্রকাশ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক শ্রী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এ.মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা- ১২

৭) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়/রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ, কোলকাতা, দেঁজ পাবলিশিং, ১৯৯৮ সাল।

৮) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়/কালের পুত্তলিকা ঃ বাংলা ছোট গল্পের নব্বুই বছর। কোলকাতা, দেঁজ পাবলিশিং, ১৯৯৫ সাল।

৯) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় / বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল- ২০০২, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

১০) অরুণ কুমার বসু / ক্ষণিকের বাণী ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৭, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউড, কোলকাতা- ২৬, প্রকাশক- অতনু বসু।

১১) অশ্রু কুমার সিকদার (সম্পাদিত) / বুদ্ধদেব বসুর কাব্য জিজ্ঞাসা / প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

১২) অশ্রু কুমার শিকদার / আধুনিক কবিতার দিক্‌বলয়, কোলকাতা, সিগনেট বুক শপ, অগ্রাহয়ণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

১৩) অশ্রু কুমার শিকদার / আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কোলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮৮

১৪) অশোক সেন (সম্পাদিত) / বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্প / ৩০শে নভেম্বর, কবিতা ভবন বার্ষিকী ১৯৮৭।

১৫) অশোক কুমার ধর (সম্পাদিত) / বুদ্ধদেব বসুর শেষ পর্যায়ের উপন্যাস / প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯, প্রকাশক শ্রী আনন্দ ভট্টাচার্য্য, জি.এ. এন্টারপ্রাইজ, কোলকাতা-৫০

১৬) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ ১৯৭৭

১৭) অসীম সাহা / বুদ্ধদেব বসুর বৈচিত্রমুখীতা, তার প্রবন্ধের ভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, সংস্কৃতি প্রকাশন, কোলকাতা।

১৮) আনন্দ রায় সম্পাদিত, বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, কোলকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮

১৯) আবু সয়ীদ আইয়ুব / আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৭৯, দেঁজ পাবলিসিং, কোলকাতা-৯।

২০) আবু সয়ীদ আইয়ুব - আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, কোলকাতা, দেঁজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৮।

২১) আব্দুল হাফিজ / আধুনিক সাহিত্য চর্চা / প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক- চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা প্রকাশন, ঢাকা।

২২) আব্দুল কাদের / বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা।

২৩) আব্দুল কাদের সম্পাদিত নজরুল রচনা সম্ভার, প্রথম খণ্ড, হরকত প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৭

২৪) আবুল হাসনাত / ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু / সম্পাদনা - নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৭৪/ অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা-৯

২৫) আবু জাফর / রাত ভ'রে বৃষ্টি / সম্পাদনা - নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৭৪/অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা-৯

২৬) আশরাফ সিদ্দিকী / বুদ্ধদেব বসু / সম্পাদনা - অশোক কুমার সরকার, দেশ - ১৩৮১ অগ্রহায়ণ ১৪।

২৭) উজ্জ্বল মজুমদার / শীতের প্রার্থনা ও বসন্তের উত্তর /১৩৮১ শ্রাবণ / প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

২৮) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, কোলকাতা, সংস্কৃতি প্রকাশণ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

২৯) কমলেশ চট্টোপাধ্যায় / বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ভাবালাপ, সম্পাদক- জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮০, অভী প্রকাশন, কোলকাতা।

৩০) কাজল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত প্রামাণ্য বুদ্ধদেব বসু, কালকাতা, সংস্কৃতি প্রকাশণ, প্রথম প্রকাশ ৩০ শে নভেম্বর ১৯৯১

৩১) করুণাময় গোঁস্বামী / বুদ্ধদেব বসুর নাটক ঃ পুরাণ প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, সম্পাদনা নীলিমা ইব্রাহিম, ঢাকা।

৩২) কালিপদ দাস / বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, সম্পাদিত গ্রন্থ, বর্ণালি পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮।

৩৩) কিরণ শংকর সেনগুপ্ত / এই মুহূর্তের ভাবনা ও সাহিত্য চিন্তা, , প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, সম্পাদনা- লেখক নিজেই, কোলকাতা।

৩৪) খগেন্দ্রনাথ মিত্র / শতাব্দীর শিশু সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৮, বি.লা.প্রাঃ লিঃ, কোলিকাতা- ৯।

৩৫) গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত / অকর্মণ্য, বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, কোলকাতা-৯।

৩৬) গীতা মুখোপাধ্যায় / বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা (একালে ও সেকালে পর্ব) / কে.পি. বাগচী এন্ড কোং, কোলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ-১৯৮১

৩৭) গোপিকা নাথ রায়চৌধুরি / কল্লোলের কথা কোবিদ - বুদ্ধদেব বসু / প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

৩৮) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী / বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯১ / প্রকাশক- পুস্তক বিপণী, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা- ৯

৩৯) গোপিকা নাথ রায়চৌধুরী / রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প -, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০১ জানুয়ারী, প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাব্লিসিং, কোলকাতা - ৭৩

৪০) জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য/আমার কালের কয়েকজন কবি। কোলকাতা, ভারবি, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০

৪১) জগন্নাথ ঘোষ/নাট্য শিল্পী বুদ্ধদেব বসু, কোলকাতা, শিশির কুমার ভাদুড়ি, ইনসটিটিউট অফ গ্রামাটিক রিসার্চ এন্ড কালচার, ৩০ শে নভেম্বর ১৯৭৮

৪২) জীবেন্দ্র সিংহরায়/কল্লোলের কাল, কোলকাতা, দেজ পাবলিশিং ১৯৮৬

৪৩) জীবেন্দ্র সিংহ রায় সম্পাদিত / আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ, জুলাই ১৯৮১।

৪৪) চুণীলাল রায় / বুদ্ধদেব বসু ঃ একটি সাক্ষাৎকার স্মরণে,মে ১৯৭৪, কোলকাতা।

৪৫) ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদনা) / দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ট বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী, ১৯৯৮, প্রকাশিকা- মালবিকা গোস্বামী, অমৃত ধারা, ৮, পটুয়া টোলা লেন, কোলকাতা- ৯।

৪৬) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত / বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে ঃ শিল্প রীতি, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১/বি. পটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা - ৯, প্রকাশক - শ্রী চিন্ময় মজুমদার।

৪৭) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় /বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - নবম পূনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশক- রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩।

৪৮) ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী / দুই বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য - প্রথম প্রকাশ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশিকা - শ্রীমতি রমা বসু, অভী প্রকাশন, ১০ কিরণ শংকর রায় রোড, কোলকাতা - ১।

৪৯) ডঃ বিমল ভূষন চট্টোপাধ্যায়/বুদ্ধদেব বসুর কাব্য নাটক, কোলকাতা, পাইয়নীয়ার পাবলিকেশন, ২৮ শে জুন ১৯৮৭

৫০) ডঃ মীরা ঘোষ / দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, প্রথম প্রকাশ- ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, প্রকাশক- শ্রী কালিদাস মিত্র, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।

৫১) ডঃ বিমল ভূষণ চট্টোপাধ্যায় / সাহিত্য - রূপ ও রীতি / প্রথম প্রকাশ- ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক ইন্দু চক্রবর্ত্তী, কোলকাতা-৯

৫২) ডঃ রামারঞ্জন রায় /প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক / প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬/ এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৭৭।

৫৩) ডঃ সমরেশ মজুমদার / বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর / প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭/ প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

৫৪) ডঃ সুকুমার সেন / বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ড, আনন্দ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ ২৫ শে মার্চ, ১৯৯৪, ১৯৯৯

৫৫) ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য / উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র - প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯, প্রকাশক - শ্রী আনন্দ ভট্টাচার্য্য, জি.এ. এন্টারপ্রাইস, কোলকাতা - ৫০

৫৬) তন্ময় দত্ত সম্পাদিত / বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদ গ্রন্থ , প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

৫৭) তপতি মুখোপাধ্যায় / মায়ামালঞ্চ ও আমি , প্রকাশক- প্রতিভা বসু, ১৯৮৭, দেঁজ পাবলিশিং, কোলকাতা-৯।

৫৮) তপোধীর ভট্টাচার্য্য / উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৪১২, প্রকাশক - দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য, ৬৬/৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কোলকাতা-৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ভারত বুক এজেন্সী।

৫৯) তারাশঙ্কর রচনাবলী (১ থেকে ৮ খন্ড) / মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

৬০) তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত/বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে, কোলকাতা, পুস্তক বিপনি, অক্টোবর ১৯৮৮

৭০) নিরুপম চট্টোপাধ্যায় / কবিতা ভবন স্মৃতি, প্রথম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৬, সম্পাদনা- প্রতিভা বসু।

৭১) নীলিমা ইব্রাহিম / চিত্ত সত্তায় বুদ্ধদেব বসু / বাংলা একাডেমী, ঢাকা/ প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪

৭২) পরিমল চক্রবর্ত্তী / বুদ্ধদেব বসুর স্মরণে, সম্পাদনায় কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, অভী প্রকাশন, কোলকাতা-১

৭৩) পুতুল চন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত)/ বন্দীর বন্দনা / বুদ্ধদেব বসু / প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

৭৪) প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত / আমার শিক্ষক বুদ্ধদেব বসু, আজকাল দৈনিক, এপ্রিল ৩, ১৯৮৪।

৭৫) প্রসূণ ঘোষ / উপন্যাসের নানা স্বর, প্রথম প্রকাশ- ২০০৪, প্রকাশক- সঞ্জয় সামন্ত এবং মুশায়ারা, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

৭৬) প্রভাত কুমার দাস / কবিতা পত্রিকার সূচীগত ইতিহাস, প্যাপিরাস, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

৭৭) প্রতিভা বসু / স্মৃতি সততই সুখের, কোলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৩

৭৮) প্রতিভা বসু / জীবনের জলছবি / প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫/ প্রকাশক- সুধাংশুশেখর দে, দেঁজ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

৭৯) প্রতিভা বসু / আলো আমার আলো / দেঁজ পাবলিশার্স, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।

৮০) প্রতিভা বসু (সম্পাদিত) / এ যুগের বুদ্ধদেব, ৩০শে নভেম্বর, কবিতা ভবন বার্ষিকী ১৯৮৬।

৮১) প্রতিভা বসু / সমাগত বসন্ত / দেঁজ পাবলিশার্স, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।

৮২) প্রেমেন্দ্র মিত্র / বর্ষার রাত, পুস্তকালয়, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক- তনুশ্রী বিশ্বাস।

৮৩) বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় / বঙ্কিম রচনাবলী ১ থেকে ৩ খণ্ড, পত্রজ পাবলিশিং ১ম সংস্করণ, জুন১৯৮৩

৮৪) বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার / বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা। মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট, ১৯৮০।

৮৫) বিকাশ চক্রবর্ত্তী / বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ /, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদনা-শিব নারায়ণ রায়,অভী প্রকাশন, ১০ কিরণ শংকর রায় রোড,কোলকাতা-১

৮৬) বিমল রায়চৌধুরী (সম্পাদনা) / বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ, দৈনিক কবিতা, ১৯৬৮ অক্টোবর, ডিসেম্বর, জি.এ.এন্টারপ্রাইজ, কোলকাতা-৫০

৮৭) বিমল ভূষণ চট্টোপাধ্যায় / বুদ্ধদেব বসু ঃ কাব্য নাটক, পাইওনীয়ার পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২৮শে জুন ১৯৭৭।

৮৮) বিভূতুভূষণ বঁন্দ্যোপাধ্যায় / আরণ্যক , মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৮৯) বুদ্ধদেব বসু - কবিতা সিংহ / প্রথম প্রকাশ-১৯৭৮/ বর্ণালী পুস্তক বিপণী, কোলকাতা-৯।

৯০) বুদ্ধদেব বসু / এরা-ওরা-ও আরো অনেকে, পরিচয় পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৯।

৯১) বুদ্ধদেব বসু তাঁর শিল্প সাধনা / সামসুর রহমান ৩০শে নভেম্বর , কবিতা ভবন বার্ষিকি ১৯৮৭, সম্পাদনা - প্রতিভা বসু

৯২) বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ট কবিতা সংকলন / প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, প্রথ প্রকাশ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, দেঁজ পাবলিশিং, কোলকাতা-৯

৯৩) বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, প্রথম সংস্করণ- মার্চ, ১৯৭৪/ এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৯।

৯৪) বুদ্ধদেব বসু /আমার যৌবন, প্রথম সংস্করণ- এপ্রিল ১৯৭৬, প্রকাশক- গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৯।

৯৫) বুদ্ধদেব বসু /হঠাৎ আলোয় ঝলকানি, পরিচয় পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

৯৬) বুদ্ধদেব বসু / স্বদেশ সংস্কৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৬০ খ্রীঃ, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৯।

৯৭) বুদ্ধদেব বসু / জাপানী জার্নাল, কোলকাতা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, বৈশাখ ১৩৬৯

৯৮) বুদ্ধদেব বসু / বোদলেয়ার ঃ তার কবিতা, কোলকাতা, নাভানা মাঘ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

৯৯) বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত / আধুনিক বাংলা কবিতা, কোলকাতা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৫৪

১০০) বুদ্ধদেব বসু / আমার যৌবন, কোলকাতা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৭৭

১০১) বুদ্ধদেব বসু / কবিতার শত্রু ও মিত্র কোলকাতা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৭৪

১০২) বুদ্ধদেব বসু / রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কোলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৫৫

১০৩) বুদ্ধদেব বসু / কবি রবীন্দ্রনাথ, কোলকাতা, দেঁজ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬

১০৪) বুদ্ধদেব বসু / কালের পুতুল, কোলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৫৯

১০৫) বুদ্ধদেব বসু / মহাভারতের কথা , কোলকাতা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৭৪

১০৬) বুদ্ধদেব বসু / সঙ্গ ঃ নিসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ , কোলকাতা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৬২

১০৭) বুদ্ধদেব বসু / প্রবন্ধ সংকলন, কোলকাতা, দেঁজ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

১০৮) বুদ্ধদেব বসু / হ্যোল্ডা র্লিনের কবিতা (অনুদিত) কালকাতা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭

১০৯) বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত / আধুনিক বাংলা কবিতা / ফাল্গুন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা-৯।

১১০) মানিক রচনাবলী (১ থেকে ৬ খন্ড) / মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

১১১) মৃণাল কান্তি ভদ্র / ফ্রয়ডীয় তত্ত্ব ও বাংলা কবিতা, জীবেন্দ্র সিংহ রায় (সম্পাদক), প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৮১।

১১২) রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় / বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, কোলকাতা।

১১৩) রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত /উপন্যাস প্রসঙ্গে / প্রথম সংস্করণ ১৯৭১/ দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

১১৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / চিঠিপত্র পঞ্চম খন্ড, কোলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

১১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / রবীন্দ্র রচনাবলী ১ থেকে ৫ম খন্ড, কোলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

১১৬) শঙ্খ ঘোষ / ছন্দময় জীবন, কোলকাতা, দেজ পাবলিশিং, বৈশাখ, ১৪০০

১১৭) সঞ্জীব ঘোষ (সম্পাদিত) / অস্থিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে/প্রথম প্রকাশ- ১৯৯২/ প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

১১৮) সমরেশ বসু রচনাবলী (১ থেকে ৮ খন্ড) / দেঁজ পাবলিশার্স, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।

১১৯) সমীর সেনগুপ্ত / বুদ্ধদেব বসুর জীবন, প্রথম প্রকাশ, ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮, প্রকাশক- দময়ন্তী বসু সিং, বিলল্প প্রকাশনি, ১১ বিধান সরণী, কোলকাতা-৪।

১২০) সত্যেন্দ্রনাথ রায়/সাহিত্য তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩

১২১) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় / বাংলা কবিতার কালান্তর কোলকাতা, দেঁজ পাবলিশিং, ২০০০ সন

১২২) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় / বাংলা উপন্যাসের কালান্তর -, চতুর্থ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০০, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

১২৩) সন্তোষ চকদার (সম্পাদিত) /উপন্যাসে আইডিয়া ঃ বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭/ দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

১২৪) সাময়িক পত্র সম্পাদনে বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শ্রাবণ ১৩৮৯, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা।

১২৫) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদনা) / বাড়ি বদল ঃ বুদ্ধদেব বসু, পরিচয় পত্রিকা, ১৩৪২ কার্ত্তিক।

১২৬) সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় / এক দিন ঃ চিরদিন এর বুদ্ধদেব, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩।

১২৭) সুকান্ত ভট্টাচার্য্য / সুকান্ত সমগ্র কোলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

১২৮) সুদক্ষিণা ঘোষ / বুদ্ধদেব বসু, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

১২৯) সুহাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত / মার্কসবাদ ও নন্দন তত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

১৩০) সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদনা) / আধুনিকতা বনাম রুচি বিকার বুদ্ধদেব বসু ও শনিবারের চিঠি, অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা।

১৩১) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী / সমালোচক বুদ্ধদেব বসু- ১৯৭৪। সম্পাদনা - নীলিমা ইব্রাহিম / বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩২) Amiya Chakraborty, Modern Tendencies in English Literature. Calcutta Book Exchange, 1942

১৩৩) Budhyadev Bose. An Acre of Green Grass. Calcutta. Papirus. 1948

১৩৪) Budhyadev Bose, Tagore : Portrait of a Poet, Calcutta, Papirus. 1962

১৩৫) Dr. Arun Kumar Mokhopadhya, Promodh Chowdhury, Calcutta Sahitya Accademy

১৩৬) Suniti Kumar Chatterjee, World Literature & Tagore, Calcutta, Biswabharati Publishing Deptt. 1971

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১) "অন্বেষা", পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কবির কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কোলকাতা, ১৯৮১

২) আমার ছেলেবেলা/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ মার্চ- ১৯৭৩, প্রকাশক- সুপ্রিয় সরকার, মুদ্রক- পরাণচন্দ্র রায়, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২

৩) "উত্তরাধিকার" / বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ নভেম্বর, ডিসেম্বর সংখ্যা।

৪) "কবিতা", সপ্তম থেকে অষ্ঠম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮ - জানুয়ারী ১৯৬৯

৫) "কবিতা" বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, আষাঢ়, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ,বর্ষ-২১ সংখ্যা-৪

৬) "কবিতা" বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, আশ্বিণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ,বর্ষ-২১ সংখ্যা-১

৭) "কবিতা"বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, চৈত্র, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ,বর্ষ-৩ সংখ্যা-৪

৮) "কবিতা"বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, পৌষ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ,বর্ষ-১৯ সংখ্যা-২

৯) "কবিতা"বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ,বর্ষ-১ সংখ্যা-২

১০) "কবিতা" সংকলন, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত, কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৬

১১) "দেশ" ১৩৬৬ বৈশাখ-শ্রাবণ যুগ্ম সংকলন সাহিত্য সংখ্যা

১২) "দেশ" ১৩৮৫ বৈশাখ সাহিত্য সংখ্যা।

১৩) "দৈনিক কবিতা", ৫ম সংখ্যা ২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

১৪) ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ / বুদ্ধদেব বসু ঃ এমিলিয়ার প্রেম, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১।

১৫) নন্দগোপাল সেনগুপ্ত / বুদ্ধদেব বসু ঃ কালিকলম, ১৩৮১ বৈশাখ, সম্পাদনা- শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৬) প্রতিভা বসু (সম্পাদিত) / বুদ্ধদেব বসু ঃ স্কুলে আর কলেজে / কবিতা ভবন বার্ষিকী, প্রথম প্রকাশ ৩০ শে নভেম্বর ১৯৮৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

১৭) বিমল কর / নিঃসঙ্গ শিল্পী, "দেশ" সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৬।

১৮) বুদ্ধদেব বসু ঃ মানুষ ও লেখক / যুগান্তর পত্রিকা ১৯৭৪, মার্চ ১৯ সংখ্যা।

১৯) বুদ্ধদেব বসু ঃ সাহিত্যে প্রতারিত ও প্রতারক, কবিতা পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পবিত্র কুমার ঘোষ।

২০) "বৈদগ্ধ্য", বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, সম্পাদক শেখর বসু রায়। কোলকাতা, মুদ্রক - দীপ প্রকাশন।

২১) "শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য", কোলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯২

২২) সুবীর রায়চৌধুরী / বুদ্ধদেব বসু ঃ "প্রগতি" থেকে "প্রগতি লেখক সংঘ", প্রথম বর্ষ ৮-৯ যুগ্ম সংখ্যা, নববর্ষ ১৩৯১।

LIBRARY • N.B.U. DARJEELING

২৩) হিরণ কুমার সান্যাল (সম্পাদনা) / পৃথিবীর পথে ঃ বুদ্ধদেব বসু / "পরিচয়" পত্রিকা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।